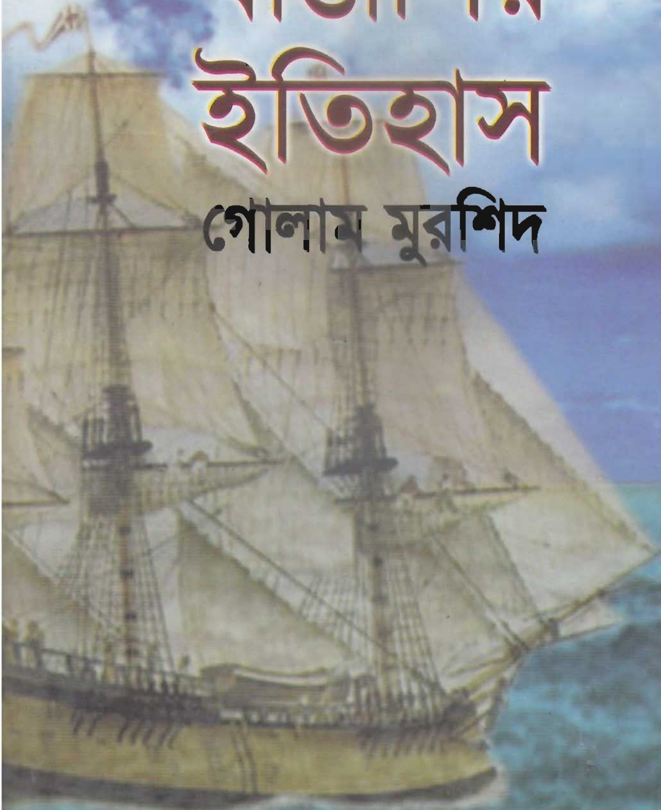
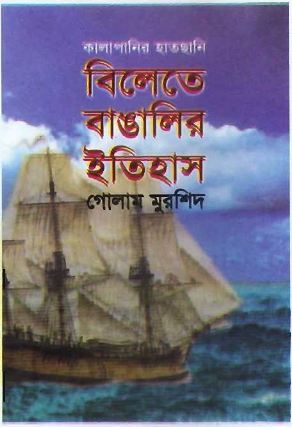
কালাপানির হাতছানি

বিলেতে বাঙালির ইতিহাস

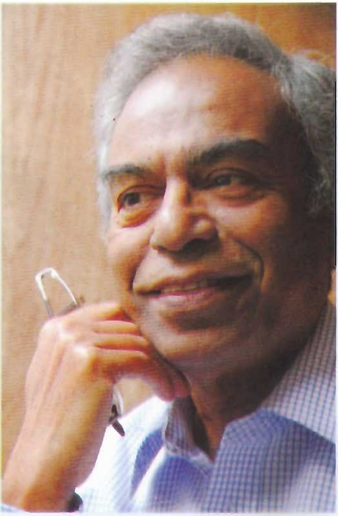
গোলাম মুরশিদ





বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা আর আসামের বাইরে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বাস করেন ইংল্যান্ডে। এক কালে কালাপানি পার হওয়া ছিলো ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। তা সত্ত্বেও বাঙালিরা ইংল্যান্ডে যেতে আরম্ভ করেন ইংরেজরা বঙ্গদেশ জয় করার আগে থেকেই। প্রথমে গৃহভৃত্য, তারপরে ভদ্রলোকেরা – ইতেশাম উদ্দীন, ঘনশ্যাম দাস, রামমোহন রায়, আনন্দচন্দ্র মজুমদার আর দ্বারকানাথ ঠাকুর – এ রকমের কয়েকটি নাম। তারপর গোটা উনিশ শতক ধরে বিলেতে যান অসংখ্য ছাত্র – কেউ চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ আইন, কেউ নানাবিধ বিদ্যার অন্বেষণে। প্রথম দেড় শো বছর তাঁরা যেতেন দেশে ফিরে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু গত এক শো বছর অনেকে যেতে আরম্ভ করেন সে দেশেই বাস করার জন্যে। বাঙালিদের এই বিলেত যাওয়ার আর বিলেতে বসতি স্থাপনের ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে এই গ্রন্থ।

যে-বাঙালিরা বসতি স্থাপন করেছেন বিলেতে, তাঁরা একটি বিশেষ অঞ্চলের নন, এক শ্রেণীর নন, অভিন্ন পারিবারিক পটভূমির নন, এক ধর্মের নন, এমন কি, এক ধরনের জীবিকাও নয় তাঁদের। তাঁদের বর্তমান শিক্ষা, জীবিকা, সাংস্কৃতিক জীবন এবং স্বরূপের মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান। এই বাঙালিরা কতোটুকু বাঙালি, কতোটুকু বিলেতি? তাঁদের নিজেদের মধ্যে আদানপ্রদানই বা কতোখানি? ইংরেজ সমাজে বাস করে তাঁরা কি শুধু ইংরেজি সংস্কৃতি দিয়েই প্রভাবিত হয়েছেন, নাকি ইংরেজি সংস্কৃতির ওপরও কোনো প্রভাব ফেলতে পেরেছেন তাঁরা? এসব কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা রয়েছে বর্তমান গ্রন্থে।



গোলাম মুরশিদ শিক্ষক, গবেষক এবং লেখক। বাঙালি নারীদের ইতিহাস নিয়ে তিনি যে-গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন, *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization* (১৯৮৩), পঁচিশ বছর পরে আজও তা আকর গ্রন্থ হিশেবে বিবেচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিনি যে-জীবনী লেখেন – *আশার ছলনে ভুলি* (১৯৯৫) – কেবল মাইকেলের জীবনী হিশেবেই নয়, সমগ্র বাংলা জীবনীসাহিত্যেই তা একটি অসাধারণ গ্রন্থ বলে সর্বজনস্বীকৃত। মাইকেল মধুসূদনের চিঠিপত্রের তিনি যে-সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন – *The Heart of a Rebel Poet* (২০০৪), তেমন সংকলন এখনো কোনো বাঙালি সাহিত্যিককে নিয়ে প্রকাশিত হয়নি। বাঙালি সংস্কৃতির যে-ইতিহাস রচনা করেন তিনি – *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি* (২০০৬) – তাও সমালোচকদের মতে একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এ ছাড়া মূল্যবান গবেষণা আঠারো শতকের বাংলা গদ্য আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। বাংলাভাষীদের শতকরা পাঁচজনেরও বেশি এখন বাস করেন মূল বঙ্গভূমির বাইরে। তাই বাঙালি ডায়াসপরা নিয়েও নতুন উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে বাঙালিদের। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করলেন গোলাম মুরশিদ। গোটা ডায়াসপরার কথা এ গ্রন্থ থেকে জানা যায় না, কিন্তু এ গ্রন্থ যে এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কালাপানির হাতছানি

বিলেতে বাঙালির ইতিহাস

কালাপানির হাতছানি

বিলেতে বাঙালির ইতিহাস

গোলাম মুরশিদ

অবসর

কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালির ইতিহাস
Kalapanir Hatchhani: Bilete Bangalir Itihas

ghulammurshid@aol.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৮

অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
প্রতীক ডট ডিজাইন

মূল্য : ৩৭৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 233 - X

The Call of the Sea: History of the Bengalis in Britain
by Ghulam Murshid
Published by ABOSAR. 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
Revised Second Edition : April 2008. Price : Taka 375.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com

উৎসর্গঃ

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে আমি যাঁর ছাত্র

এই লেখকের অন্য কয়েকটি গ্রন্থ

বৈষ্ণব পদাবলী প্রবেশক (১৯৬৮)
বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি (১৯৭১)
রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা (১৯৮১; দ্বি সং ১৯৯৩)
Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization (1983)
বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদিত) (১৯৭১)
সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতিক্রিয়া (১৯৮৪, দ্বি সং ২০০০)
বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদি-পর্ব (১৯৮৪)
সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৯৮৫, দ্বি সং ২০০৭)
English-Bengali-English Dictionary (1988, 1992)
যখন পলাতক: মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি (১৯৯২)
কালান্তরে বাংলা গদ্য: ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্যের রূপান্তর (১৯৯৩)
রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির একশো বছর (১৯৯৩, দ্বি সং ২০০০)
আশার ছলনে ভুলি: মাইকেল-জীবনী (১৯৯৫, দ্বি সং ১৯৯৭, পুনর্মুদ্রণ ২০০১, তৃ সং ২০০৬)
উজান স্রোতে বাংলাদেশ (২০০৩)
Lured by Hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt:
tr. by Gopa Majumdar (2004)
The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt (2004)
হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি (২০০৬)
নারী ধর্ম ইত্যাদি (২০০৭)
মধুর খোঁজে: মাইকেলজীবনী পুনর্নির্মাণের নেপথ্য কাহিনী (২০০৭)

ভূমিকা

বাঙালিরা ঘরকুনো – এ অপবাদ একদিন এমন বহুল-প্রচলিত ছিলো যে, কবি বাংলা-মায়ের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তাঁদের লক্ষ্মীছাড়া করে ঘর থেকে বের করে দিতে। বের করে দিতে, যাতে তাঁরা বহির্বিশ্বে গিয়ে অকর্মণ্য নাম ঘোচাতে পারেন। বহু প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছে কবির – বিশেষ করে বাঙালিরা এক হোক – এই করুণ মিনতি। কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁর সন্তানদের ঘর-ছাড়া করেছেন ঠিকই। এখন শতকরা প্রায় পাঁচজন বাঙালি বাস করেন মূল বাংলাভাষী অঞ্চল অর্থাৎ বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামের বাইরে। উত্তর আর দক্ষিণ মেরু বাদ দিলে পৃথিবীর অন্য সব জায়গাতেই বোধ হয় বাঙালিরা বাস করেন। অনেকের মতে, এখন আশি লাখ বাঙালি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বঙ্গের বাইরে – পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্যপ্রাচ্যে, পূর্ব এবং দক্ষিণ ইউরোপে, পশ্চিম ইউরোপে, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, এমন কি, গহন অরণ্যের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আফ্রিকায়।

বহির্বিশ্বে বাঙালিদের এই যাত্রা শুরু হয়েছিলো বিলেতের পথ ধরে। কাজটা আদৌ সহজ ছিলো না। কারণ, ভয় ছিলো কালাপানির। সে কেবল কূলহীন অতলান্ত নীল সাগরের ভীতি নয়। কালাপানি পার হওয়া ছিলো ধর্ম-বিনাশী কাজ। যে-দেশে মানুষ কুমড়ো খাবে কি খাবে না, তাও ঠিক করে পাঁজি দেখে, সে দেশের মানুষ এতো বড়ো নিষেধ অমান্য করে কিভাবে অজানা কূলের উদ্দেশে কালাপানিতে ভাসলেন এবং তারপর কিভাবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেলেন – সেই কাহিনী একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর, অন্যদিকে তেমনি দারুণ কৌতূহলের।

এখন বিলেতের সবচেয়ে বড়ো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি হলো বাঙালিদের। ইংরেজরা বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। দু শো বছর ধরে শাসন করেছিলেন, শোষণ করেছিলেন। তারপর ইংরেজরা যখন ফিরে গেলেন, বাঙালিরা – যেন তাঁদের তাড়া করে – তাঁদের পেছনে পেছনে বিলেতে গেলেন। তাঁরা বিলেত শাসন করতে পারলেন না, শোষণও নয়। কিন্তু তাঁরাও ইংরেজদের আংশিকভাবে জয় করলেন। বিলেতি সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হলেন তাঁরা, তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে ফেললেন অবিচ্ছেদ্য প্রভাব। ভেতো বাঙালিদের সংস্পর্শে এসে ইংরেজরাও ভেতো হলেন।

গৃহভৃত্য হিশেবে বাঙালিরা বিলেতে আসতে আরম্ভ করেন সতেরো শতক থেকে। আর দেশভ্রমণের উদ্দেশে আসেন আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে। এই পথিকৃৎদের মধ্যে ছিলেন ইতেশাম উদ্দীন, ঘনশ্যাম দাস, আবু তালিব, রামমোহন, আনন্দচন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ – অনেকেই। সেই কাহিনী থেকে শুরু করে আজকের বিলেতি বাঙালিদের জীবনযাত্রার চিত্র পর্যন্ত – সংক্ষেপে সবই আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি এই গ্রন্থে। এ বিষয়ে গবেষণার যে-সুযোগ এবং উপকরণ আছে, তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র আমি নেড়েচেড়ে দেখেছি। কারণ, আমি পণ্ডিতজনদের জন্যে নয়, লিখেছি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটানোর জন্যে। আরও গবেষণা পণ্ডিতরা করবেন।

এই বইয়ের একটা অংশ খসড়া আকারে *প্রথম আলোর* ঈদ সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন সাজ্জাদ শরীফ। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা। কাজ করার সময়ে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাঁদেরও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর কৃতজ্ঞতা জানাই রোজিনা বিশ্রাম, মাইকেল ফিশার এবং অন্য যাঁদের গ্রন্থ থেকে বেশ কয়েকটা দুর্লভ ছবি নিয়েছি, তাঁদের। ডাণ্ডিশহরের বাঙালি পরিবারগুলোর তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন ইয়াসমীন করিম। তাঁকে ধন্যবাদ। এবারেও লেখার সময়ে এলিজা ধৈর্য তো দেখিয়েছেনই, তার ওপর সহযোগিতাও করেছেন পুরোপুরি।

গোলাম মুরশিদ
লন্ডন, জানুয়ারি ২০০৮

সূচিপত্র

কালাপানির হাতছানি: বিলেতে বাঙালি

রামায়ণের কাহিনীতে আছে বটে, কিন্তু রামচন্দ্র সত্যি সত্যি লঙ্কা জয় করেছিলেন কিনা, ইতিহাস সে সম্পর্কে কিছু বলে না। আর, সেটা প্রাসঙ্গিকও নয় আমাদের এ আলোচনার জন্যে। কারণ, শাস্ত্রের বয়ান অনুযায়ী রামচন্দ্র দেবতা হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙালি ছিলেন না। অপর পক্ষে, প্রচলিত ইতিহাসের মতে, বিজয়সিংহ নামে এক বাঙালি নৃপতি নাকি প্রাচীনকালে সিংহল জয় করেছিলেন। অন্তত এ নিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্য রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। আর-একজন কবি তো উনিশ শতকের শেষে এ নিয়ে রীতিমতো একটি কাব্য লিখেই ফেলেছিলেন। বিজয়সিংহের কাহিনী ছাড়া, মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে জানা যায় চাঁদ সদাগর আর শ্রীমন্তের কাহিনী। তাঁরা রাজ্য জয় করতে যাননি — সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন বাণিজ্য করতে। মোট কথা, খানিকটা ইতিহাস থেকে, খানিকটা সাহিত্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, প্রাচীন এবং মধ্যযুগে বাঙালিরা কালাপানি পার হতেন। সেকালে সমুদ্রযাত্রার ঐতিহ্য যে জোরালো ছিলো — এটা প্রমাণ করার জন্যে অক্ষয়কুমার দত্ত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি বইও লিখে ফেলেছিলেন। ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, সাগরে যাবার মতো নৌকো তৈরি হতো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গায় — এমন কি, সে ঐতিহ্য ইংরেজ আমলেও প্রচলিত ছিলো। ইবনে বতুতা তেমন একটি নৌকোয় করেই এই বঙ্গদেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন ইন্দোনেশিয়ায়।

কিন্তু আঠারো-উনিশ শতকের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, কালাপানি পাড়ি দেওয়া ততোদিনে বঙ্গদেশে কেবল অবাঞ্ছিত কাজ বলে গণ্য হয়নি, রীতিমতো নিষিদ্ধ হয়েছিলো। এর কারণ কী? মনে হয়, ষোলো শতক থেকে পর্তুগীজ দস্যুদের হামলা বাঙালিদের সমুদ্রযাত্রার উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিলো। জলদস্যুতা গোড়ার দিকে ইংরেজরাও করেছে, তার প্রমাণ আছে। এই জলদস্যুতার ভীতি থেকে সমুদ্রযাত্রা এতোই অপ্রচলিত হয়ে যায় যে, কিছুকালের মধ্যেই সাগর পাড়ি দেওয়া গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হয়। এমন কি, ধীরে ধীরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় একটা ধর্মীয় অনুষঙ্গ। এভাবে কালে কালে কালাপানি পার হওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

অবশ্য এই নিষেধ অমান্য করে সমাজের নিচের তলার অল্প কিছু নারীপুরুষ সতেরো শতকের গোড়া থেকেই বিলেত যেতে আরম্ভ করেন – ইতিহাস থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিচে পীটার লেলির ১৬৭৪ সালে আঁকা ছবিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, একটি ভারতীয় কাজের মেয়ে ইংরেজ পরিবারের একটি সন্তানকে দেখাশোনা করছে।



সতেরো শতকে অন্য যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন এই মেয়েটির মতোই হয় ইংরেজ পরিবারের আয়া, নয়তো ভৃত্য। আরও একটা শ্রেণীর লোকেরা গিয়েছিলেন – জাহাজের লস্কর।

এ ছাড়া, কোনো কোনো ইংরেজ ভারতে থাকার সময়ে ভারতীয় নারীদের বিয়ে করেছিলেন। যেমন, লাখনৌ-এর একটি অভিজাত পরিবারের দুই বোনকে বিয়ে করেছিলেন দুই বিদেশী। বড়ো বোনকে বিয়ে করেছিলেন উইলিয়াম পামার নামে এক বেনিয়ান। আর ছোটো বোন নূর বেগমকে বিয়ে করেন জেনারেল বেনোয়া দা বোয়ান। বোয়ানের আরও ভারতীয় স্ত্রী এবং রক্ষিতা ছিলেন। কিন্তু ১৭৯৭ সালে

তিনি যখন ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন, তখন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন কেবল নূর বেগম এবং তাঁর দুই সন্তানকে। এ রকমের আর-এক ভারতীয় মা এবং ইংরেজ পিতার সন্তান ছিলেন অ্যামেলিয়া জেনকিন্সন। তিনি ১৭৬৯ সালে বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন অ্যার্ল অব লিভারপুলকে। তাঁর পুত্র রবার্ট প্রথমে পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং তারপর ১৮১২ সাল থেকে পনেরো বছরের জন্যে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হন। উনিশ শতকে তিনিই সবচেয়ে বেশি দিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আর-একটি দৃষ্টান্ত হলো: পূর্ণিয়ার মহারাজার এক বিধবা কন্যা। তিনি ১৭৮০ সালের দিকে বিয়ে করেন জেরার্ড ডুকারেল নামে এক ফরাসি ভদ্রলোককে। ডুকারেল ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। মীর্জা আবু তালিব খানের ভ্রমণকাহিনীতে এঁর কথা উল্লেখ আছে।

এ রকমের বিবাহিতা স্ত্রী ছাড়া, রক্ষিতা ছিলেন আরো বেশি লোকের। উনিশ শতকের একেবারে প্রথম দিকে কলকাতা থেকে এক ইংরেজ স্বদেশের আর-এক ইংরেজকে লিখেছিলেন যে, একটা কমবয়সী ইংরেজ মেয়েকে বিলেত থেকে বঙ্গদেশে নিয়ে আসার কোনো মানে হয় না। কারণ, বছরে ষাট পাউন্ড ব্যয় করলেই এখানে একটি চলনসই দেশীয় রমণীকে রক্ষিতা রাখা সম্ভব। উইলিয়াম জোনস কেবল ভারত-বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। ভারতীয় নারীদের প্রতিও বোধহয় তাঁর একটু বেশি আকর্ষণ ছিলো। শোনা যায়, তিনি একবারে কলকাতার দাস-বাজার থেকে ছটি সুন্দরী ক্রীতদাসী কিনেছিলেন। সে যাই হোক, ইংরেজদের এই রক্ষিতা অথবা দেশীয় স্ত্রীরা অনেকে তাঁদের স্বামী অথবা 'রক্ষিতে'র সঙ্গে বিলেত যেতেন। এভাবে ভারতীয়দের সংখ্যা আঠারো শতকের শেষ দিক থেকেই ইংরেজ সমাজে বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করে।

এই ভৃত্যরা বিলেতের লোকেদের চোখে তাঁদের চেহারা এবং আচার-আচরণের জন্যে বেশ কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হন। প্রতিবেশীদের এই কৌতূহল থেকেই ভারতফেরত ইংরেজ 'নবাব'দের পক্ষে একজন ভারতীয় ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ধীরে ধীরে ফ্যাশান এবং সম্মানের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। তাই অর্থসঙ্গতি থাকলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী ইংরেজরা একজন ভারতীয় আয়া অথবা ভৃত্যকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতেন।

ভারতীয় আয়া অথবা গৃহভৃত্যরা নিজেরাও কেউ কেউ তাঁদের সাহেবদের সঙ্গে বিলেতে যাওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। দীর্ঘদিন একই পরিবারে কাজ করার পর সে পরিবারের সন্তানদের প্রতি মায়া জন্মানো খুব স্বাভাবিক। এই মায়া এ ব্যাপারে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করতো। বেশির ভাগ আয়া এবং ভৃত্যই অবশ্য যেতেন এই শর্তে যে, তাঁদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হবে। কিন্তু কার্যকালে তাঁদের মুনিবরা অনেকে খরচ দিয়ে তাঁদের ফেরত পাঠাতেন না। ফলে

এই আয়া এবং ভৃত্যরা শেষ পর্যন্ত — যেমন, মুনিব মারা যাওয়ার পর — অসহায় হয়ে পড়তেন। এঁরা কেউ কেউ বিনা বেতনে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতে আগমনকারী ইংরেজ যাত্রীর ভৃত্য হিশেবে কাজ জুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরতেন। এ রকম কাজ চেয়ে সেকালে অনেকেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন। যাঁরা কোনো উপায়ে ফিরতে পারতেন না, তাঁরা করুণ অবস্থায় শহরের রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা অথবা ফেরি করতেন। ১৮৪৯ সালে *টাইমস* পত্রিকায় একজন ভারতীয় ভ্রমণকারী চিঠি লিখে এ রকম ভিখিরি এবং তাঁদের দুরবস্থার কথা জানিয়েছিলেন। হেনরি মেহিউ *London Labour and the London Poor* (১৮৬১-৬২) এবং জোফেস সল্টার তাঁর *Asiatics in England: Sketches of Sixteen Years' Work among Orientals* (১৮৭৩) গ্রন্থে এ রকমের হতদরিদ্রদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। লন্ডনের তখনকার রাস্তায় ভারতীয় লোকেরা ঝাঁট দিচ্ছে এবং ভিক্ষে করছে — এ রকমের কয়েকটি চিত্রও পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময়ে এই অসহায় ভৃত্য অথবা আয়ারা অন্য কোনো মুনিবও জুটিয়ে নিতেন। কেউ বা খৃষ্টান হয়ে অন্যকে বিয়ে করতেন, রক্ষিতা হতেন অথবা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতেন। মোট কথা, এই নারী এবং পুরুষ ভৃত্যদের বেশির ভাগেরই হতো শোচনীয় পরিণতি।



ঝাঁট দিতে দিতে ভিক্ষে করছে, ১৮৪৮ সালে পাঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত

এঁরা এমন সাধারণ মানুষ ছিলেন যে, এঁদের বিস্তারিত পরিচয় দূরে থাক, নামধামও জানা যায় না। তার ওপর, মুনিবদের চোখে এঁরা এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না যে, তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে এঁদের নাম এবং পরিচয় লিখে রাখবেন। তা সত্ত্বেও যে-দুচারটা নাম পাওয়া যায়, ইংরেজরা সেসব নাম এমনভাবে উচ্চারণ করতেন এবং এমন বানানে লিখতেন যে, তা থেকে নামগুলো আদিতে কেমন ছিলো, তা উদ্ধার করা যায় না। বহু ইংরেজ আবার এই আয়া এবং ভৃত্যদের একটা ইংরেজি নাম দিয়ে নিতেন, যাতে তাঁদের ডাকা সহজ হয়। বলা বাহুল্য, এসব নামের সঙ্গে কোনো বংশ-নাম থাকতো না। তা সত্ত্বেও যে-দুচারটি নাম পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান

করা যায় যে, এঁরা বেশির ভাগই হিন্দু নন, বরং মুসলমান ছিলেন। হিন্দুরা একেবারে যাননি, তা নয়। তবে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন উত্তর অথবা পশ্চিম ভারতের — বাঙালি নন।

আয়া এবং ভৃত্যদের তুলনায় ভারতীয়রা ঢের বেশি যেতেন খালাসি, সারেং ইত্যাদি নানা কাজে জাহাজের লস্কর অর্থাৎ নাবিক হয়ে। কলকাতা থেকে যাত্রা করলেও, এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন নদীপ্রধান পূর্ব বাংলার লোক। ১৮০৩ সাল থেকে কয়েক বছরের লস্করদের যে-হিশেব পাওয়া যায়, তা থেকে দেখা যায় যে, ১৮০৩



১৮৫৬-৫৭ সালে নির্মিত পূর্ব লন্ডনে লস্করদের আশ্রয়। এই হোম অবশ্য কেবল বাঙালি লস্করদের জন্যেই তৈরি হয়নি. এখানে জায়গা পেতেন ভারতীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আগত সব লস্করই। বলা বাহুল্য, এই একটি মাত্র হোম শত শত লস্করের জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। সে জন্যেই শতাব্দীর শেষ নাগাদ এ রকমের হোমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসবের মধ্যে সরকারী এবং দাতব্য—উভয় ধরনের হোমই ছিলো। আয়াদের জন্যেও লন্ডনে একটি বড়ো হোম তৈরি হয়েছিলো ১৮৯৭ সালে। এখানে প্রায় দু শো আয়া থাকতে পারতেন।

সালে ইংল্যান্ডে দু শোরও বেশি লস্কর ছিলেন। আর পরের বছর ছিলেন চার শোরও বেশি। ১৮০৭ সালের পর থেকে এঁদের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যায়। এই লস্করদের অনেকে বিলেত থেকে আর দেশে ফিরতে পারতেন না টাকার অভাবে। অনেক সময়ে তাঁদের ওপর অত্যাচারও করতেন জাহাজের মালিকরা। কোনো কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন লস্করদের মেরে সাগরের পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছেন, এমন

প্রমাণও পাওয়া যায়। অত্যাচার এড়ানোর জন্যে লস্কররা কখনো কখনো জাহাজ থেকে পালিয়েও বিলেতের মাটিতেই থেকে যেতেন। তারপর ভিক্ষা করে এবং কায়ক্লেশে বেঁচে থাকতেন তাঁরা।

লস্করদের এই সমস্যা উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এমন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে, তার পরিপ্রেক্ষিতে জাহাজের মালিক এবং লস্করদের জন্যে কম্পেনি আইন করতে বাধ্য হয়েছিলো। এই আইন অনুসারে, লস্করদের দেশে ফেরত পাঠানোর এবং বিলেতে তাঁদের থাকা-খাওয়াও নিশ্চিত করার জন্যে জাহাজের মালিকদের আগে থেকেই বন্ড দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। কিন্তু তার পরও লস্করদের দুর্দশা কোনোদিন ঘোচেনি। এই দুঃস্থ লস্করদের থাকা-খাওয়ার জন্যে লন্ডনসহ একাধিক জায়গায় আশ্রম তৈরি হয়েছিলো। এঁরা বেশির ভাগই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে মারা যেতেন। লস্কর ছাড়া, ভারতবর্ষ থেকে ভৃত্য নিয়ে যাবার জন্যেও বন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো — বিশেষ করে বোম্বাই থেকে যাওয়ার ব্যাপারে সেখানকার কর্মচারীরা এসব কড়াকড়ি পালন করতেন।

বহুজনের করুণ পরিণতি সত্ত্বেও লস্কররা যে গুরুতর ঝুঁকি নিয়ে বিলেত যেতেন, বিশ্লেষণ করলে তার কারণও অজানা থাকে না। তখনকার দলিলপত্র থেকে দেখা যায় যে, চাষী এবং সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় লস্করদের বেতন ছিলো যথেষ্ট বেশি। সুতরাং যে-লস্কররা সাগর পাড়ি দিয়ে যেতেন, নিজেদের অবস্থা ফেরানোর আশাতেই তাঁরা যেতেন। এবং দেশে ফিরে আসতে পারলে, তাঁদের অবস্থার খানিকটা উন্নতিও হতো — এটা অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চাষীদের তুলনায় লস্করদের বেতন বেশি হলেও, সে বেতন ছিলো শ্বেতাঙ্গ লস্করদের তুলনায় অনেক কম। আমরা পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখতে পাবো।

সে যাই হোক, যে-আয়া আর লস্কররা তখন বিলেতে যেতেন, তাঁদের নামধাম, এমন কি, সাধারণ পরিচিতির কথা সমসাময়িক সূত্র থেকে তেমন জানা না-গেলেও আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে আরবি-ফারসি শেখানোর মতো কোনো বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়ে যাঁরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নামধাম ভালো করেই জানা যায়। এমন কি, জানা যায় বিলেতে তাঁদের কার্যকলাপের খানিকটা সংবাদও। এ রকমের একজন ছিলেন মীর জাফরের এক কর্মচারী — আবদুল্লাহ্। ভারতীয়দের বিলেতে আসার ব্যাপারে গবেষণা করেছেন, এমন একজন ঐতিহাসিক হলেন মাইকেল ফিশার। তিনি লিখেছেন এই আবদুল্লাহ্‌র কথা। লর্ড ক্লাইভকে খুশি করার জন্যে মীর জাফর তাঁকে মধ্য-এশিয়ার স্যায়গুশ নামে একটি খুব হিংস্র বন-বিড়াল দিয়েছিলেন। ক্লাইভ আবার রাজা দ্বিতীয় জর্জের এক মন্ত্রীকে খুশি করার জন্যে সেটি পাঠান লন্ডনে। কিন্তু এটি দেখাশোনার জন্যে সঙ্গে পাঠান আবদুল্লাহ্

এবং আবদুল্লাহর একাধিক ভৃত্যকে। আবদুল্লাহ এই জন্তুটিকে পোষ মানাতে জানতেন। জন্তুটি শেষ পর্যন্ত রাজার দুর্গ — 'টাওয়ার অব লন্ডনে' জায়গা পায়।

আবদুল্লাহ এসেছিলেন ১৭৫৯ সালে। দ্বিতীয়বার তিনি আসেন ১৭৬৪ সালে। এবারে আসেন মাদ্রাসের গভর্নরের দেওয়া একটি চিতা বাঘকে নিয়ে। পরের বছর বসন্তকালে তিনি তাঁর সহকারী এবং ভৃত্যদের নিয়ে দেশে ফিরে যান। হাতি নিয়েও একাধিকবার মাহুত এসেছিলেন বলে জানা যায়।



আবদুল্লাহ ও স্যায়গুশ ১৭৫৯ সালের নভেম্বর মাসের
দ্য লন্ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত চিত্র।

তবে অনেক বেশি জানা যায় আরবি-ফারসি শেখাতে-আসা মুনশিদের কথা। এ রকমের একজন মুনশি ছিলেন মহাম্মদ সাঈদ। তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ফ্রেডারিক স্ট্যুয়ার্টের শিক্ষক হিশেবে, খুব সম্ভব তাঁরই সঙ্গে। ১৭৭৭ সালের ৫ই নভেম্বর লন্ডনের *ডেইলি অ্যাডভারটাইজার* পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন যে, তিনি আরবি এবং ফারসি পড়াতে চান। মোটামুটি ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারতেন তিনি। বিজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন বঙ্গদেশ থেকে। কিন্তু তিনি বাঙালি ছিলেন কিনা, তার কোনো উল্লেখ এ বিজ্ঞাপনে ছিলো না।

এ রকমের আরও কয়েকজন ফারসি ভাষার মুসলমান শিক্ষকের কথা জানা যায়, আঠারো শতকের শেষ তিন দশকে অথবা উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় যাঁরা বিলেতে গিয়েছিলেন। যেমন, ১৭৭২ সালে আরবি-ফারসির শিক্ষক মোহাম্মদ

ইসমাইলকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যান কম্পেনির এক স্কটিশ কর্মচারী – ক্লড রাসেল। রাসেল তাঁকে নিয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত ফারসি ভাষার মুনশি হিশেবে। দুজন ভারতীয় ভৃত্যকেও রাসেল নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৭৭৬ সালে মোহাম্মদ হোসেন গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে বিজ্ঞানের উন্নতি দেখতে এবং সম্ভব হলে সেখানে বিজ্ঞান শিখতে। তিনি সেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অ্যানাটমির উন্নতি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের গোড়ায় গোলাম হায়দার, মৌলভি মীর আবদুল আলি, মীর্জা খলিল এবং মীর হাসান আলিও গিয়েছিলেন আরবি-ফারসির শিক্ষক হিশেবে। এঁরা লন্ডনের কাছে হেইলিবেরি কলেজে আরবি-ফারসি শেখানোর কাজ করেছেন।


ইতেশাম উদ্দীন। তবে এটি তাঁর সত্যিকার চিত্র, নাকি তাঁর কল্পিত চিত্র, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, এঁদের কেউ কেউ কলকাতা থেকে গেলেও এবং বঙ্গবাসী হলেও, এঁরা বেশির ভাগই বাংলাভাষী ছিলেন না। তবে কোনো বাংলাভাষী আঠারো শতকে বিলেতে যাননি, তা নয়। অন্তত দু-তিনজন বঙ্গবাসীর কথা জানা যায়, যাঁরা এই শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বিলেতে গিয়েছিলেন। তাঁদের দুজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু। এ যাবৎ জানা ছিলো যে, রামমোহন রায়ের আগে কোনো বাঙালি হিন্দু ইংল্যান্ডে যাননি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তাঁর ৬০ বছর আগেই অন্য একজন শিক্ষিত হিন্দু বিলেতে গিয়ে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষী দিয়েছিলেন। এঁর কথায় পরে আসছি। তার আগে বলে নিই এঁর আগে গিয়েছিলেন, এমন একজন বিশিষ্ট মুসলমান পর্যটকের কথা। এই পর্যটকের নাম হলো মীর্জা সৈয়দ শেখ ইতেশাম উদ্দীন।

তাঁর জন্ম হয়েছিলো নদিয়ার পাঁচনুরে। অর্থাৎ তিনি বঙ্গবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষিক পরিচয় কী? তাঁর একটি উক্তি থেকে সে বিষয়েও ধারণা করা যায়। তিনি লিখেছেন যে, মুরশিদাবাদের নবাব, মীর জাফরের অধীনে চাকরি করার সময়ে সৌভাগ্যক্রমে তিনি মুনশি সলিমউল্লাহের কাছে ফারসি পড়তে এবং লিখতে শেখেন। এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তার আগে পর্যন্ত তিনি ফারসি জানতেন না। অবশ্য তার পরেও একটা সন্দেহ থেকে যায়। মনে করা যেতে পারে যে, সেকালের অন্য অভিজাত

মুসলমানদের মতো তিনিও উর্দুভাষী ছিলেন। এই মুসলমানরা বঙ্গদেশে বাস করলেও বাংলায় কথা বলতেন না। বাংলায় কথা বলতেন গ্রামের সাধারণ মুসলমানরা। কিন্তু, আমার বিবেচনায়, তিনি উর্দুভাষী মুসলমান ছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, তাঁর বাঙালিত্ব সম্পর্কে আরও পরোক্ষ প্রমাণ আছে। তিনি যখন স্কটল্যান্ডে ছিলেন তখন ক্যাপ্টেন আর্চিবল্ড সুইন্টনের সঙ্গে একদিন তর্কের সময়ে সুইন্টন তাঁকে বাঙালি বলে গাল দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তারিখ লেখার সময়েও তিনি হিজরি মাসের সঙ্গে বাংলা মাসের নাম লিখেছেন। তিনি যেসব ফুলের নাম উল্লেখ করেছেন, তা থেকেও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি বাঙালি ছিলেন।

কিছুকাল মুর্শিদাবাদে চাকরি করার পর তিনি ইংরেজদের অধীনে কাজ করেন। তখন কম্পেনির সেনা-কর্মকর্তা এবং স্কটিশ ডাক্তার ক্যাপ্টেন সুইন্টনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কম্পেনির সঙ্গে সম্রাট শাহ আলমের আদানপ্রদান নিয়ে বিতর্ক চলার সময়ে ইতেশাম উদ্দীনকে সম্রাট মীর্জা উপাধি দিয়ে তাঁর মারফত ইংল্যান্ডের রাজার কাছে একটি পত্র পাঠাতে চান। ওদিকে, সুইন্টন ততোদিনে কম্পেনির চাকরি থেকে পদত্যাগ করে সম্রাটের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাই সুইন্টনের সঙ্গী হিশেবে সম্রাট ইতেশাম উদ্দীনকে তাঁর দূত নিয়োগ করে লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন।

কথা ছিলো যে, ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জের জন্যে তিনি এবং ক্যাপ্টেন সুইন্টন সম্রাটের একটি চিঠি ছাড়াও নজরানা হিশেবে এক লাখ টাকা নিয়ে যাবেন। কিন্তু এই চিঠি এবং টাকা উভয়ই পড়েছিলো লর্ড ক্লাইভের হাতে। ক্লাইভের ইচ্ছে ছিলো না যে, রাজার কাছে এগুলো পৌঁছাক। তার কারণ, এই চিঠিতে সম্রাট কিছু অভিযোগ করেছিলেন কম্পেনির নানা রকমের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই সম্রাটের কাছ থেকেই ক্লাইভ বঙ্গের দেওয়ানি লাভ করেছিলেন। সম্রাটের অভিযোগ যাতে রাজার কাছে পৌঁছাতে না-পারে, সে জন্যে ইতেশাম উদ্দীন এবং সুইন্টনের যাওয়ার ব্যাপারে তিনি নানা রকমের বাধা দিচ্ছিলেন।

তাঁদের যাত্রা প্রায় এক বছর বিলম্বিত করে দেওয়া সত্ত্বেও সময়কালে সম্রাটের চিঠি অথবা টাকাও ইতেশাম উদ্দীনের হাতে এসে পৌঁছেনি। ফলে খালি হাতেই ক্যাপ্টেন সুইন্টনের সঙ্গে ইতেশাম উদ্দীন হুগলি থেকে একটি ফরাসি জাহাজে করে বিলেত যাত্রা করেন ১৭৬৬ সালের জানুয়ারির শেষ দিকে অথবা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে (মাঘ মাসে)। এর দু বছর ন মাস পরে — ১৭৬৮ সালের অক্টোবরে (কার্তিক মাসে) তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার প্রায় পনেরো বছর পরে — ১৭৮৪-৮৫ সালে *শিগরিফ-নামাহ-ই বিলায়েত* অর্থাৎ বিলাতের আশ্চর্যজনক গল্প নামে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। ওদিকে, সম্রাটের চিঠি আর উপঢৌকন কোনো দিনই আর রাজার কাছে পৌঁছেনি।

কলকাতা থেকে যাত্রা করার মাস ছয়েক পরে তিনি গিয়ে বিলেতে পৌঁছান। এতো দীর্ঘ সময় লাগার কারণ, তখনো সুয়েজ হয়ে যাওয়ার উপায় ছিলো না। তিনি গিয়েছিলেন মরিশাস, কেইপ, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল এবং ফ্রান্সের উপকূল হয়ে। ফেরার সময়ে তিনি পথে কাটিয়েছিলেন এক বছরেরও বেশি সময়। তার মধ্যে মাদ্রাসে ছিলেন সাত মাস। বিলেতে এবং স্কটল্যান্ডে তিনি সব মিলে বছর খানেক ছিলেন। যেহেতু বিলেতের অনেকেই তখন ভারতবর্ষে গিয়ে ব্যবসা এবং চাকরি করে রাতারাতি 'নবাব' হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন, সে জন্যে তাঁর কাছ থেকে ফারসি এবং হিন্দুস্তানি শেখার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন বহুজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আরও তিন-চার বছর বিলেতে রাখতে খুবই উৎসাহী ছিলেন ক্যাপ্টেন সুইন্টন। সুইন্টন বলেছিলেন যে, এ জন্যে দরকার হলে ইসলামী আইন অনুযায়ী ইতেশাম বিলেতেই এক বা একাধিক বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু ইতেশাম উদ্দীন তাতে রাজি হননি। হারাম খাদ্য এবং মদ্যপান সম্পর্কে তিনি বিশেষ স্পর্শকাতর ছিলেন। হয়তো এটাই তাঁকে দেশে ফিরতে বাধ্য করেছিলো। তা ছাড়া, তিনি ইংরেজি শিখতে পারেননি বলে সব সময়ে ক্যাপ্টেন সুইন্টনের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হতো। তাও তাঁর ভালো লাগেনি — বিশেষ করে সুইন্টনের সঙ্গে যখন তাঁর মতানৈক্য প্রকট হয়ে দেখা দিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর রাঁধুনিকে। একবার সেই রাঁধুনিকে ছাড়া তাঁকে এডিনবরা থেকে লন্ডনে যেতে হয়েছিলো। তখন খাবারের অভাবে তাঁর যে-ভোগান্তি হয়েছিলো এবং তাঁর যে নিজের রান্না করে খেতে হয়েছিলো, তিনি তাঁর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

লন্ডনের রাস্তার পরিকল্পনা দেখে তিনি তার প্রশংসা করেছিলেন। নগরীর বিশালত্ব এবং সৌন্দর্যেরও। লন্ডনের বাইরে ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডের একাধিক শহর তিনি দেখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি অক্সফোর্ডে গিয়ে সেখানকার 'মাদ্রাসা' অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানেই উইলিয়াম জোনসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো। অধ্যাপক হান্ট এবং জোনস উভয়ই তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু ইতেশাম উদ্দীন পণ্ডিত-প্রবর জোনসের ফারসি এবং আরবির জ্ঞানে বিশেষ মুগ্ধ হতে পারেননি।

বিলেতের সমাজ এবং মানুষের জীবনযাত্রা দেখেও তিনি খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। নিজের দেশের সঙ্গে তিনি তাই বারবার এসবের তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, নিজের দেশের কাঁটাও বিদেশের ফুলের থেকে ভালো — এ কথা পষ্ট করে লিখলেও তিনি বিলেতের যা কিছু ভালো দেখেছিলেন, তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে কুণ্ঠিত হননি। প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছিলো বিলেতের নারীদের। তাঁদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন যে, তাঁরা হলেন হুরি বা স্বর্গীয় অপ্সরীদের মতো —

তাঁদের দেখলে পরীরাও লজ্জায় মুখ লুকোবে। বিলেতে পছন্দ করে বিয়ে করার যে-পদ্ধতি চালু ছিলো, তিনি তারও প্রশংসা করেছেন, তবে এর ফলে অসুন্দরী এবং গরিব মেয়েদের অনেকের বিয়েই হয় না — এটা তাঁর ভালো লাগেনি। সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। মেয়েরাও যে লেখাপড়া এবং নাচ-গান শেখেন তাও উল্লেখ করতে ভুলে যাননি। পার্কে গিয়ে নারীপুরুষরা মেলামেশা করেন, এমন কি, প্রেম করেন এবং পুলিশ তাতে বাধা দেয় না — এটা লক্ষ্য করে তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন। বিলেতি সমাজের নানা দিক, শাসনব্যবস্থা, বিচার-বিভাগ ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। মানুষ কী ধরনের খাদ্য উৎপাদন করেন এবং কী খান তারও মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিবরণ থেকে। উচ্ছ্বসিতভাবে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন যার, তা হলো সেখানে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা হয়েছে সে বিষয়ে। এর অনেকগুলো দৃষ্টান্তও তিনি দিয়েছিলেন।

কালো আদমী হিশেবে তিনি যে-সাধারণ মানুষের কাছে নিজেই একটা দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন, ইতেশাম উদ্দীন তা লিখতে ভুলে যাননি। তবে তাঁর মনে হয়েছে যে, সাধারণ মানুষ তাঁকে সম্মান এবং সহানুভূতির সঙ্গেই দেখেছেন। এমন কি, একবার সংকোচ কাটিয়ে ওঠার পর মেয়েরাও তাঁকে বাজারে দেখলে কেউ কেউ তাঁদের সৌজন্যমূলক চুম্বন দেওয়ার আহ্বান জানাতেন। তাঁর চলাফেরা, জীবনযাত্রা এবং জাঁকজমক দিয়ে তিনি ইংরেজদের চোখে ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি রচনা করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে তিনি লিখেছেন যে, বিলেতের লোকেরা হিন্দুস্তানী অর্থাৎ ভারতীয় বললে বুঝতেন চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা থেকে যাওয়া জাহাজের খালাসিদের। কিন্তু তাঁকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, অন্য ধরনের ভারতীয়ও আছেন।

আঠারো শতকের শেষে — ১৭৯৯ সালে আর-একজন উচ্চশিক্ষিত মুসলমান পর্যটক বিলেতে গিয়েছিলেন, যাঁর নাম মীর্জা আবু তালিব খান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি স্বল্পকালের জন্যে মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনে কাজ করেছেন। কলকাতা থেকে তিনি বিলেতের উদ্দেশে যাত্রা করেন ১৭৯৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আর লন্ডনে পৌঁছেছিলেন ১৮০০ সালের ২১শে জানুয়ারি। ইনি বছর তিনেক কলকাতায় বাস করেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষা জানতেন বলে মনে হয় না। তাঁর জন্মও বঙ্গদেশে নয়, লাখনৌতে (১৭৫২ সালে)। লাখনৌ-এর নবাবের কাজ ছেড়ে যখন কলকাতায় বাস করছিলেন, তখন সেখানে ক্যাপটেন ডেভিড রিচার্ডসন নামে একজন স্কটিশ কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। রিচার্ডসন ভালো ফারসি এবং হিন্দুস্তানী জানতেন। তাঁরই আহ্বানে তিনি কলকাতা থেকে বিলেত ভ্রমণে যান। তিনি গিয়েছিলেন কেইপ হয়ে।

জুন মাসের শেষ দিকে সেখানে পৌঁছে সেপ্টেম্বর মাস অবধি সেখানে বাস করতে বাধ্য হন।

কেইপের সৌন্দর্য দেখে তিনি তার মুগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন আর দিয়েছেন সেখানকার নারীপুরুষের বর্ণনা। জাহাজে থাকার সময়ে রিচার্ডসনের কাছ থেকে তিনি কাজ চালানোর মতো ইংরেজি শিখে নিয়েছিলেন। কেইপ থেকে তিনি একটি ভিন্ন জাহাজে করে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি যাত্রা করেন। কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলের মুখে পৌঁছে এমন প্রতিকূল বায়ুর মুখে পড়েন যে, জাহাজটিকে ক্যাপটেন ইংল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল দিয়ে আয়ারল্যান্ডের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। তারপর সেখানে ৬ই ডিসেম্বর নোঙর করেন কর্ক শহরে। পরের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আর-একজন আধা-বাঙালির, যাঁর নাম শেখ দীন মহাম্মদ। দীন মহাম্মদকে আবু তালিব মুরশিদাবাদের লোক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দীন মহাম্মদ সম্পর্কে অন্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি জন্মেছিলেন পাটনায়। স্বীকার করতে হবে যে, পাটনায় জন্মগ্রহণ করলেও মূলে তিনি মুরশিদাবাদের লোক হতে পারেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে তিনি ঢাকার যে-ঘনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম ধারণা করেন যে, পাটনা থেকে আসা ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির একজন সৈন্যের পক্ষে তা সম্ভব নয়, বরং তিনি বাঙালিই ছিলেন। এঁর প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করবো একটু পরেই।

কর্ক থেকে ডাবলিনে গিয়ে আবু তালিব কর্নওয়ালিসের সঙ্গে দেখা করেন এবং কর্নওয়ালিস তাঁকে খুবই সৌজন্য দেখিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে নিমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে যে-কয় সপ্তাহ ছিলেন, তখন প্রতি সপ্তাহে আবু তালিব গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। এখানে তিনি কলকাতায় তাঁর এক বন্ধু — ব্রুকসের বাড়িতেও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। ব্রুকসের স্ত্রী যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি সুন্দরী ছিলেন তাঁর কন্যারা। এই তিনটি কন্যাকে দেখে তিনি তাঁদের হুরিদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৬ই জানুয়ারি একটি জাহাজে করে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করে তিনি চেস্টার থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে লন্ডনে এসে পৌঁছান ২১শে জানুয়ারি, যে-লন্ডনে আসার জন্যে তিনি কলকাতা থেকে যাত্রা করেছিলেন ৩৪৭ দিন আগে।

কেবল ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড নয়, ফেরার পথে ফ্রান্স এবং সুইৎজারল্যান্ড-সহ ইউরোপের কোনো কোনো জায়গা তিনি ভ্রমণ করেন। তা ছাড়া, তিনি তুরস্ক এবং ইরাকে (বাগদাদে) গিয়েছিলেন। বোম্বাই হয়ে ১৮০৩ সালের চৌঠা অগস্ট তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তারপর মুরশিদাবাদে গিয়ে দুই খণ্ডে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী এবং ইউরোপীয় জীবনযাত্রার বিবরণ লেখেন। বিলেতফেরত বলে তিনি নিজেকে মীর্জা আবু তালিব লন্ডনী বলে ডাকা পছন্দ করতেন।

ইতেশাম উদ্দীনের সঙ্গে আবু তালিব খানের মস্ত মিল হলো এখানে যে, এঁরা দুজনই ছিলেন শিক্ষিত এবং অভিজাত ব্যক্তি। তবে ইতেশাম উদ্দীনের তুলনায় মীর্জা আবু তালিব ছিলেন অনেক বড়ো পণ্ডিত এবং অভিজাত। সেদিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে তুলনা চলে না। আবু তালিবের চেহারা এতো সুন্দর ছিলো এবং তিনি লন্ডনে এমন জাঁকজমকের সঙ্গে চলাফেরা করতেন যে, তাঁকে অনেকেই পারস্যের রাজকুমার বলে আখ্যায়িত করতেন। ইতেশাম এবং তালিবের মধ্যে আর-একটা মিল হলো: এঁরা দুজনই ইংরেজ সমাজ এবং জীবনযাত্রা দিয়ে দারুণ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং দেশে ফিরে তাঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আর-একটা মিল হলো এই যে, দুজন ইংরেজদের কাছে ভারতীয়দের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে আবু তালিব লন্ডনের অভিজাত সমাজের সঙ্গে যেমন ওঠা-বসা করেছেন, ইতেশাম উদ্দীন তা করতে পারেননি। আবু তালিব রাজা তৃতীয় জর্জ এবং রানী শারলটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে দেখে বেশ পছন্দ করেছিলেন। রাজা তাঁকে আবার তাঁর দরবারে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন। এই ঘটনার পর রাজপরিবারের সদস্য-সহ অনেক অভিজাত ব্যক্তিই তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।



মীর্জা আবু তালিব খান

আবু তালিবের ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় যে, তিনি ইংল্যান্ডের জীবনযাত্রা দেখে একই সঙ্গে প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং কোনো কোনো বিষয়ে হতাশ হয়েছিলেন। সে সমাজের যেসব জিনিশ দেখে তাঁর খুব ভালো লেগেছিলো, তার মধ্যে একটা হলো: মহিলাদের অবাধে চলাফেরা এবং শিক্ষা, আর সমাজ ও পরিবারে তাঁদের তুলনামূলক স্বাধীনতা। মহিলারা অনেকে যে কাজ করেন, এরও তিনি প্রশংসা করেছিলেন। যেসব দোকানে মহিলারা কাজ করেন, সেসব দোকানে যে বেশি লোক যায়, তাও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি নিজে যেমন এক কফির দোকানে যেতেন প্রায়ই — সে দোকানে একটি খুবই সুন্দরী মেয়ে কাজ করতেন বলে।

লন্ডনে তিনি থাকতেন বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে — নবাবের মতো। কথাবার্তায় তিনি

ছিলেন রসিক এবং চলাফেরা করতেন সমাজের ওপর তলার লোকেদের সঙ্গে। ইংরেজ রমণীরাও অনেকে তাঁর প্রতি কৌতূহল দেখাতেন। পরিচয় না-দিলেও তিনি লিখেছেন যে, একবার এক ইংরেজ নারীর সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয় হয়েছিলো। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে অক্সফোর্ড এবং তার কাছেই সাবেক গভর্নর-জেনরেল হেস্টিংসের বাড়িতে বেড়াতে যান। সেখানে থেকে এই বন্ধু তাঁকে কিছু দিনের জন্যে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু আবু তালিব রাজি হননি। কারণ, তাঁর মনে তাঁর প্রণয়িনীর জন্যে বিশেষ বিরহ জেগে উঠেছিলো। তিনি তাই তাড়াতাড়ি লন্ডনে ফিরে আসেন।

এই রমণী ছাড়া অন্য বেশ কয়েকজন ইংরেজ রমণীর কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি কোনো পার্টিতে গেলে সাধারণভাবেও ইংরেজ মহিলারা তাঁর প্রতি বেশ আগ্রহ দেখাতেন। একবার এক পার্টিতে, মহিলাদের আমন্ত্রণে তিনি একের পর এক টেবিলে গিয়ে যোগদান করেন এবং প্রতি টেবিলে তাঁদের সঙ্গে অন্তত এক গ্লাস করে মদ্যপান করেন। তিনি লিখেছেন, একনাগাড়ে তিনি কোনোদিন এ রকম মদ্যপান করেননি।

আবু তালিব ইংরেজ মহিলাদের সৌন্দর্যে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁদের সঙ্গে কেবল 'আরব্য রজনী'তে বর্ণিত মহিলাদের তুলনা করার কথা ভাবতে পেরেছিলেন। সত্যি বলতে কি, কেবল আবু তালিবই শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের দেখে বিগলিত হননি, সেকালে যাঁরাই বিলেত যেতেন, তাঁরা প্রায় সবাই ইংরেজ মহিলাদের দেখে কমবেশি মুগ্ধ হতেন। ইতেশাম উদ্দীনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি বিলেতি নারীদের পরীদের চেয়েও বেশি সুন্দর বলে বর্ণনা করেছিলেন। অনেক বছর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেতে গিয়ে ইংরেজ রমণীদের পরীদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ড থেকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ কৃষিবিদ গিরিশচন্দ্র বসুও ইংরেজ নারীদের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, এই নারীদের চাঁদের হাট দেখে ধরাধামে নয়ন সার্থক করা উচিত।

সে যাই হোক, আবু তালিবের ভ্রমণকাহিনীতে ইংল্যান্ডের নারীদের কথাই নয়, বরং বিস্তারিত বিবরণ আছে দেশ, সমাজ, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে। তিনি ছিলেন সমাজ এবং বিজ্ঞান-সচেতন মানুষ। সে জন্যেই ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানের উন্নতি পর্যন্ত অনেক বিষয়ই আলোচনা করেছেন। অক্সফোর্ডে গিয়ে অ্যানাটমির উন্নতি দেখে তিনি তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। আবার গ্রীনিচে গিয়ে সেখানকার মানমন্দির এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি দেখেও মুগ্ধ হন। গ্রন্থাগার সম্পর্কেও তাঁর খুব কৌতূহল ছিলো। রাজা তৃতীয় জর্জ এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

গ্রন্থাগারের কথা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের তিনি প্রশংসা করেন।

ইংরেজ সমাজ ও পরিবারে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতি যে-সম্মান দেখানোর রীতি তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, ইতেশাম উদ্দীন এবং মীর্জা আবু তালিব — উভয়ই তার সপ্রশংস বর্ণনা দেন। আবু তালিব অবশ্য সমালোচনাও করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, সম্পত্তিতে ইংরেজ মহিলাদের কোনো আইনগত অধিকার নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে আছে। আবু তালিবের এই সমালোচনা সত্ত্বেও ইংরেজ পরিবার এবং সমাজে মহিলাদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা যে বেশি, সে সম্পর্কে তিনি এবং অন্য পর্যটকরা সবাই কমবেশি অনুকূল মন্তব্য করেছেন। এ সম্পর্কে আমরা পরে আরও বিস্তারিত দেখতে পাবো।

কাজের লোকের প্রতি সম্মান দেখানোর একটি নজির দেখে আবু তালিব অবাক হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে সমাজের নিচের তলার মানুষের প্রতি যে-সম্মানবর্জিত রূঢ় আচরণ করা হয়, তার সঙ্গে বিলেতের সমাজের পার্থক্য কেবল তাঁর চোখে পড়েনি, বরং তাঁর চোখে বিসদৃশ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। তাই তিনি এই ভৃত্যের মুনিবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কাজের লোকের সঙ্গে এতোটা ভদ্রতা করার কী প্রয়োজন। তারপর মুনিবের উত্তর শুনে তিনি তার প্রশংসা করেন। ইংরেজদের চরিত্রের বারোটি দোষ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে তিনি তাঁর গ্রন্থে একটি আলাদা অধ্যায় রচনা করেছিলেন। আবার ইংরেজদের গুণাবলী নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বিলেতে থাকার সময়ে নানা ধরনের কাজ করেছেন তিনি। তার মধ্যে বিশেষ করে ছিলো ফারসি এবং হিন্দুস্তানী শেখানোর কাজ। তখন যে-ইংরেজরা ভারতবর্ষে যেতেন, তাঁরা অনেকেই কাজ চালাবার মতো খানিকটা ফারসি আর হিন্দুস্তানী শিখে যেতে চেষ্টা করতেন। যেসব মুনশি বিলেতে গিয়েছিলেন, হয় তাঁদের কাছ থেকে, নয়তো যেসব ইংরেজ এসব ভাষা শিখে দেশে ফিরেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ ভাষা শিক্ষা করে তবে এসব তরুণ কর্মচারী ভারতে যেতেন। এভাবে শেখার কারণ, তখনো হেইলিবেরি কলেজে এসব ভাষা শেখানোর কাজ আরম্ভ হয়নি। সে জন্যে আবু তালিব লন্ডন অথবা অক্সফোর্ডে ভাষা শিক্ষার একটি স্কুল করার পরিকল্পনা নিয়েই ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের আগ্রহের অভাবে তা সম্ভব হয়নি। ভাবী হেইলিবেরি কলেজের অধ্যাপকের পদ পেতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর চাকরি হয়নি, কারণ কর্তৃপক্ষের মতে, তাঁর চাহিদা ছিলো খুব বেশি। তবে শেষ পর্যন্ত কম্পেনির পরিচালকরা যখন তাঁকে তাঁর চাহিদা-মতো ছ শো পাউন্ড বেতন দিয়ে এই কাজে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান ১৮০৬ সালে, তার

কয়েক দিন আগেই তিনি ইংল্যান্ডের থেকেও (ধারণা করি) আকর্ষণীয় স্থান – স্বর্গে গমন করেন।

তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী ১৮১০ সালে চার্লস স্টুয়ার্ট ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। ইংরেজি ছাড়া, ফরাসি এবং জার্মান ভাষাতেও এই গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিলো। অপর পক্ষে, ইতেশাম উদ্দীনের ভ্রমণকাহিনী ইংরেজিতে অনূদিত হয় ১৮২৭ সালে।

উনিশ শতকে বিলেতযাত্রীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এমন কি, এই নতুন যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বিলেতেই থেকে যান। যাঁরা একেবারে প্রথম দিকে বিলেতে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে একজন খুব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন শেখ দীন মহাম্মদ। তিনি বাঙালি ছিলেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তাঁর কথা একটু বিস্তারিত বলা দরকার। দরকার এ জন্যে যে, তা থেকে একটা ধারণা করা সম্ভব যে, তখন বিলেতে গেলে ভারতীয়রা কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন।



শেখ দীন মহাম্মদ

দীন মহাম্মদ পাটনায় জন্মেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতার কোনো উল্লেখ তিনি করেননি। দশ বছর বয়স থেকে তিনি ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন এনসাইন গডফ্রে এভান্স বেইকারের আশ্রয় লাভ করেন এবং তারপর কাজ শুরু করেন বেঙ্গল আর্মিতে। ১৭৮৩ সালে তিনি আয়ারল্যান্ডের কর্কে আসেন ক্যাপ্টেন বেইকারের সঙ্গে। এখানে বেইকারের পিতা মেয়র ছিলেন এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও বাস করতেন। দীন মহাম্মদ তাঁদের আশ্রয়েই থেকে যান। তাঁরা তাঁকে লেখাপড়া শেখাতে স্কুলে পাঠান। দু বছর পরে তিনি জেইন ডেলি নামে এক অ্যাংলো-আইরিশ ছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যান এবং তাঁকে বিয়ে করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে – ১৭৯৪ সালে – তিনি কর্ক থেকে ইংরেজিতে তাঁর একটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশ করেন। এক দশক পরে ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি তাঁর

সন্তানদের নিয়ে লন্ডনে আসেন ১৮০৫ সালে। তার আগেই সম্ভবত তাঁর স্ত্রী মারা যান। তাই পরের বছর তিনি জেইন জেফ্রিস নামে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। তবে লন্ডনে বিয়ে করলেও তিনি সহজে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। মাইকেল ফিশার তাঁর জীবন-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত কিন্তু চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন।

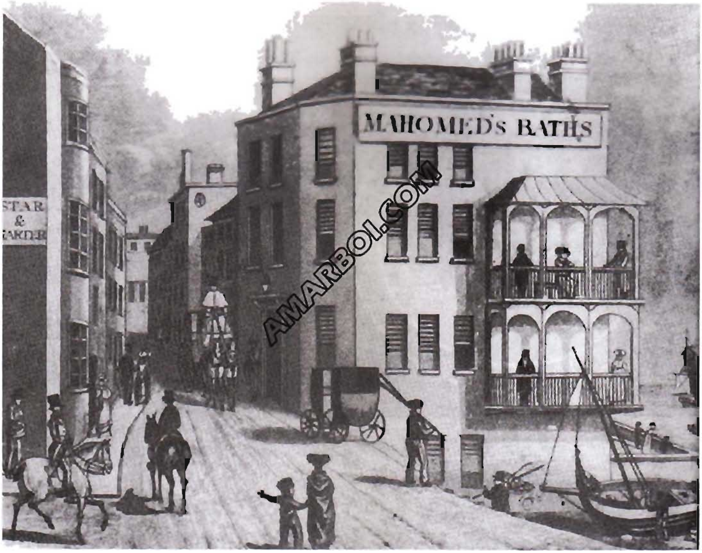
১৮১০ সালে তিনি লন্ডনের অভিজাত এলাকা পোর্টল্যান্ডে প্রথম ভারতীয় কফির দোকান খোলেন। দোকানটিতে তিনি যদ্দুর সম্ভব ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে এর মধ্যে একটা ভারতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। হুঁকোতে খাঁটি চিলুম তামাক খাওয়ার ব্যবস্থাও তিনি এখানে রেখেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন ভারতীয় খাদ্যের। বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দোকানের মতো 'কারি' ইংল্যান্ডে কোথাও কেউ দেখেনি। একুশ শতকের গোড়ায় এখন ইংল্যান্ডে হাজার হাজার ভারতীয় রেস্টুরেন্ট আছে। তাঁর এই কফির দোকান থেকেই তার সূচনা হয়। তখন লন্ডনে ভারতীয় ছিলেন মুষ্টিমেয়। তাই তাঁর কফি হাউসে আসতেন প্রধানত ভারত থেকে ফিরে-আসা ইংরেজরা। শহরের যে-এলাকায় দোকান দিলে আরও বেশি লোককে আকৃষ্ট করা যেতো, তাঁর দোকান সেখানে ছিলো না। সুতরাং বছর খানেক পরে দোকানটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় তিনি একজন ইংরেজ শরিক নেন তাঁর সঙ্গে। তার ফলে দোকানটি কোনো মতে আরও এক বছর চলে। কিন্তু ১৮১২ সালে তিনি নিজেকে দেউলে ঘোষণা করেন। এর পর শুরু হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম। এ সময়ে তিনি অন্যের বাবুর্চি অথবা খিদমতগার হিশেবে কাজ করার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কোনো কিছুতেই তিনি জুৎ করতে পারছিলেন না। তাঁর ছেলে কাজ করতো পোস্টম্যানের, কিন্তু সে আয় যথেষ্ট ছিলো না। ১৮১৪ সালে তাই তিনি নতুন জীবিকার সন্ধানে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলীয় শহর ব্রাইটনে চলে যান।



দীন মহাম্মদের কফি হাউসের ওপর স্মৃতিফলক

ব্রাইটনে তিনি একটি স্নানাগার স্থাপন করেন। সেই স্নানাগারের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি সেখানে বাষ্পীয় স্নানের এবং শরীর-মর্দনের ব্যবস্থা করেন। তিনি দাবি করেন যে, এই পদ্ধতি দিয়ে অনেক রোগ ভালো করা যায়। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন

শ্যাম্পু চিকিৎসা। শ্যাম্পু শব্দটির উৎস হলো: হিন্দী চাম্পু শব্দটি। দীন মহাম্মদ তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার পর ইংরেজি ভাষায় এই শব্দের জন্ম হয়। প্রথমে অনেকে তাঁকে বুজরুক বলে গণ্য করলেও, শেষ পর্যন্ত অনেক রোগী জুটে যায় তাঁর। এমন কি, রাজা চতুর্থ জর্জ, তারপর রাজা চতুর্থ উইলিয়াম এবং প্রখ্যাত রাজনীতিক (পরে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন) রবার্ট পীল-সহ তাঁর রোগীদের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শ্যাম্পু চিকিৎসার চাহিদা এতো বেড়ে যায় যে, ব্রাইটনে কয়েকটি জায়গায় তিনি তাঁর স্নানাগারের শাখা স্থাপন করেন। যে-রোগীরা তাঁর শ্যাম্পু-চিকিৎসা দিয়ে উপকৃত



ব্রাইটনে দীন মহাম্মদের স্নানাগার

হয়েছিলেন, তাঁদের প্রশংসামূলক মন্তব্য দিয়ে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তা ছাড়া, তিনি তাঁর চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়েও একটি বই প্রকাশ করেন (১৮২২)। কয়েক বছরের মধ্যে এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ থেকে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং স্নানাগারের সাফল্য সহজেই অনুমান করা সম্ভব। বস্তুত, তাঁর স্নানাগারের সাফল্য দেখে তিনি লন্ডনেও একটি শাখা স্থাপন করেন। তা ছাড়া, ইংরেজরাও কেউ কেউ তাঁর অনুকরণে স্নানাগার স্থাপন করেন। ব্রাইটনের বিশিষ্ট নাগরিকে পরিণত

হন তিনি। ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সবার আগে ভোটার হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। কিন্তু ১৮৩৭ সালে ভিক্টোরিয়া রানী হওয়ার পর এই চিকিৎসা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা লোপ পায় এবং শেখ দীন মহাম্মদও তাঁর সচ্ছলতা হারান। এর পর তিনি লন্ডনে বাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর পুত্রেরা ভিন্ন জীবিকার অন্বেষণও করেন।

দীন মহাম্মদের চিকিৎসা পদ্ধতি কতোটা কার্যকর ছিলো, তাতে সন্দেহ থাকলেও চিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর পৌত্রদের সত্যিকারের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পৌত্রদের মধ্যে ফ্রেডারিক আকবর উনিশ শতকের শেষ দিকে নাম-করা চিকিৎসক হিশেবে পরিচিত হন। তিনিই প্রথম রক্তচাপ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রও তৈরি করেন তিনি। তা ছাড়া, রোগ ও রোগীদের সম্পর্কে জরিপ করে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা আবিষ্কারের পদ্ধতিও তিনিই প্রথমবারের মতো প্রচলন করেন। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ৩৫ বছর। তারই মধ্যে তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে তাঁর গবেষণাকর্মের নতুন করে মূল্যায়ন হচ্ছে। আকবরের এক পুত্রও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম-করা ছাত্র হয়েছিলেন।


ফ্রেডারিক আকবর

শেখ দীন মহম্মদ এবং তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা বিলেতের সমাজের সঙ্গে প্রায় মিশে যেতে পেরেছিলেন। তাঁরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় এই কাজ সহজ হয়েছিলো। এই মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্যে কর্ক এবং ইংল্যান্ডে অবস্থিত তাঁর পরিবারের দুই শাখা পরবর্তী কালে নিজেদের বংশ-নামও বদলে ইংরেজি ধরনের নাম গ্রহণ করেন। এক শাখার নাম হয় ডীন, অন্য শাখার রাইডার। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে থেকে যান, তাঁদের মধ্যে সবার আগে দীন মহাম্মদের কথা বলতে হয় — সময় এবং সাফল্যের দিক দিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, অন্য যাঁরা উনিশ শতকের গোড়ায় বিলেতে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছিলেন, দীন মহাম্মদের মতো তাঁরা সবাই নামে-মাত্র হলেও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ ধর্মান্তর ছাড়া তখন কোনো ইংরেজ নারীর সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিলো না। বঙ্গদেশ থেকে যে-আয়া এবং ক্রীতদাস ও

ক্রীতদাসীরা ইংল্যান্ডে থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরাও অনেকে ধর্মান্তর করেছিলেন বলে জানা যায়। এমন কি, বহুজন নিজেদের নামগুলোকেও যদ্দুর সম্ভব ইংরেজি বানানে লিখেছিলেন। যেমন, উইলিয়াম হিকির ভৃত্য Munnow বিলেতেই থেকে যান এবং এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। বিয়ের জন্যে খৃস্টান হয়ে তিনি পরিচিত হন William Munnow নামে। অতঃপর তাঁর দশ সন্তানের বংশ-নামই হয়ে যায় Munnow।

হেইলিবেরি কলেজের শিক্ষক Moolvy Abdool Alee (মৌলভি আবদুল আলি) ১৮০৮ সালে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। এই মহিলা পরিচিত হন Mrs Moolvy নামে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করার জন্যে আবদুল আলি মৌলভিকে নামে মাত্র হলেও খৃস্টান হতে হয়েছিলো। গোলাম হায়দার এবং মীর হাসান আলিও ইংরেজ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। মীর হাসান আলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে গিয়েছিলেন। বিডি টিমস নামে এই স্ত্রী অনেক বছর ভারতবর্ষে বাস করার পর স্বদেশে ফিরে এসে ভারতীয় মুসলমানদের নিয়ে *Observations on the Mussulmans of India* (১৮৩২) নামে দুই খণ্ডে একটি বই লিখেছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁর আনুগত্য লোপ পায়নি। লেখিকা হিশেবে তিনি নিজের নাম দেন মিসেস মীর হাসান আলি।

ইতেশাম উদ্দীন, শেখ দীন মহম্মদ, মীর্জা আবু তালিব প্রমুখ যে বিলেতে যেতে পেরেছিলেন, তার আংশিক কারণ, মুসলমানদের মধ্যে কালাপানি পার হওয়ায় কোনো নিষেধ ছিলো না। তা ছাড়া, লেখাপড়া জানা মুসলমানদের ভাষা শেখানোর কাজে চাহিদাও ছিলো। তাঁরা কম্পেনির কর্মচারী এবং ভাবী কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শেখাতেন, বিশেষ করে হিন্দুস্তানী এবং ফারসি। এক ঘণ্টা শিক্ষাদানের জন্যে এঁদের কেউ কেউ এক গিনি পর্যন্ত দাবি করতেন। আর, কম্পেনির হেইলিবেরি কলেজে (১৮০৫ সালে স্থাপিত) যে-মুনশিরা ভাষা শেখানোর কাজ করতেন, তাঁদের কেউ কেউ বাৎসরিক দু শো পাউন্ড বেতন পেতেন। সেকালের মাপে একে খুবই বেশি বেতন বলে গণ্য করা যায়। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, মীর্জা আবু তালিব যে-বেতন দাবি করেছিলেন, তা ছিলো প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের বেশি – বার্ষিক ছ শো পাউন্ড।

এ তো গেলো মুসলমানদের কথা। অপর দিকে, রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষে লোকাচার অমান্য করে কালাপানি পার হওয়া আদৌ সহজ ছিলো না। তাই আঠারো শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে বলতে গেলে কোনো বাঙালি হিন্দু বিলেত যাননি – একজন ছাড়া। তাঁর নাম ঘনশ্যাম দাস বলে মনে হয়। মনে হয়

বলার কারণ এই যে, ইংরেজি বানানে তাঁর নাম এক-এক জায়গায় এক-এক রকম লেখা হয়েছে। যেমন, ১৭৭২ সালের চৌঠা অগস্টে অনুষ্ঠিত কমিটি অব করেসপন্ডেন্সের সভার সিদ্ধান্তে তাঁর নামের বানান লেখা আছে Ganashumdass। কিন্তু তার পরের দিন অনুষ্ঠিত কোর্ট ডিরেক্টরদের সভার সিদ্ধান্তে তাঁর নামের বানান Gonyshandass. হাউস অব কমন্সের প্রতিবেদনে তাঁর নাম লেখা হয়েছে Goneshumdass। মাইকেল ফিশার তাঁর *Counterflows to Colonialasm* গ্রন্থে এঁর নামের বানান লিখেছেন Ganeshundass। কিন্তু আমার ধারণা, বিচারপতি অ্যালাইজা ইম্পের পক্ষে লিখিত সাক্ষী দিতে গিয়ে তিনি নিজের নামের যে-বানান লেখেন, সেটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। এই বানান হলোঃ Ghansiam Doss – যা প্রায় নিশ্চিতভাবে ঘনশ্যাম দাস।

ঘনশ্যাম প্রথমে ছিলেন কম্পেনির সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল গ্র্যাহামের ফারসি অনুবাদক। ১৭৭০ সালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনি তাদের এক কর্মকর্তা – ক্যাপ্টেন ফার্গুসনকে 'ইংরেজি-হিন্দুস্তানী হিন্দুস্তানী-ইংরেজি' অভিধান রচনা করার নির্দেশ দিয়েছিলো। ফার্গুসন সেই নির্দেশমতো একটি অভিধান রচনাও করেন। কিন্তু এই অভিধান তিনি ঠিকমতো রচনা করেছিলেন কিনা, ১৭৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে তা পরীক্ষা করা হয়েছিলো এই ঘনশ্যাম দাসের সাহায্যে। চৌঠা অগস্ট লন্ডনে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির কমিটি অব করেসপন্ডেন্স তাঁর এই সহায়তার কথা সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করে। পরের দিন কোর্ট অব ডিরেক্টর্সদের সভায় একটি ফারসি ব্যাকরণ লিখতে ঘনশ্যাম দাসকে উৎসাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফার্গুসনের এই অভিধান কোনো দিন প্রকাশিত হয়নি। ঘনশ্যাম দাসও ফারসি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেননি। কিন্তু ১৭৭৩ সালে তিনি পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে মহারাজা নন্দকুমারের মামলা সম্পর্কে সাক্ষী দিয়েছিলেন। নন্দকুমারকে লেখা নবাব নাজিম উদ দৌলার একটি চিঠি খাঁটি কিনা, সে সম্পর্কে তাঁকে বিশেষ করে প্রশ্ন করা হয়। এটা যাচাই করার জন্যে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি নন্দকুমারের হাতের লেখা চেনেন কিনা; তাঁর সীলমোহর চেনেন কিনা ইত্যাদি। এ ছাড়া তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করা হয় যে, কেউ চিঠি লেখায় জালিয়াতি করলে ভারতবর্ষীয় আইনে তার শাস্তি কী হতে পারে। ঘনশ্যাম দাস এসব প্রশ্নের উত্তর কোন ভাষায় দিয়েছিলেন, তা ঠিক জানা যায় না; কারণ তার কোনো উল্লেখ হাউস অব কমন্সের রিপোর্টে লেখা নেই। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন হয় দোভাষীর মাধ্যমে, নয়তো ভাঙা ইংরেজিতে।

ফারসি ব্যাকরণ লিখে ঘনশ্যাম দাস পুরস্কার না-পেলেও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে তিরস্কার পেয়েছিলেন। বস্তুত, লোকাচার অমান্য করে কালাপানি পার হওয়ায় তাঁকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিলো। সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনি যে-সাক্ষী দেন, তা

থেকে বোঝা যায়, কালাপানি পার হওয়ার ফল কী হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি খুব ভালো করেই অবহিত ছিলেন। সব শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, নন্দকুমারকে ইংল্যান্ডে আসতে বললে তিনি আসবেন কিনা। এর উত্তরে ঘনশ্যাম দাস বলেছিলেন যে, নন্দকুমার ব্রাহ্মণ, তাই তাঁর পক্ষে কালাপানি পার হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। হিন্দুরা কেউ এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে, তাঁরা জাতিচ্যুত হন। সুতরাং তাঁকে বাধ্য না-করলে তিনি আসবেন না। কালাপানি পার হওয়ার জন্যে জাত গেলে তার কোনো প্রতিকার আছে কিনা, সিলেক্ট কমিটি এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, দেশে ফিরে অর্থদণ্ড দিলে এবং প্রায়শ্চিত্ত করলে জাত ফিরে পাওয়া সম্ভব হতে পারে। তিনি জানান যে, তিনি নিজেও হিন্দু। কোনো বাঙালি হিন্দু লোকাচার অমান্য করে সাগর পাড়ি দেন কিনা, তার উত্তরে তিনি বলেন যে, বাঙালিদের মধ্যে এমন কোনো দৃষ্টান্ত তাঁর জানা নেই। তবে তিনি জানেন যে, মালাবারের লোকেরা হরহামেশা কালাপানি পার হয়ে থাকেন।

ঘনশ্যাম যখন দেশে ফিরে আসেন তখন অর্থদণ্ড দিয়ে এবং গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন কিনা, তার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিন বছর পরে – ১৭৭৬ সালে – তিনি যখন তাঁর নতুন মুনিব – সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর অ্যালাইজা ইম্পের পক্ষে লিখিত সাক্ষী দেন, তখন নিজের পুরো নাম লেখেন Robert Ghansiam Doss। এই সাক্ষ্যতে তিনি বলেছিলেন যে, ইম্পে নন্দকুমারের দাবি অনুসারে তাঁর জাতি রক্ষা করার ব্যাপারে আইন অনুযায়ী যতোটা করা যায়, তা করেছিলেন। ঘনশ্যাম ছিলেন ইম্পের ফারসি অনুবাদক। তাঁর নতুন নাম থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি রীতিমতো সমাজচ্যুত হয়েছিলেন এবং এই অবস্থার কোনো প্রতিকার করতে না-পেরে, খৃস্টধর্ম গ্রহণ করাকেই শ্রেয় বলে গণ্য করেছিলেন। কলকাতার চার্চের রেজিস্টারে অবশ্য তাঁর ব্যাপটিজমের কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু সি এফ অ্যান্ড্রুজের মতে, তাঁকে ধর্মান্তর করেছিলেন কলকাতার বিতর্কিত ডেনিশ ধর্মযাজক জন জাকারিয়া কিয়েরন্যান্ডার। হয়তো সে জন্যেই অ্যাংলিকান চার্চের রেজিস্টারে তাঁর নাম নেই।

বস্তুত, ঘনশ্যাম দাস ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। তখন কালাপানি পার হওয়ার প্রতি জনমত এতো প্রতিকূল ছিলো যে, সেই চাপ অগ্রাহ্য করে উনিশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত অন্য কোনো খ্যাত অথবা অখ্যাত বাঙালি হিন্দু ইংল্যান্ডের পথে পা বাড়াতে পেরেছিলেন বলে কোনো তথ্য জানা যায় না। এমন কি, তখনকার ইংরেজ পরিবারের আয়া অথবা উইলিয়াম হিকির মতো অবস্থাপন্ন ইংরেজের ব্যক্তিগত ভৃত্য হিশেবে যাঁরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বিশ্লেষণ করলেও সেগুলোকে বিশেষ করে কোনো হিন্দু-নাম বলে মনে হয় না; অন্তত কোনো বাঙালি হিন্দুর নাম বলে তো

নয়ই। শাসক হিশেবে ওয়ারেন হেস্টিংস ন্যায়-অন্যায় যেমনই করে থাকুন না কেন, তাঁর ভারত-প্রীতি ছিলো আন্তরিক। তিনি বাংলা-সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষায় আর্থিক উৎসাহ-সহ নানা রকমের পৃষ্ঠপোষণা দিয়েছিলেন। তিনি যখন কলকাতা থেকে স্বদেশে চলে যান, তখন দেশীয় বহু জিনিশের সঙ্গে বঙ্গদেশের অনেক ফুল-ফলের গাছও সঙ্গে নিয়েছিলেন। আর নিয়েছিলেন পাঁচ-ছ জন ভারতীয় ভৃত্য। কিন্তু এই ভৃত্যদের মধ্যে একজনও বাঙালি হিন্দু ছিলেন বলে মনে হয় না। এর পনেরো-ষোলো বছর পরে মীর্জা আবু তালিব যখন হেস্টিংসের এই ভৃত্যদের দেখেন, তখন তাঁদের সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি।

কালাপানি পার হওয়ার ব্যাপারে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এ রকমের তীব্র বিরোধিতা থাকলেও, পশ্চিম ভারত থেকে একাধিক হিন্দু প্রতিনিধি দল রাজা-মহারাজাদের ভাতা বৃদ্ধির উদ্দেশে অথবা অন্যান্য অভিযোগের প্রতিকারের জন্যে আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই বিলেত যেতে আরম্ভ করেন। যেমন, ১৭৮০ সালের দিকে মারাঠা-রাজ রঘুনাথ রাও পাঠিয়েছিলেন হনুমন্ত রাওকে। হনুমন্ত রাও ছিলেন অনেকটা ইতেশাম উদ্দীনের মতো। তিনি কালাপানি পার হলেও অখাদ্য খেয়ে জাত খোয়াতে রাজি ছিলেন না। ইতেশাম উদ্দীনের মতোই তিনি দরকার হলে না-খেয়ে থাকতেন, তবু অব্রাহ্মণের রান্না করা খাদ্য অথবা কোনো নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন না। ঘনশ্যাম দাসের মতো তিনিও পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সামনে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি অবশ্য ঘনশ্যাম দাসের মতো জাত হারাননি। বরং অনেক বছর পর্যন্ত অন্যরা তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন যে, কালাপানি পার হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

রাজা-মহারাজা এবং নবাব-সুলতানদের তরফ থেকে এ রকম প্রতিনিধি দল পাঠানোর উদ্যোগ উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বরং অনেক বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে ১৮৩০-এর দশক থেকে। সিপাহী বিপ্লবের আগে পর্যন্ত যাঁরা কোনো না কোনো অভিযোগের প্রতিকার করার জন্যে বিলেতে যান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন টিপু সুলতানের দুই পুত্র প্রিন্স জামাহুদ্দীন এবং গোলাম মোহাম্মদ, কুর্গের মহারাজার প্রতিনিধি দল, নেপালের প্রধানমন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর রানা, রামপুরের নবাব, কর্ণাটকের নবাব, সুরাটের নবাব এবং অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের প্রতিনিধিরা। বঙ্গদেশের কোনো প্রতিনিধি দল যায়নি। এ থেকে মনে হয়, কালাপানি পার হওয়ার ব্যাপারে বঙ্গদেশের মতো ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মনোভাব অতো প্রতিকূল ছিলো না। এ বিষয়ে ঘনশ্যাম দাসের মন্তব্যের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

কালাপানির নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে বাঙালিদের মনোভাবে পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে। এ সময়ে কলকাতা নগরীতে হিন্দু কলেজ এবং অন্য কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়। তা ছাড়া, কলকাতায় রাজধানী ছিলো বলে চাকরি এবং ব্যবসা সূত্রে অনেকেরই যোগাযোগ ঘটে ইংরেজদের সঙ্গে। এর ফলে খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি লোকাচারের প্রতি কারো কারো আনুগত্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। অনেকে আবার একই সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং জাত রাখতে চেষ্টা করেন। কারণ, ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সুফল এবং ইংরেজি শিক্ষার ইহলৌকিক সুবিধাগুলোর প্রতি তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অন্য দিকে, সমাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্যও তাঁরা ত্যাগ করতে পারেননি। তাই দিনের বেলা ইংরেজদের অফিসে চাকরি করে বাড়িতে ফেরার সময়ে গঙ্গায় স্নান করে 'পবিত্র' হয়ে ফেরার চেষ্টা করতেন অনেকেই।

ইহলৌকিক সুযোগসুবিধা ছাড়া, ইংরেজি শিক্ষা এবং সভ্যতা কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গিতেই মৌলিক পরিবর্তন আনছিলো। যে-কূপমণ্ডূকতা বাঙালিদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, নতুন যুগের ভোরে তা কেটে যেতে আরম্ভ করে। বাঙালি ঐতিহাসিকরা উনিশ শতকের জাগরণ এবং সৃজনশীলতার বিস্ফোরণকে সীমিত অর্থে রেনেসন্স বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেই রেনেসন্সের আলো বৃহত্তর পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে যথেষ্ট সময় লেগেছিলো ঠিকই; কিন্তু সমাজের শিখরে তার আলো পড়তে আরম্ভ করে আগেই। এই পরিবেশে আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্ভাসিত রামমোহন রায়ের মতো কোনো কোনো মুক্ত-মনা মানুষ স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন কালাপানি পার হয়ে বিলেত যাওয়ার। কেবল স্বপ্নই নয়, কিছুকালের মধ্যেই নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে এবং জাত যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই দু-একজন করে সমুদ্রযাত্রা করার কথা ভাবতে শুরু করেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষরা কেউ নয়। তাঁদের বিলেত যাওয়ার মতো আগ্রহ অথবা টাকাপয়সা — কোনোটাই ছিলো না। এবং তাঁদের কারো পক্ষে সমাজের শাসন এবং লোকাচার অগ্রাহ্য করারও উপায় ছিলো না। অগ্রাহ্য করতে পারলেন একমাত্র তাঁরাই, যাঁরা সমাজকে পরোয়া করতেন না।

এ রকমের দুজন দুঃসাহসী মানুষ ছিলেন রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁদের সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অর্থ এবং প্রতিপত্তি — তাঁদের দু-ই ছিলো। সমাজের রক্তচক্ষুকে তাঁরা তাই অমান্য করতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া, প্রচলিত রক্ষণশীল হিন্দু ধর্ম এবং লোকাচারে এঁদের ইমানও যে খুব মজবুত ছিলো, এমনটা বলা যায় না। রামমোহন ধার্মিক ছিলেন নিঃসন্দেহে। এমন কি, জাত রক্ষা করার ব্যাপারেও তিনি নাকি তৎপর ছিলেন। একজন লেখকের মতে, বিলেতে

যাওয়ার সময়ে তিনি গরুও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে দেশীয় গরুর দুধ খেয়ে জাত ঠিক রাখা যায়; যদিও আমার মনে হয় না, গরুর জাতিভেদেও তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তিনি কিছু জাতিভেদ মেনে চলতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন, জাহাজে যাওয়ার সময়ে খাওয়ার পর অন্যদের সঙ্গে একত্রে মদ্যপান করলেও, তিনি খেতেন তাঁর নিজের পাচকের রান্না। এগুলো সবই



রামমোহন রায়

শোনা কথা — অন্যরা লিখেছেন। সত্য হওয়াই সম্ভব, যদিও অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা হওয়াও অসম্ভব নয়।

অপর পক্ষে, যা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তা হলো: হিন্দু ধর্মে তাঁর বিশ্বাস প্রমাণ করার জন্যে সব সময়ে তিনি পৈতা পরিহিত থাকতেন। এমন কি, মারা যাওয়ার সময়েও তাঁর গলায় পৈতা ছিলো। পানাহারে জাত বজায় রাখায় প্রসঙ্গে লিখিত যে-প্রমাণ পাওয়া যায়, তার সবচেয়ে, বলতে গেলে, দৃষ্টিকটূ দৃষ্টান্ত হলো এই যে, কম্পেনির পরিচালকরা যখন তাঁকে একটি বেসরকারী ভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তখনো পরিচালকরা যে-খাদ্য পরিবেশন করেন, তা তিনি খাননি। বরং খেয়েছিলেন নিজের ভৃত্যের রান্না করা ভাত। মজার ব্যাপার হলো: এই ভৃত্য ছিলেন মুসলমান। সুতরাং এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, মুসলমান পাচকের রান্না খেয়ে তাঁর জাত পুরোপুরি রক্ষা

হয়েছিলো কিনা। রামমোহনের এ ধরনের আপাত রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, তিনি প্রচণ্ড পৌত্তলিকতা-বিরোধী এবং অসাধারণ রকমের আধুনিক ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে তিনি কথায়, লেখায় এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে তীব্রভাবে আক্রমণ করতেন সব সময়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি আদৌ আর-পাঁচজন হিন্দুর মতো ছিলেন না। কাজেই, কালাপানি পার হওয়ার ব্যাপারে লোকাচার অমান্য করার মতো সাহস তাঁর পক্ষে থাকাই সম্ভব। অপর দিকে, দ্বারকানাথ রামমোহনের মতো আদৌ ধার্মিক ছিলেন না। সাহেবদের সঙ্গে অখাদ্য খেতে, নিষিদ্ধ পানীয় সেবন করতে অথবা তাঁদের



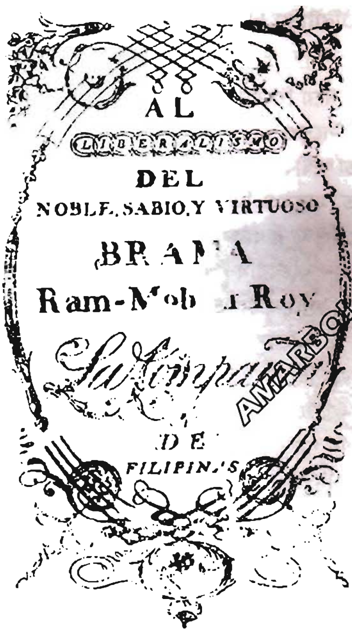
রামমোহন যখন লন্ডনে আসেন, তখনকার চিত্র। ১৮৩০ সালে অঙ্কিত।

সঙ্গে সহবাস করতে তাঁর কোনো সংকোচ ছিলো না। ধারণা করি, মনের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভয়ও ছিলো না।

রামমোহন বিলেতযাত্রা করেন ১৮৩০ সালের ১৫ই নভেম্বর। আপাতদৃষ্টিতে তিনি গিয়েছিলেন দিল্লির মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দৌত্য নিয়ে। ১৮০৫ সালে কম্পেনির সঙ্গে সম্রাটের যে-চুক্তি হয়, সেই চুক্তি অনুযায়ী তিনি ভাতা পাচ্ছিলেন না। রামমোহনের সঙ্গে কথা ছিলো যে, তিনি যদি তদবির করে সেই ভাতা বাড়াতে পারেন, তা হলে সেই ভাতার একটা অংশ নিয়মিতভাবে তিনিই পাবেন। এ থেকে মনে হয় তাঁর বিলেত যাওয়ার খরচের একটা অংশ হয়তো সম্রাটই দিয়ে থাকবেন। অন্তত রামমোহনের 'রাজা' উপাধি দিয়েছিলেন দিল্লির এই নামে-মাত্র সম্রাট। কিন্তু

যে-কাজ নিয়েই যান না কেন, আসলে রামমোহন বিলেত যাওয়ার বাসনা পোষণ করছিলেন অনেক আগে থেকেই। ১৮১৫/১৬ সালে তিনি এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন জন ডিগবিকে লেখা একটি চিঠিতে।

সেকালে প্রবাসে যাওয়াকে কেবল লোকাচার-বিরোধী বলে মনে করা হতো না, একে গণ্য করা হতো চরম দুর্ভাগ্য হিশেবে। ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রেও প্রবাস আর মৃত্যুকে সমান করে দেখা হয়। হয়তো এ জন্যেই ভারতীয়দের মধ্যে কোনো হিউয়েন সাং, ইবনে বতুতা, মার্কো পোলা, কলাম্বাস অথবা ভাস্কো দা গামার জন্ম হয়নি। প্রাচীন কালে যে-কজন বাঙালি তিব্বত অথবা তিব্বত পার হয়ে চীনে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বৌদ্ধ এবং গিয়েছিলেন ধর্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমার ধারণা, বৌদ্ধদের মধ্যে কালাপানি পার হওয়া অথবা দূরদেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার করার একটা রীতি সম্রাট অশোকের সময় থেকেই চালু হয়েছিলো। বৌদ্ধধর্ম সেভাবেই দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। অপর পক্ষে, হিন্দুদের মধ্যে কঠোর বিধান চালু ছিলো নিজের পরিবেশের মধ্যে জন্মমৃত্যুর। তা সত্ত্বেও রামমোহন স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করেন একাধিক বার, তার কারণ তিনি ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ ছিলেন।



স্প্যানিশ সংবিধানের উৎসর্গপত্রে রামমোহনের নাম

বাল্যকাল থেকেই তিনি নিজের গ্রামের গণ্ডী ছেড়ে লেখাপড়া শিখতে পাটনায় গিয়েছিলেন। দৌত্য করতেও গেছেন ভুটান, এমন কি, সম্ভবত তিব্বতে। তিনিই প্রথম বাঙালি, যিনি কূপমণ্ডূক ছিলেন না। বড়ো হওয়ার পর বিরাট বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ করার এবং অন্য দেশের সমাজ ও সভ্যতাকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম

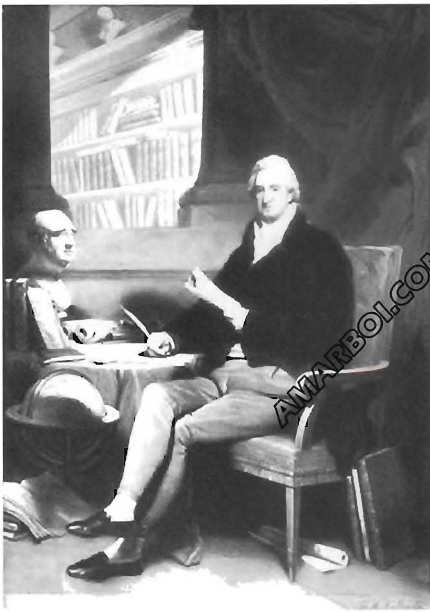
নেয় তাঁর হৃদয়ে। যে-কালে ডাক যোগাযোগ ছিলো এখনকার তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল এবং দারুণ মন্থর, সেই যুগে তিনি ইউরোপ এবং অ্যামেরিকার মনীষীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই ১৮১২ সালে স্পেইনের একটি খসড়া সংবিধান তাঁর নামে উৎসর্গ করেছিলেন সে দেশের উদারপন্থীরা। কেবল স্পেইন নয়, ইউরোপের নানা দেশের উদারপন্থী রাজনীতিতে তাঁর ছিলো আন্তরিক আগ্রহ। ইটালির রাজনীতিতে কী ঘটছে, তা নিয়ে তিনি কলকাতায় ভোজ দিয়েছেন বন্ধুদের। অ্যামেরিকার ইউনিটারিয়ান খৃষ্টান নেতাদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন।

বিলেত যাওয়ার সময়ে রামমোহন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মুসলমান বাবুর্চি-সহ আরও তিন জনকে। ধর্মে অনড় আস্থা সত্ত্বেও রান্নায় মুসলমান বাবুর্চিদের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি অস্বীকার করতে পারেননি অথবা তা অস্বীকার করে রসনার তৃপ্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার মতো বাস্তবতা-বর্জিত মানুষও তিনি ছিলেন না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, যবনীগমন সম্পর্কেও তাঁর ধারণা নাকি উদার ছিলো। সে যাই হোক, তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজারাম। এঁকে নিজের-সন্তান হিশেবে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগ পণ্ডিতই মনে করেন যে, রাজারাম তাঁর নিজের সন্তান ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর পালিত পুত্র। অপর পক্ষে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রাজারাম ছিলেন রামমোহনের মুসলমান 'স্ত্রী' অর্থাৎ রক্ষিতার গর্ভজাত সন্তান। তাঁর আর-একজন সঙ্গী ছিলেন রামরতন মুখার্জি। ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ইনি কোন ভরসায় কালাপানি পাড়ি দেবার দুঃসাহস করেছিলেন, আমার জানা নেই। তবে রামমোহনের ওপর নিশ্চয় তাঁর অগাধ আস্থা ছিলো। হয়তো ভেবেছিলেন যে, দেশে ফিরে একঘরে হলেও রামমোহনই তাঁকে আশ্রয় এবং সাহায্য দেবেন।

সঙ্গীদের নিয়ে রামমোহন যাত্রা করেন অ্যালবিয়ন জাহাজে করে। তারপর কেইপ হয়ে তিনি লিভারপুলে গিয়ে পৌঁছেন ৩১ সালের ৮ই এপ্রিল। তিনি সেখানে পৌঁছানোর পরেই বহু গণ্যমান্য লোক তাঁর সঙ্গে একের পর এক দেখা করতে আসেন। আর তিনি নিজে দেখা করতে যান সেকালের একজন বিখ্যাত মনীষী — উইলিয়াম রস্কোর সঙ্গে। রস্কো ছিলেন নামকরা ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি ও রাজনীতিক। তখন তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। এর মাত্র সাত সপ্তাহ পরে — ৩০শে জুন — তিনি মারা যান।

প্রথম সুপরিচিত বাংলাভাষী এবং মনীষী হিশেবে রামমোহন ইংল্যান্ডে গিয়ে সাধারণভাবে ভারতীয় এবং বিশেষভাবে বাঙালিদের সম্পর্কে সে দেশের লোকেদের কাছে একটা খুব উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁর যাবার আগে যাঁরা ভারত থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ ইংরেজি জানতেন না; অথবা সামান্যই জানতেন। তা

ছাড়া, তাঁরা গিয়েছিলেন মামলা-মকদ্দমা নিয়ে অথবা ভাষা শেখানোর কাজে। কম্পেনির পরিচালকদের কাছে ধর্না দিয়ে প্রায়ই তাঁরা টাকাপয়সা সাহায্য নিতেন অথবা ধার করতেন। অনেকে দেউলেও হয়েছিলেন। সামাজিক কেলেঙ্কারীও হয়েছিলো অনেকের। অপর পক্ষে, রামমোহন ছিলেন একেবারে ভিন্ন জগতের মানুষ। বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং দার্শনিক হিশেবে তিনি যেমন অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর ইংরেজি ভাষার জ্ঞানও সাধারণ মানুষের মনে অনুকূল মনোভাব তৈরি করতে সাহায্য করেছিলো। দিল্লির সম্রাটের ভাতা বৃদ্ধির জন্যে তিনি যেভাবে তদবির করেন, তাও তাঁর বিচক্ষণতা প্রমাণ করে। সম্রাটের সঙ্গে কম্পেনির যে-চুক্তি হয়েছিলো, সে সম্পর্কে তিনি আগে একটি বই ছেপে, বলতে গেলে, সেই বইয়ের নামে কম্পেনিকে ব্ল্যাকমেইল করে বাদশার ভাতা খানিকটা বাড়িয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে আরও গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজ বন্ধুরা ছিলেন সবাই সুপরিচিত ব্যক্তি।

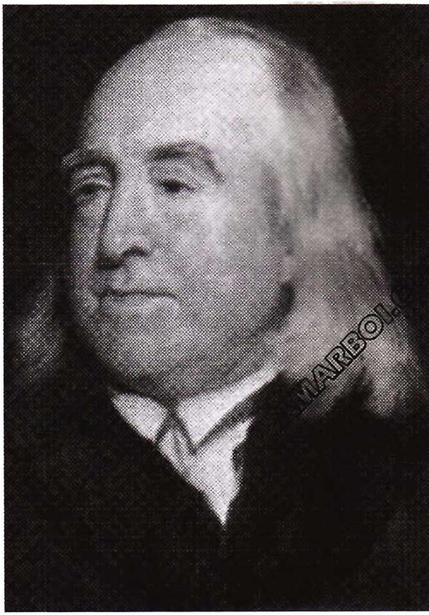


উইলিয়ম রস্কো

দিন দশেক বিশেষ ব্যস্ততার মধ্যে কাটানোর পরে লিভারপুল থেকে ম্যানচেস্টার হয়ে রামমোহন যান লন্ডনে। ম্যানচেস্টারে তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছিলেন শত শত লোক। সাধারণ মানুষের এমন ভিড় হয়েছিলো যে, সেই ভিড় ঠেলে তাঁকে বের করে আনার জন্যে পুলিশ ডাকতে হয়েছিলো। অনেকে মনে করেছিলেন যে, তিনি ভারতের রাজা। বহু আগে নিহত হলেও, কেউ কেউ ভেবেছিলেন যে, তিনি টিপু সুলতান। বহু লোক তাঁকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চান। অনেকে আবার তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন।

লন্ডনে পৌঁছানোর অল্প পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন সেকালের বিখ্যাত

নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম। কলকাতা থেকেই তিনি তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। বেন্থাম ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রথম সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয় — লন্ডন ইউনিভার্সিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রামমোহন বিলেতে থাকার সময়েই — ১৮৩২ সালে — বেন্থাম মারা যান। পরে আরও একজন নিরীশ্বর সাম্যবাদীর সঙ্গে পরে রামমোহনের যোগাযোগ হয়। তিনি রবার্ট ওয়েন। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জেমস মিল এবং উইলিয়াম গডউইনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়েছিলো।



জেরেমি বেন্থাম

এ ছাড়া, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় সেকালের ইংল্যান্ডের ইউনিটারিয়ান খৃষ্টানদের সঙ্গে। ইউনিটারিয়ান খৃষ্টানরা ট্রিনিটারিয়ানদের মতো ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা একেশ্বরবাদী। রামমোহনও বিশ্বাস করতেন একেশ্বরে। এই কারণে তিনি তাঁদের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতেন। আগেই বলেছি, অ্যামেরিকার ইউনিটারিয়ান খৃষ্টানদের সঙ্গেও তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। অ্যাংলিকান চার্চ এবং ব্যাপটিস্টদের সঙ্গে তিনি তর্কযুদ্ধ চালালেও, ইউনিটারিয়ানদের একেশ্বরবাদিতার বৈশিষ্ট্য তাঁকে খুব আকৃষ্ট করেছিলো। একেশ্বরবাদিতা ছাড়াও তিনি এঁদের সঙ্গে নিজের ভাবনা এবং আদর্শের মিল দেখতে পেয়েছিলেন। ইউনিটারিয়ান বন্ধু-মহলের বাইরে তাঁর অন্য যেসব ইংরেজ বন্ধু ছিলেন, তাঁরাও ছিলেন গোঁড়ামি-বর্জিত। ইংরেজি ভাষা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সমাজ-সংস্কার প্রয়াস এবং বাগ্মিতার জন্যে তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছেও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তিনি রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের অভিষেকে উপস্থিত ছিলেন এবং রাজার সঙ্গে তাঁকে

পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির পরিচালকরা তাঁকে দূত হিশেবে স্বীকৃতি না-দিলেও রাজার অভিষেকে তাঁকে বসানো হয়েছিলো অন্য দেশের দূতদের সঙ্গে। দিল্লির বাদশার ভাতা বৃদ্ধির তদবির ছাড়া, তিনি যেসব কাজ হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা ছিলো সতীদাহ আইনের বিরোধিতা করে রক্ষণশীলরা যে-দরখাস্ত করেছিলেন, সেই দরখাস্ত যাতে পার্লামেন্টে গৃহীত না-হয়, তার জন্যে তদবির করা। তা ছাড়া, কম্পেনির ভারত-শাসনের সনদপত্রও এ সময়ে নবায়ন করার কথা ছিলো। তিনি সে সম্পর্কে নিজের বক্তব্য পেশ করতে চেয়েছিলেন। এ নিয়ে পার্লামেন্টের একটি সিলেক্ট কমিটির সামনে তিনটি নিবন্ধ পেশ করেন তিনি। লন্ডনে পৌঁছানোর পর বছর খানেকের বেশি তিনি সেখানেই ছিলেন। প্রথমে বাস করতেন ১২৫ নম্বর রীজেন্ট স্ট্রীটে, তারপর ৪৯ নম্বর বেডফোর্ড স্কোয়ারে।



বেডফোর্ড স্কোয়ারের যে-বাড়িতে রামমোহন থাকতেন।

ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে প্রগতিশীলতার জন্যে ফ্রান্স বিশেষ পরিচিত ছিলো। ইংল্যান্ডের প্রগতিবাদীরা নতুন ধ্যান-ধারণার জন্যে ফ্রান্সের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। রামমোহনও ফ্রান্সের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। ১৮৩২ সালের শেষ দিকে তিনি ফ্রান্সে যান এবং সেখানে মাস তিনেক বাস করেন। প্যারিসে যাবার পর ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ তাঁকে বিশেষ সমাদর করেন। একাধিকবার তাঁকে ভোজেও নিমন্ত্রণ করেন।

১৮৩৩ সালের প্রথম দিকে ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে রামমোহন তাঁর দলবল নিয়ে টাকাপয়সার টানাটানিতে পড়েন। কারণ দেশ থেকে টাকাপয়সা পাঠানোর জন্যে তিনি যে-হাউস অর্থাৎ ব্যাংককে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ব্যাংক প্রভূত লোকসান দিয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছিলো। এর ফলে তিনি এতোটাই সমস্যার মুখোমুখি

হয়েছিলেন যে, এ সময়ে ইংল্যান্ডে তাঁর থাকার জন্যে তাঁকে অংশত তাঁর বন্ধুদের ওপর নির্ভর করতে হয়। এমন কি, তিনি কম্পেনির কাছ থেকে এ সময়ে দু হাজার পাউন্ড ধার করতে চেষ্টা করেছিলেন। এ রকম একটা সংকটের সময়ে তিনি ব্রিস্টলে যান তাঁর ইউনিটারিয়ান বন্ধু ল্যান্ট কার্পেন্টারের আমন্ত্রণে। সেখানে তিনি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ল্যান্ট কার্পেন্টারের কন্যা মেরীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে শহরতলী স্টেপলটনের বীচ হাউসে ম্যানেনজাইটিস রোগে তিনি মারা যান ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর।

সুযোগ পেয়ে রামমোহন বিলেত এবং ফ্রান্স পর্যন্ত গিয়েছিলেন। আমার ধারণা, আকস্মিকভাবে মারা না-গেলে এবং সুযোগ হলে তিনি স্পেইনে যেতেন। ইটালিতেও। এমন কি, হয়তো অ্যাটল্যান্টিকও পাড়ি দিতেন। কিন্তু বেশি দেশ ভ্রমণ না-করলেও, সেই সময়ে দেশভ্রমণের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তিনি যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিতে হয়। এভাবে সমুদ্রযাত্রার সাহসী নজির তৈরি করে তিনি অন্যদের বিলেত যাত্রার পথ সুগম করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর অব্যবহিত পরে একজন বাঙালি খৃস্টান ছাড়া অন্য কেউ বিলেত গমন করেননি। করার মতো সামর্থ্য যেমন খুব সামান্য লোকেরই ছিলো, তেমনি তাঁর মতো দুঃসাহসও ছিলো খুব কম লোকের। রামমোহন যে প্রবাসেই মারা যান, তাও নিশ্চয় অনেকের মনে এই অন্ধবিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলো যে, লোকাচার অমান্য করে বিলেত যাওয়ায় তিনি সেখানে প্রাণ হারান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, রামমোহন জাহাজে যাওয়ার যাত্রা করেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভবন থেকে। তখন দেশের লোকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিনি আর ফিরতে পারবেন না। তাই বহু লোক সেখানে সমবেত হয়েছিলেন তাঁকে শেষবারের মতো একবার দেখে নিতে।



৪৯ নম্বর বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাড়ির ওপর স্মৃতিফলক

যে-বাঙালি খৃস্টানের কথা উল্লেখ করলাম, তাঁর নাম ছিলো আনন্দচন্দ্র মজুমদার। তিনি

অ্যালেক্সান্ডার ডাফের দীক্ষা দেওয়া তৃতীয় ব্যক্তি। অনুমান করি, তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন ১৮৩৩ সালে। তারপর কয়েক বছরের মধ্যে তিনি বিলেতে যান। কেন যান, যাওয়ার সম্বল কোথায় পান — তার বিস্তারিত খবর জানা যায় না। তবে তিনি আর্থিক সহায়তা চেয়ে ১৮৪৭ সালের ১৬ই অগস্ট কম্পেনির পরিচালকদের কাছে ব্রিস্টল থেকে যে-পত্র লিখেছিলেন, তাতে জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে তাঁর পিতা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত এবং গৃহচ্যুত করেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁর বন্ধুরাও তাঁকে পুরোপুরি ত্যাগ করেছিলেন। এ অবস্থায় তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে বিলেতে আসেন। লালবিহারী দে লিখেছেন যে, আনন্দচন্দ্র বিলেত থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন লন্ডন মিশনারি সোসাইটির তরফ থেকে, অর্থাৎ ডাফের স্কটিশ চার্চের সঙ্গে ততোদিনে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিলো। কিন্তু দেশে এসে তিনি কী করেন, কোথায় যান, লালবিহারী দে তার কোনো তথ্য দিতে পারেননি। তিনি লিখেছেন যে, আনন্দচন্দ্র ১৮৪১ সালে মারা যান। দেশে ফিরে যাওয়ার কথা আনন্দচন্দ্র তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেননি। হতে পারে যে, তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলেন এবং ১৮৪১ সালে আবার বিলেতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু তিনি যে মারা যাননি, বরং দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁর পরিবার নিয়ে ব্রিস্টলে বসবাস করছিলেন, তা তাঁর পত্র থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তিনি কম্পেনির পরিচালকদের কাছে এই পত্রটি লেখেন ব্রিস্টলের লিটল প্যারাডাইস থেকে। কিন্তু নামে লিটল প্যারাডাইস হলেও, তাঁর চিঠি পড়লে বোঝা যায়, আসলে সপরিবারে তিনি বাস করছিলেন বড়ো একটি "হেলে"।



উনিশ শতকের ব্রিস্টল

তিনি অত্যন্ত করুণ মিনতি জানিয়ে লেখেন যে, বিলেতে এসে তিনি স্ত্রীর সূত্রে যে-সামান্য অর্থ পেয়েছিলেন, তা দিয়ে ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়েছেন। পত্রপত্রিকায় যেসব চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, তার উত্তরেও

তিনি অসংখ্য বার দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু অপরিচিত এবং ভিনদেশী হিশেবে কেউ তাঁকে চাকরি দেননি। তাঁদের যে-কয়েকটি জিনিশপত্র ছিলো, তা বিক্রি করে তাঁরা রুটি কিনেছেন। তিনি চরম অভাবে বাস করছেন। তিনি নিজের থেকেও বেশি কষ্ট



ব্রিস্টল নগরীতে রামমোহন রায়ের মূর্তি

পাচ্ছেন তাঁর স্ত্রীর জন্যে। তিনি কম্পেনির পরিচালকদের মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্যে লেখেন যে, তিনি হিন্দু হলেও স্ত্রীর জন্যে তাঁর যে-ভালোবাসা তার সঙ্গে যে-কোনো দেশের মানুষের ভালোবাসার কোনো পার্থক্য নেই। পরিশেষে তিনি লেখেন যে, পরিচালকরা তাঁকে আর্থিক সহায়তা দিলে অথবা তাঁকে যতো ছোটো হোক, একটি চাকরি দিলে তিনি অনন্ত কাল পর্যন্ত তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। তাঁর এই আবেদনপত্র পরিচালকরা বিবেচনা করেন দুদিন পরে — ১৮ই অগস্ট যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে।

ওদিকে, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গী এবং ভৃত্যরা দেশে ফিরে আসেন। রামরতন মুখার্জিকে একঘরে করার চেষ্টা হয়তো হয়েছিলো, কিন্তু কম্পেনির আনুকূল্যে তিনি সেসব অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। তিনি কম্পেনির কাছ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেয়েছিলেন। রামমোহনের ভৃত্য রামহরি দাস কাজ পেয়েছিলেন বর্ধমান-রাজের কাছে। আর, তাঁর পুত্র অথবা পালক পুত্র রাজারাম তখনকার মতো লন্ডনেই থেকে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির পরিচালকদের অফিসে বছর তিনেক কেরানির কাজ করেন বাৎসরিক এক শো পাউন্ড বেতনে। তাঁর মুনিব হবহাউস তাঁকে বঙ্গদেশে একটি ভালো চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। কারণ, বঙ্গদেশ সরকার কম্পেনির পরিচালকদের জানায় যে, রাজারামকে উচ্চপদে বসালে হেইলিবেরি কলেজ থেকে পাশ-করা কর্মকর্তারা অসন্তুষ্ট হবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, শেষ পর্যন্ত ১৮৩৮ সালে রাজারাম তাঁর ইংরেজি জ্ঞান এবং বিলেতি জীবনযাত্রা নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তবে দেশে ফিরে তিনি চৌকো গর্তে গোল খাম্বার মতো বেকায়দায় পড়েন। তাঁর পরিবার এবং বাঙালি সমাজ – কেউই তাঁকে গ্রহণ করেনি। আবার ইংরেজ সমাজের কাছেও তিনি থাকলেন অচ্ছুৎ।

চমৎকার ইংরেজি শিখেছিলেন তিনি। তা ছাড়া, হবহাউস সুপারিশ করেছিলেন যে, তিনি সরকারী কাজকর্মও করতেন দক্ষতার সঙ্গে। এই জন্যে, কম্পেনি তাঁকে কোনো বড়ো পদে বসাতে রাজি না-হলেও, শেষ পর্যন্ত গভর্নর জেনরেল তাঁকে দু শো টাকা বেতনের একটি চাকরি দিয়েছিলেন। এ বেতন ছিলো তিনি বিলেতে যে বেতন পেতেন, তার দ্বিগুণেরও বেশি। এই আয় সত্ত্বেও তিনি কলকাতায় বাস করতে গিয়ে দারুণ অসুখী হন এবং বিলেতে ফিরে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। অবশ্য কম্পেনি তাঁকে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ দেয়নি। এমন কি, দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার সময়ে তিনি তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁর ব্যর্থ হয়।

বন্ধুর পুত্রকে বিলেত নিয়ে না-গেলেও সামাজিক এবং মানসিক বাধা অগ্রাহ্য করে দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজে বিলেত গিয়েছিলেন – একবার নয়, দুবার। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন যে, তাঁর আত্মীয় এবং বন্ধুরা অনেকেই সমাজচ্যুতির ভয় দেখিয়ে তাঁকে বিলেত গমন থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রামমোহনের মতো তিনিও বহু বছর ধরে বিলেত যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। লন্ডনে পৌঁছে তিনি লিখেছিলেন যে, বিশ বছর ধরে তিনি যে-ধ্যান করে এসেছিলেন, তা এতোদিনে সফল হলো। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর একটা পার্থক্য ছিলো এই যে, ব্যবসায়ী বলে তাঁকে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে হতো। সে জন্যে তাঁর পক্ষে সমাজকে অগ্রাহ্য করা রামমোহনের তুলনায় কঠিন ছিলো। অন্যদিকে, রামমোহনের চেয়ে তাঁর আবার

অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিলো ঢের বেশি। তিনি ছিলেন কলকাতার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকেদের মধ্যে একজন। তাই তাঁর পক্ষে বিলেত যাওয়া সম্ভব হয়েছিলো। তা ছাড়া, ধর্মেও তাঁর কোনো আস্থা ছিলো না। তাঁর লোকাচার-বিরোধী চলাফেরা এবং মেম সাহেবদের সঙ্গে মাখামাখির জন্যে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো।

তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন ১৮৪২ সালের ৯ই জানুয়ারি তাঁর নিজের জাহাজ ইন্ডিয়াতে করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, রামমোহন এবং দ্বারকানাথের



১৮৪২ সালে লন্ডনে গিয়ে যে-টাওয়ার ব্রিজ দেখেছিলেন দ্বারকানাথ

বিলেতগমন অন্য কারো কারো মনেও বিলেতে যাওয়ার স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলো। যেমন, মধুসূদন দত্ত — তখনো মাইকেল হননি। কিন্তু সেই সময়েই — ১৮৪১/৪২ সালে — বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন যে, তিনি বিলেত যাবেনই, তাতে পরিবার এবং সমাজের কাছ থেকে বাধা যা-ই আসুক না কেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো যে, একবার বিলেত যেতে পারলে বড়ো কবি হওয়ার পথে তাঁর আর কোনো বাধা থাকবে না। মোট কথা, স্বদেশের বাইরে গিয়ে বহির্বিশ্বকে দেখার একটা আকাঙ্ক্ষা গৌরদাস বসাকের মতো অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা না-দিলেও, কারো কারো মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছিলো।

দ্বারকানাথ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন নিজের সাহেব ডাক্তার, সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্র, এক ভাগ্নে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তিনজন হিন্দু ভৃত্য এবং একজন মুসলমান বাবুর্চিকে। তখনো সুয়েজ খাল হতে সাতাশ বছর বাকি ছিলো। তাই নিজের জাহাজে করে তিনি



দ্বারকানাথ ঠাকুর

গিয়েছিলেন সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে কায়রো হয়ে আলেকজান্দ্রিয়া যান। তারপর অন্য জাহাজে করে মল্টা হয়ে যান ইটালিতে। পথে তিনি তখনকার ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধজাহাজ পরিদর্শন করেন। মল্টা এবং জাহাজের কর্মকর্তারা তাঁকে খুবই খাতির করেন। রোম, ভেনিস, নেপলস-সহ ইটালির

অনেকগুলো শহর দেখেন তিনি। সর্বত্রই তিনি পেয়েছিলেন যথেষ্ট সম্মান। নাম-করা স্থাপত্য এবং বিখ্যাত শিল্পীদের ভাস্কর্য ও চিত্র দেখে তিনি খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। রোমে তিনি পোপের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং সমাদৃত হয়েছিলেন, যদিও



যুবতী রানী ভিক্টোরিয়া

তিনি পোপের সম্মানে নিজের পাগড়ি খোলেননি। পোপকে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর নিজের দেশে পাগড়ি না-খোলাই সম্মান জানানোর চিহ্ন। এর আগে পোপ কখনো কোনো ভারতীয় দেখেননি। ইটালির পর জার্মেনির বিভিন্ন শহর হয়ে দ্বারকানাথ যান

ব্রাসেলসে। সেখান থেকে ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে। অতঃপর জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ডোভার বন্দরে পৌঁছেন। ডোভার থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে লন্ডনে পৌঁছেন ১০ই জুন — কলকাতা থেকে যাত্রা করার পাঁচ মাস দু দিন পরে।

তিনি যেমন লন্ডন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তেমনি সেখানে তিনি আন্তরিক সমাদর এবং সম্মান লাভ করেছিলেন, বিশেষ করে সমাজের ওপরতলার লোকেদের কাছ থেকে। রামমোহনকে বিশেষ করে খাতির করেছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তিরা। অপর পক্ষে, দ্বারকানাথকে সমাদর জানান অভিজাত এবং মননশীল উভয় শ্রেণীর লোকেরা। অবশ্য আগে থেকেই ইংল্যান্ডে অনেকে তাঁর সুনাম শুনেছিলেন। সকাল থেকে রাত অবধি তাঁর কাছে আসতেন অতিথিরা। তিনি নিজেও নিমন্ত্রিত হতেন বহু জায়গা থেকে। লন্ডনে যাওয়ার পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন রবার্ট পীল। তারপর রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে আপ্যায়ন করেন। কেবল রাজ-পরিবারের সদস্যরা নন, অন্য অভিজাতরা এবং তখনকার ও সাবেক মন্ত্রীরাও সেই সভায় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। ব্লেয়ার ক্লিং দ্বারকানাথের ডাইরি থেকে যে-উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় যে, রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে দেখে বেশ মুগ্ধ হয়েছিলেন। রানী তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন যে, 'ব্রাহ্মণ লক্ষ্য করার মতো সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলেন, আর তিনি ভারি বুদ্ধিমান এবং আগ্রহব্যঞ্জক লোক'। রানীর সঙ্গে এর পরও তাঁর অন্তত তিনবার দেখা হয় এবং রানী তাঁকে দুবার ভোজে নিমন্ত্রণ করেন।



চার্লস ডিকেন্স। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩০ বছর

কেবল রানী অথবা রাজকীয় পরিবারের লোকেদের কাছ থেকেই দ্বারকানাথ অভ্যর্থনা লাভ করেননি, লন্ডনের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয় এবং কারো কারো সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন চার্লস ডিকেন্স আর থ্যাকারে। তাঁর পরিচিত কবি-সাহিত্যিকরা তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান, আচার-ব্যবহার, স্পষ্টভাষণ এবং রসিকতার প্রশংসা করেন। প্রায়ই তিনি সঙ্গীত-নাটক উপভোগ করতেন। নাচের আসরে যেতেন। তাঁর স্পষ্টভাষণ অবশ্য

তাঁর ক্ষতিও করেছিলো। তিনি একটি সরকারী ভোজসভায় এ রকম মন্তব্য করেছিলেন যে, ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির শাসন স্থাপিত হওয়ায় দেশ অনেক লাভবান হয়েছে, তবে কম্পেনি রাজ্যজয়ের জন্যেই নিজের শাসন প্রবর্তন করেছে – ভারতবর্ষকে উদ্ধার করার জন্যে নয়। তাঁর এই সমালোচনা অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। তিনি যে রানীর কাছ থেকে নাইটহুড পাননি, কেউ কেউ বলেছেন যে, তার প্রধান কারণই এই সমালোচনা।

সমাজের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ছাড়া, অনেক মেমসাহেবের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। বিশেষ করে একজনের সঙ্গে জাহাজ ভাড়া করে তিনি টেমস নদীতে বিহার করেছেন। তাঁর সঙ্গে একযোগে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করে টেমসেই ভোজ দিয়েছেন। এই মহিলার নাম ক্যারলাইন নর্টন। ইনি ছিলেন একজন সাধারণ কবি, কিন্তু অসাধারণ সুন্দরী। আগেই বলেছি ইংল্যান্ডে ইংরেজ রমণীদের দেখে দ্বারকানাথ বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কলকাতার একটি পত্রিকায় তাঁর যে-চিঠি প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, তরুণ বয়সে ফারসি আখ্যানকাব্যে তিনি যে-পরীদের গল্প পড়েছিলেন, তাদেরই যেন তিনি লন্ডন গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর সঙ্গে বিলেত যাওয়ার জন্যে রাজারাম যখন চেষ্টা করছিলেন, সেই সময়ে মেম সাহেবদের সঙ্গে তিনি কলকাতাতে কিভাবে ছলে-বলে-কৌশলে মেলামেশা করতেন, তা জানিয়ে তাঁর নিন্দা করে রাজারাম এক ইংরেজ ভদ্রলোককে চিঠি লিখেছিলেন। রাজারাম উল্লেখ করেন যে, সে সময়ে দ্বারকানাথ মিসেস লীচ এবং তাঁর ষোড়শী কন্যা – উভয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক করতে তৎপর ছিলেন।


রাজা লুই ফিলিপ। রামমোহন এবং দ্বারকানাথ উভয়কেই যিনি আন্তরিক সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, লন্ডন এবং তার আশেপাশের উল্লেখযোগ্য জায়গা এবং

কলকারখানাগুলো দেখার পর দ্বারকানাথ যাত্রা করেন উত্তরে। তিনি এডিনবরা এবং গ্লাসগো-সহ স্কটল্যান্ডের অনেক জায়গাই ঘুরে দেখেছিলেন। ৩১শে জুলাই তাঁকে এডিনবরা নগরীর পক্ষ থেকে দ্য ফ্রীডম অব দ্য সিটি অব এডিনবরা উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। লন্ডনে ফিরে ১৫ই অক্টোবর তিনি রওয়ানা হন প্যারিসের উদ্দেশে।

প্যারিসের সৌন্দর্য দেখে তিনি চমৎকৃত হয়েছিলেন। সেখানে ফ্রান্সের রাজা তাঁকে আপ্যায়ন করেন এবং প্রাসাদের কক্ষগুলো ঘুরিয়ে দেখান। তা ছাড়া, পরিবারের সদস্য এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। এ যাত্রায় তিনি প্যারিসে বেশি দিন ছিলেন না। ১৫ই নভেম্বর প্যারিস থেকে দেশের উদ্দেশে যাত্রা



প্যারিস, ১৮৩০

করেন। তারপর ২২শে নভেম্বর অ্যাটালান্টা জাহাজে করে সুয়েজ বন্দর ত্যাগ করে বোম্বাই এসে পৌঁছান ১৩ই ডিসেম্বর। সেখান থেকে মাদ্রাস হয়ে ডিসেম্বরের শেষে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। জাহাজে এক মেম সাহেবের সঙ্গে তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো — সে কথা সেই মেমসাহেব নিজেই লিখেছিলেন।

দ্বারকানাথ তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন সেকালের প্রগতিশীল এবং বাগ্মী রাজনীতিক জর্জ টমসনকে — যিনি তাঁর মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দ্য ফ্রীডম অব দ্য সিটি অব এডিনবরা উপাধি পেয়েছিলেন। টমসন এসেছিলেন খানিকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে, খানিকটা কাজের খোঁজে। তিনি টাকার বিনিময়ে দেশীয় রাজা এবং সুলতানদের হয়ে

লন্ডনে কম্পেনির সঙ্গে লড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি অনেকের হয়েই এ কাজ করেছিলেন।

অতো প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও কালাপানি পার হয়ে এসেছেন বলে দ্বারকানাথকে একঘরে করার কথা উঠেছিলো — এমন কি, বর্ধিত ঠাকুর পরিবারের ভেতরেও। কিন্তু তিনি এটা গ্রাহ্য করেননি। উল্টো, তাঁর নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রমাণ করার জন্যেই ৩১শে জানুয়ারি (১৮৪৩) তাঁর বাগানবাড়িতে তিনি দারুণ আড়ম্বরপূর্ণ একটি নৈশভোজ এবং নাচের আসরের আয়োজন করেন। আগে গভর্নর জেনরেল তাঁর নিমন্ত্রণে এলেও এই বিশেষ পার্টিতে তিনি আসতে পারেননি। কিন্তু বাদ-বাকি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা-সহ কলকাতার গণ্যমান্য বিস্তর লোক হাজির হয়েছিলেন। *বেঙ্গল হরকরা* পত্রিকায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছিলো যে, কলকাতায় এ রকমের জাঁকজমকপূর্ণ নৈশ ভোজ এবং নাচের আসর এর আগে কখনো হয়নি।



রামমোহন রায়ের সমাধি

ইউরোপ দ্বারকানাথের এতো ভালো লেগেছিলো যে, ফ্রান্সের রাজা তাঁকে আবার প্যারিসে আসার নিমন্ত্রণ করলে তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন যে, ১৮৪৩ সালের শীতের সময় তিনি সেখানে যাবেন। কিন্তু প্রধানত স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি তখন ইউরোপে যেতে পারেননি। তা ছাড়া, তিনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন বিলেত থেকে ফেরার পর। তাঁর ব্যাংকের ব্যবসা, খনির কাজ — সব কিছুতেই সংকট দেখা দিয়েছিলো। এদিকে, তাঁর স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছিলো না। তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে, ইউরোপের আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন তিনি। তাই কোনো মতে ব্যবসার কাজ চুকিয়ে দিয়ে তিনি ইউরোপের উদ্দেশে দ্বিতীয় বার জাহাজে ভাসেন ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু তিনি নিজে কোনো মতে ভেসে থাকলেও তাঁর ব্যবসা ডুবতে থাকে। তদুপরি, তাঁর খরচ হিশেবে

এ সময়ে নিয়মিতভাবে এতো টাকা পাঠাতে হয় যে, বলা যেতে পারে এ দিয়ে তিনি নিজেই ডুবন্ত তরীকে একেবারে মাঝ সাগরে ডুবিয়ে দিতে সাহায্য করেন।

এবারে সঙ্গী হিশেবে তিনি নিয়েছিলেন তাঁর নিজের সাহেব ডাক্তার, সাহেব সেক্রেটারি আর তিনজন ভৃত্যকে। তা ছাড়া, একঘরে করার মতো ক্ষমতা সমাজের একটুও নেই যেন এটা প্রমাণ করার জন্যেই সঙ্গে নেন কনিষ্ঠ সন্তান নগেন্দ্রনাথ এবং ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে নেওয়ার সত্যিকার কারণ ছিলো দুটো



Beneath this stone rest the remains of Raja Rammohun Roy Bahadoor, A conscientious and steadfast believer of in the unity of the godhead, he consecrated his life with entire devotion to the worship of the divine spirit alone, To great natural talents, he united thorough mastery of many languages and early distinguished himself as one of the greatest scholars of his day. His unwearied labour to promote the social, moral and physical condition of the people of India, his earnest endeavours to suppress idolatry, and the rite of suttee and his constant zealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man live in the grateful remembrance of his countrymen. This tablet records the sorrow and pride with which his memory is cherished by his descendants. He was born at Radhanarar in Bengal in 1774 and died at Bristol 27th September 1833

রামমোহন রায়ের সমাধিলিপি। দ্বারকানাথ এটি স্থাপন করেন ১৮৪৬ সালে।

— এক. দুজন আপনজন নিজের সঙ্গে রাখা। আর দুই. দুজনকে বিলেতে রেখে তাঁদের উন্নত শিক্ষা দেওয়া। তখন নগেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ষোলো/সতেরো বছর। দ্বারকানাথ ভেবেছিলেন যে, তিনি এই পুত্রকে ভালো করে ইংরেজি এবং ল্যাটিন-সহ সাহিত্য পাঠে উৎসাহ দেবেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করে তিনি যদি এই উদ্যোগ নিয়ে থাকেন, তা হলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। দেবেন্দ্রনাথকে তিনি সম্ভবত ভরসা করতে পারতেন না। আর পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করলেও তাঁর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার অভাব আগাগোড়াই কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। পিতার সুবাদে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দ্বারকানাথের প্রতি শ্রদ্ধার খানিকটা ঘাটতি সারা জীবনই বজায় ছিলো। এ ছাড়া, নগেন্দ্রনাথ ছাড়া নবীনচন্দ্রকে দ্বারকানাথ নিয়েছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ ভালো করে শিখিয়ে আনতে। বৈষয়িক ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের ঔদাসীন্য তিনি পছন্দ করতে পারেননি।

বিলেত গিয়েই নবীনচন্দ্রকে তিনি এক কম্পেনির সঙ্গে কাজ করার জন্যে লাগিয়ে দেন — যাতে তিনি সেখানে কম্পেনি পরিচালনা এবং ব্যবসায়িক কাজে ভালো করে তালিম নিতে পারেন। এ ছাড়া, বিজ্ঞানে নবীনচন্দ্রের আগ্রহ ছিলো। তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউটে বিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনতেন এবং তার নোট নিতেন বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথের শিক্ষারও ব্যবস্থা করেন দ্বারকানাথ। তিনি আশা করেছিলেন যে, লেখাপড়া করা ছাড়াও পুত্র ইউরোপের আচার-ব্যবহারও ভালো করে শিখে আসবেন। আগের যাত্রায় তিনি যে-ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তিনি সামাজিকভাবে মেলামেশায় খুব চালু হলেও, লেখাপড়া তেমন শিখতে পারেননি। দ্বারকানাথ মারা যাবার পর শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে নগেন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্র — দুজনই দেশে ফিরে আসেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের দয়ার ওপর নির্ভরশীল হন।

নিজের পুত্র এবং ভাগ্নে সঙ্গে নেওয়ার থেকেও যা গুরুত্বপূর্ণ, তা হলোঃ দ্বারকানাথ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন চারজন বাঙালি ছাত্রকে, চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে। এর কয়েক বছর আগে বোম্বাইয়ের একটি পারসি পরিবারের একাধিক সন্তান বিলেতে গিয়েছিলেন জাহাজ তৈরির কৌশল শিখতে। নয়তো বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র এবং এই চারজনই সবার আগে বিলেত গিয়েছিলেন শিক্ষাগ্রহণের জন্যে। চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে যে-চারজন যান, তাঁদের মধ্যে দু জনের খরচ দ্বারকানাথ নিজে বহন করেন। এঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করবো পরে।

এবারেও দ্বারকানাথ ইউরোপ হয়ে — ইটালি, অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স হয়ে — লন্ডনে যান। প্যারিসে ছিলেন প্রায় দু সপ্তাহ। লন্ডনে পৌঁছান জুন মাসের ১৮ তারিখে। সেখানে এবারেও রানী ভিক্টোরিয়া-সহ অভিজাতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তা ছাড়া, যোগাযোগ হয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে। তিনি নিজে অত্যন্ত পরিশীলিত রুচির

পরিচয় দেন সবার কাছে। প্রতিদিন তিনি নৈশভোজ এবং নাচে নিমন্ত্রিত হতেন আর প্রায়ই নাটক দেখতে যেতেন, নয় তো যেতেন সঙ্গীতের আসরে। অনেক সময়ে রাত দুটোর পর নিজের হোটেলে ফিরে আসতেন। এখানে তিনি এক অপেরা গায়ককে নিযুক্ত করেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতে তালিম নেওয়ার জন্যে। সঙ্গীতে তাঁর কেবল আগ্রহ



লন্ডনের কেনসালগ্রীন কবরস্থানে দ্বারকানাথের অনাড়ম্বর সমাধি। তার ওপর তাঁর অনাড়ম্বর পরিচয়।

ছিলো না, গানের গলাও ছিলো তাঁর। কলকাতাতেই তিনি গাইতে এবং বাজাতে শিখেছিলেন। পিয়ানো বাজানোও শিখেছিলেন এক সাহেবের কাছে।

অগস্ট মাসে দ্বারকানাথ বেড়াতে যান আয়ারল্যান্ডে। সেখানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মনে হয়, সেখানে তিনি মাস দুয়েক ছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তিনি ব্রিস্টলে যান রামমোহন রায়ের কবর দেখতে। শহরের বাইরে স্টেপলটনের যেখানে রামমোহনের দেহাবশেষ সমাধিস্থ ছিলো, তিনি সেখান থেকে তা এনে ব্রিস্টল শহরের আর্নস গ্রোভের একটি সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করেন এবং উইলিয়াম প্রিন্সেপের নকশা অনুযায়ী সেখানে একটি ছত্রী নির্মাণ করে দেন। তাঁর কবরের ওপরে যে-সমাধিলিপি আছে, তাও তাঁর উদ্যোগেই তৈরি করা হয়।


ভারতবিশারদ ম্যাক্স মূলার

লন্ডনে ফিরে আসার কিছু দিন পরে দ্বারকানাথ প্যারিস ভ্রমণ করতে যান ১৮ই ডিসেম্বর। সেখানে প্রায় তিন মাস ছিলেন তিনি। এ সময়ে ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বেশ কয়েকবার তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তা ছাড়া, পরিচয় হয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে। ভারত-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স মূলারও এসে তাঁর সঙ্গে বহুবার দেখা করে ভারতীয় শাস্ত্র, সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন। তাঁর সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করা ছাড়াও দ্বারকানাথ তাঁকে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সঙ্গীত গেয়ে এবং পিয়ানোতে বাজিয়ে শোনান। তিনি নিজেও প্যারিসে ইউরোপীয় সঙ্গীত এবং নাটক খুব উপভোগ করেন। তাঁর অতিথিদের সম্মানে তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ একটি নৈশভোজ এবং নাচের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাতে পরিবারের সদস্য এবং সঙ্গীদের নিয়ে রাজাও যোগ দিয়েছিলেন। প্যারিসের পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছিলো যে, এ রকম জাঁকজমকপূর্ণ পার্টি সেখানে এর আগে কখনো হয়নি। প্রধানত এই পার্টি দেওয়ার এবং সেখানে তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্যে তিনি প্রিন্স নামে পরিচিত হন।

এবার ইউরোপ ভ্রমণের সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিলো না। মাঝেমধ্যেই তাঁর জ্বর হতো। মার্চ মাসে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পর তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত খারাপ হতে থাকে।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে তিনি সমুদ্রের কাছাকাছি দক্ষিণ ইংল্যান্ডের ওয়ার্থিং নামে একটা জায়গাতে গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয়নি। জুলাই মাসের সাতাশ তারিখে তাঁকে প্রায় অচেতন অবস্থায় লন্ডনে নিয়ে আসা হয় এবং তার পাঁচ দিন পরেই — পয়লা অগস্ট তিনি মারা যান। তাঁকে সমাহিত করা হয় পশ্চিম লন্ডনের কেনসালগ্রীনের একটি সমাধিতে। তবে তাঁর নির্দেশ মতো তাঁকে সমাহিত করার সময়ে কোনো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়নি। ষোলো বছর পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই অনাড়ম্বর এবং অবহেলিত সমাধি দেখতে গিয়ে খুব হতাশ হয়েছিলেন।

মোট কথা, যে-বাংলাভাষীরা প্রথম বিলেত যান, তাঁদের মধ্যে রামমোহন এবং দ্বারকানাথের মতো দুজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং অভিজাত ব্যক্তি থাকার ফলে বাঙালি এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে সেখানকার সমাজের, বিশেষ করে সমাজের উঁচু তলার লোকেদের মধ্যে উঁচু ধারণার সৃষ্টি হয়েছিলো। হয়তো সে জন্যেই পরে যাঁরা সে দেশে যান, বিলেতের সাধারণ মানুষরা তাঁদের প্রতি মোটামুটি সম্মান দেখান। ভারতবর্ষে ইংরেজরা বাঙালিদের প্রতি যে-ধরনের ব্যবহার করতেন, বিলেতে সে তুলনায় অনেক ভদ্র এবং সম্মানজনক আচরণ করতেন। তবে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ সমাজের, বিশেষ করে সমাজের নিচের তলার লোকেদের, বর্ণবাদী মনোভাব অনেক দিনই বজায় ছিলো। একুশ শতকের গোড়ায় এসেও যে একেবারে লোপ পেয়েছে, তা নয়। সে জন্যে, আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইতেশাম উদ্দীনকে বহু বার 'কালুয়া' বলে গাল শুনতে হয়েছিলো। ১৮৩০-এর দশকে রামমোহন রায়কে এক সভায় দেখে 'এই কালুয়া এখানে কি করছে?' বলে কম্পেনির ভারতফেরত এক সাবেক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছিলেন। ১৮৪০-এর দশকে এ রকম মন্তব্য দ্বারকানাথকেও শুনতে হয়েছে। এমন কি, তার প্রায় চল্লিশ বছর পরে রাস্তায় ছোটো ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেও, 'দেখো, দেখো, এই ব্ল্যাকীকে দেখো!' বলেও মন্তব্য করেছে — রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন। মাইকেল মধুসূদনও (১৮৬৪) মনের দুঃখে গৌরদাসকে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের তুলনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, 'এ দেশে (ফ্রান্সে) কেউ তোমাকে কালো নিগার বলে অপমান করবে না।' এমন কি, ১৮৮০-এর দশকের গোড়ায় বিলাতের পত্রে কৃষিবিদ গিরিশচন্দ্র বসুও একই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। তাঁর বিশ বছর পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন রকমের ছিলো না।

বিলেতি বিদ্যার সন্ধানে

আগের অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, ১৭৭৪-৭৫ সালে মীর মোহাম্মদ হোসেন বিলেতে গিয়েছিলেন সেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি নিজের চোখে দেখার জন্যে। রামমোহনও গিয়েছিলেন কেবল মুঘল সম্রাটের দৌত্য করার জন্যে নয়, বরং তাঁর যাওয়ার প্রধান লক্ষ্য ছিলো পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করা। তেমনি দ্বারকানাথ ঠাকুরও গিয়েছিলেন পশ্চিমা জগৎ কেমন, নিজের চোখে তা দেখার জন্যে এবং সেই সঙ্গে সেই জীবনের স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশে। তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ ছিলো তাঁর বিলাসিতারই একটা অংশ। তবে সেই সঙ্গে তাঁর আর-একটা লক্ষ্য ছিলো নিজের দেশের যুবকদের বিলেতি শিক্ষা দিয়ে সত্যিকারের শিক্ষিত করে তোলার। সে জন্যে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর পুত্রসহ, কয়েকজন শিক্ষার্থীকে। এই যে বিলেত গিয়ে সেখানকার জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং সম্ভব হলে লেখাপড়া শিখে আসা, এটা পরবর্তী কালে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারার সৃষ্টি করে।

রামমোহন এবং দ্বারকানাথের পরবর্তী কয়েক দশক যে-বাঙালিরা বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউই এঁদের মতো প্রৌঢ় অথবা অবস্থাপন্ন ছিলেন না। কেবল দেশভ্রমণের জন্যে অথবা উপভোগ করার জন্যে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। তাঁরা প্রায় সবাই গিয়েছিলেন সেখানে উচ্চশিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়েই।

কলকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিলো ১৮৩৫ সালে। বছর পাঁচেকের মধ্যে কলেজের অধ্যাপক এবং পরিচালকরা অনুভব করেছিলেন যে, কয়েকজন ভারতীয়কে বিলেত থেকে চিকিৎসা-বিদ্যা পড়িয়ে না-আনলে কলেজের বিকাশ ঘটবে না অথবা বিলেতি চিকিৎসার দিকে দেশীয়দের আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। সে কারণে, দ্বারকানাথের সঙ্গে চারজন ছাত্রকে পাঠানো হয়। আগেই বলেছি, এঁদের দুজনের যাবার খরচ দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ নিজে। একজনের খরচ দেন কলকাতার ভদ্রলোকরা চাঁদা দিয়ে। আর এঁদের মধ্যে সবার ছোটো — সূর্যকুমার চক্রবর্তীর খরচ দেয় ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনি। তা ছাড়া, কম্পেনি আর-একটা বড়ো কাজ করেছিলো

এই চারজন ছাত্রের তদারকির জন্যে কলেজের অ্যানাটমি এবং মেডিসিনের অধ্যাপক হেনরি গুডিবকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে। অধ্যাপক গুডিব এবং ছাত্রদের লন্ডনে থাকার ব্যয়ও বহন করেছিলো কম্পেনি। তাঁরা সবাই মিলে বাস করতেন লন্ডনের কেন্দ্রে — ৭ নম্বর আপার উওবার্ন প্লেসে।

লেখাপড়া শিখতে যাওয়ার মতো মহৎ উদ্দেশ্য থাকলেও, হিন্দু সমাজের কারো পক্ষেই কালাপানি পার হওয়া সহজ কাজ ছিলো না। তার ওপর এঁরা গিয়েছিলেন চিকিৎসা বিদ্যা শেখার জন্যে। এ উদ্দেশ্য তাঁদের যাত্রাকে আরও কঠিন করেছিলো নিঃসন্দেহে। যে-সমাজে মরার আগেই একজন মানুষকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু কামনা করা হতো এবং তারপর সে ব্যক্তি যতো দিনই বেঁচে থাকেন না কেন, তাঁকে আর গঙ্গার ধার থেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হতো না, সে সমাজে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে অন্যান্য জাতের লোকের সঙ্গে হসপিটালে যাওয়া অথবা ম্লেচ্ছদের চিকিৎসা বিদ্যার আশ্রয় নেওয়া দীর্ঘদিন গ্রহণযোগ্য আদর্শ অথবা সমীচীন বলে গৃহীত হয়নি। এ ধারণা এতোই অপরিচিত ছিলো যে, হাসপাতালের সমার্থক কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় ছিলো না। *ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায়* প্রকাশিত ১৭৮০-এর দশকের একটি বাংলা বিজ্ঞাপনে দেখেছি যে, কলকাতায় যখন হসপিটাল খোলা হয়, তখন কথাটার অনুবাদ করে বলা হয়েছে 'তাওতখানা'। ইংরেজ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং একেবারে নিচু জাতের লোক ছাড়া দীর্ঘকাল এই তাওতখানায় কেউ যেতেন না। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কালাপানি পার হওয়ার নিষেধ অমান্য করে এই ছাত্ররা কেন গেলেন অথবা তাঁদের পক্ষে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হলো?

এর উত্তরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রতি হিন্দু সমাজের মনোভাবের কথা সংক্ষেপে বলতে হয়। এক কথায়, এই কলেজ যখন স্থাপন করা হয়, তখন রক্ষণশীল হিন্দুরা তার সঙ্গে বিশেষ সহযোগিতা করেননি। রামকমল সেনের মতো দু-চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস্তবতা এবং উপযোগিতার কথা ভেবে এই কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, রক্ষণশীল সমাজের ছাত্ররা সেখানে অধ্যয়ন করতে যাননি সহজে। সবচেয়ে বড়ো বাধা এসেছিলো শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে। এই বাধা অমান্য করার জন্যে চারজন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর প্রথম 'মড়া কাটা'র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন কলেজের সহকারী শিক্ষক মধুসূদন গুপ্ত। ঘটনাটা সমগ্র হিন্দু সমাজের পিলে চমকে দিয়েছিলো। এটা এমন অসাধারণ বলে বিবেচিত হয় যে, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি করে এর প্রতি সম্মান জানানো হয়।

১৮৩৯ সালে সেখানে যখন প্রথম চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, তখন এগারোজন প্রার্থীর মধ্যে যে-দুজন নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন তাঁদের একজন বাঙালি

ব্রাহ্মণ — বদনচন্দ্র চৌধুরী। পরেও মেডিকেল কলেজে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিলো। প্রথমবার পরীক্ষা দিয়েছিলেন যে-নজন, তাঁদের চারজন বৈদ্য এবং পাঁচজন কায়স্থ। যে-পাঁচজন ছাত্র এই পরীক্ষায় পাশ করেন, তাঁরা হলেন — উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দেব, নবীনচন্দ্র মিত্র আর শ্যামাচরণ দত্ত। এঁরা কেউই বোধ হয় রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন না। এই পাঁচজনের মধ্যে শ্যামাচরণ ছাড়া অন্যদের নিয়েই মধুসূদন গুপ্ত লাশ কেটেছিলেন। পশ্চিমা চিকিৎসা বিদ্যা শিখে মধুসূদন নিজেও পরীক্ষা দিয়ে এর পরের বছর পাশ করেন।



মধুসূদন গুপ্ত

দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যাঁরা যান, তাঁদের একজন দ্বারকানাথ বসু। তিনি ১৮৪১ সালের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। আদৌ হিন্দুই ছিলেন না তিনি — এর চার বছর আগেই তিনি অ্যালেক্সান্ডার ডাফের কাছে খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অন্য তিন জনের থেকে বয়সে বড়ো ছিলেন তিনি। আর সবার ছোটো — সূর্যকুমার চক্রবর্তীও (জন্ম ঢাকায়, ১৮২৬?) ঠিক হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যিক সদস্য ছিলেন না। তাঁর বাবা-মা মারা যান তাঁর একেবারে বাল্যকালে। নিজের চেষ্টাতেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে বিনা বেতনে লেখাপড়া শিখেছিলেন খৃস্টান স্কুলে, কারো কারো মতে, হেয়ার স্কুলে। স্কুলের পড়া শেষ করার পর তাঁকে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার খরচ দিতেন কম্পেনির একজন সিভিলিয়ান — মি অ্যালেক্সান্ডার। মোট কথা, রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সদস্য হলে এই ছাত্ররা খুব সম্ভব মেডিকেল কলেজে পড়তেন না, অথবা পড়লেও কালাপানির নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিলেতে যেতেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কালাপানির নিষেধ না-থাকলেও, তাঁদের মধ্যে প্রথম দিকে যাঁরা বিলেত গিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন আয়া, ভৃত্য অথবা জাহাজের লস্কর। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার যে-ঐতিহ্য গড়ে উঠতে আরম্ভ করে, মুসলমানরা ছিলেন তা থেকে অনেক দূরে। চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করা দূরে থাক, তাঁদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষারই সূত্রপাত তখনো হয়নি।

চিকিৎসা বিদ্যার দিকে তাঁরা কতো দেরিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার একটা পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, ১৮৭০ সাল নাগাদ মেডিকেল কলেজে যখন অনেক হিন্দু অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন, তখন কর্মচারীদের তালিকায় নাম ছিলো মাত্র দুজন মুসলমানের। তাঁরা অধ্যাপকও ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন টীচার। এঁদের একজনের নাম তমিজ খান, অন্যজন মীর আশরাফ আলি। তমিজ খান ছিলেন মেডিসিনের টীচার, আর আশরাফ আলি ধাত্রীবিদ্যার। মুসলমানদের যে চিকিৎসা বিদ্যা শেখার মতো মেধা ছিলো না, তা নয়। তমিজ খানই তা প্রমাণ করেছিলেন। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

অধ্যাপক হেনরি গুডিব এবং তাঁর ছাত্ররা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে একই জাহাজে কলকাতা থেকে ১৮ই মার্চ (১৮৪৫) রওয়ানা করলেও, লন্ডনে পৌঁছে যান দ্বারকানাথের আগেই। কারণ তাঁরা তাঁর মতো ইউরোপ ঘুরে যাননি। এপ্রিলের শেষে সেখানে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন তাঁরা। তখন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনে (ইউসিএল) পড়ানো হতো এমবি আর এমডি ডিগ্রির জন্যে। এ ছাড়া, নর্থ লন্ডন হসপিটাল-সহ একাধিক হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত থেকে লেখাপড়া শিখতে হতো। পরীক্ষা হতো রয়্যাল কলেজ অব সার্জন্সের তত্ত্বাবধানে। সেখান থেকে ডিগ্রি মিলতো এমআরসিএস।

স্বদেশের মাটি থেকে অনেক দূরে থাকলেও এই তরুণ ছাত্রদের মনে তখন প্রচুর উৎসাহ ছিলো। এর একটা প্রমাণ এই যে, লন্ডনে পৌঁছানোর পরের মাসেই (মে) দ্বারকানাথ বসু সাঁতার প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারানোর জন্যে পরিচিত ইংরেজদের চ্যালেঞ্জ জানান। নদীমাতৃক বঙ্গদেশের ছেলে দ্বারকানাথ ভেবেছিলেন ইংরেজদের তিনি হারিয়ে দেবেন। কিন্তু পারেননি। তবে সুইমিং পুলে ফলাফল যেমনই হোক, পরীক্ষার হলে বেশির ভাগ ইংরেজ ছাত্রের তুলনায় তিনি বেশি কৃতিত্ব দেখান। পরের বছর (১৮৪৬) জুলাই মাসে যে-পরীক্ষা হয় তাতে তিনি এমআরসিএস হন। ১৮৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অধ্যাপক গুডিব কম্পেনির পরিচালকদের লেখেন যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার মতো সাহস নাকি দ্বারকানাথের ছিলো না। সুতরাং আর-কোনো ডিগ্রি না-করলেও এমআরসিএস হওয়ার পর তিনি কয়েক মাস অধ্যাপক মার্ফির অধীনে হাসপাতালে কাজ করেন। বিশেষ করে শল্যচিকিৎসা এবং ধাত্রীবিদ্যায় তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। তারপর ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি সাউথাম্পটন হয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রথম দিকে অধ্যাপক গুডিব দ্বারকানাথ বসুর সাধারণ চরিত্র এবং ব্যবহার নিয়ে বড়ো একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু এই চিঠিতে তিনি তাঁর চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাঁর পক্ষে বঙ্গদেশ সরকারের কাছে সুপারিশ করে পাঠান।

ওদিকে, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যে-পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, তা বর্জন করেন অথবা পিতার অবর্তমানে বর্জন করতে বাধ্য হন। বস্তুত, বাধ্য হন দেশে ফিরে যেতে। তবে তিনি লন্ডনে থাকার সময়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বেশ খানিকটা জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দেশে ফিরে সেই সূত্র ধরে একটি সরকারী চাকরি চেয়ে লর্ড অকল্যান্ডের কাছে আবেদন করেছিলেন তিনি।

ভোলানাথ বসুও ডাক্তারি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি বিদেশী ভাষার পরীক্ষায় পাশ করা ছাড়াও, বটানিতে কলেজের স্বর্ণপদক লাভ করেন। ল্যাটিন ভাষায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। সে কথা উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক গুডিব। অধ্যাপক সি জে উইলিয়ামস ছিলেন সেকালের নাম-করা ডাক্তার। তিনিও ভোলানাথ বসু এবং গোপাল শীলের খুব প্রশংসা করেন। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে তিনি কম্পেনিকে লেখেন যে, পরীক্ষায় তাঁরা নানা বিষয়ে সাফল্য দেখিয়েছেন। তিনি আরও লেখেন যে, তাঁর তত্ত্বাবধানে ভোলানাথ সময় রক্ষা করে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করছেন। বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ভোলানাথ উল্লেখযোগ্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও লেখেন যে, ভোলানাথ এবং গোপাল শীল দুজনই তাঁর মেডিসিনের লেকচারে যোগ দিয়ে খুবই কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি আশা করেন যে, তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তাঁরা তাবৎ ছাত্রের মধ্যেই কৃতিত্ব দেখাবেন।

বয়স কম থাকায় সূর্য চক্রবর্তী এঁদের সঙ্গে একত্রে পড়তে পারেননি। তিনি ১৮৪৭ সালের গরমের সময়ে অধ্যাপক গ্র্যান্টের সঙ্গে ফ্রান্স এবং জার্মেনি-সহ পশ্চিম ইউরোপের অনেক জায়গা ভ্রমণ করেন। ভাষা শিক্ষায়ও তিনি বিশেষ মেধার পরিচয় দেন। অধ্যাপক গুডিবের মতে, ল্যাটিন, গ্রীক এবং ফরাসি ভাষা সূর্যকুমার পড়তে পারেন এবং জার্মান ভাষা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বলতে পারেন। প্রথম দিকে ইংরেজিতে বিশেষ ভালো না-হলেও, তিনি ততোদিনে চমৎকার ইংরেজিও শিখেছিলেন। কম্পেনির পরিচালকদের কাছে লেখা তাঁর একাধিক চিঠি থেকেই ইংরেজিতে তাঁর পারদর্শিতা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হয়।

১৮৪৭ সালের গরমের সময়ে সূর্য চক্রবর্তী যখন পশ্চিম ইউরোপ ঘুরছিলেন, ভোলানাথ এবং গোপাল তখন অধ্যাপক গুডিবের সঙ্গে উত্তর ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে ঘুরতে বের হন। তাঁরা এডিনবরা, ডান্ডি এবং গ্ল্যাসগো হয়ে আয়ারল্যান্ডে যান। সেখান থেকে উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার এবং অন্যান্য জায়গা ঘুরে দেখেন। ব্রিস্টলে গিয়ে রামমোহন রায়ের কবরও দেখে আসেন তাঁরা। পরের বছরের গোড়াতেই তাঁরা দুজন অধ্যাপক গুডিবের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যান। তখনো ইন্ডিয়ান মেডিকেল

সার্ভিসের সূত্রপাত হয়নি। সুতরাং তাঁরা কভেনেন্টেড অর্থাৎ আইসিএস-এর সমমানের চাকরি পাননি, যদিও উচ্চপদ লাভ করেছিলেন।

ভোলানাথ প্রথমে সেনাবাহিনীতে এবং তারপর ফরিদপুরে প্রায় ৩০ বছর মেডিকেল অফিসার এবং কারাধ্যক্ষ হিশেবে কাজ করেছিলেন। তবে দেশীয়দের মধ্যে সবার আগে এমডি ডিগ্রি লাভ করলেও তিনি চাকরিতে সেই অনুরূপ উন্নতি করতে পারেননি। এমন কি, আইএমএস চালু হবার পরও সরকার তাঁকে কভেনেন্টেড চাকরি দেয়নি। তিনি যে চিকিৎসাবিদ্যা ভালো করে রপ্ত করেছিলেন, তার একটা প্রমাণ এই যে, ১৮৭০-এর দশকে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই দশকেই তিনি নিজের চিকিৎসার জন্যে দ্বিতীয়বার বিলেতে গিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে তিনি যখন মারা যান, তখন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে যান। ওদিকে, গোপাল শীল দেশে ফিরে স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিশেবে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। কিন্তু বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার আগেই তিনি পানিতে ডুবে মারা যান। সেনাবাহিনীর কাজে তিনি ১৮৫০ সালে পশ্চিম ভারতে গিয়েছিলেন — তার প্রমাণ আছে। তিনি ঠিক কখন মারা যান, তা অবশ্য জানা যায় না।

চারজনের মধ্যে সবার ছোটো হলেও সূর্যকুমার চক্রবর্তী ছিলেন খুব প্রতিভাবান। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বিলেত যাওয়ার মাত্র এক বছর আগে। ন্যূনতম বয়সের শর্ত পূরণ না-হওয়ায় তিনি অন্য তিনজনের সঙ্গে ১৮৪৬ সালের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। তবে ১৮৪৮ সালের ১২ই মে তিনি এমআরসিপি হন। ২০শে মে তারিখের *Lancet* পত্রিকায় তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করা হয়। অ্যানাটমিতে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৮৪৮ সালের নভেম্বর মাসে আরও লেখাপড়া এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশে দু বছর বিলেতে থাকার জন্যে তিনি কম্পেনির কাছে আবেদন করেন। কম্পেনির পরিচালকরা তাঁর পড়ার খরচ ছাড়াও, লন্ডনে বাস করার জন্যে তাঁকে পনেরো মাসের খরচ বাবদে ১৬০ পাউন্ড মঞ্জুর করেন। তিনি একটি মাইক্রোস্কোপ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই কেনার জন্যে ৫৫ পাউন্ড চেয়েছিলেন। কম্পেনি অবশ্য তা দিতে অস্বীকার করে। এমআরসিপি ছাড়াও ১৮৪৮ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে এমবি পাস করেন এবং ১৮৪৯ সালে ন্যূনতম বয়সের শর্ত পূরণ হলে প্রথম বিভাগে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রার্থীদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৪ই অক্টোবর তারিখের *Lancet* পত্রিকায় তাঁর প্রশংসা করা হয়।

এর পর সূর্যকুমার স্বদেশে ফিরে যান। ঠিক কখন ফেরেন, তা নিয়ে খানিকটা সংশয়

রয়ে গেছে। মাইকেল ফিশারের লেখা থেকে মনে হতে পারে যে, ১৮৪৯ সালের শেষে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো চাকরি দেওয়ার সুপারিশ করে কম্পেনির পরিচালকরা যে-চিঠি লেখেন, তার পরপরই তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর্স-এর সভার সিদ্ধান্তে সূর্য চক্রবর্তীর একটি পত্র দেখেছি, যার তারিখ ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫০। এ চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন লন্ডনের বেডফোর্ড স্কোয়ারের ১৩ নম্বর নর্থ ক্রিসেন্ট থেকে। অর্থাৎ তিনি অন্তত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অবধি লন্ডনেই ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছেন পি. সি. সেনগুপ্ত। তাঁর লেখা থেকে মনে হয় তিনি কলকাতায় ফেরেন হয়তো এপ্রিলের শেষে অথবা মে মাসের শুরুতে। ক্রফোর্ড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *A History of the Indian Medical Service*-এ মেডিকেল কলেজে তাঁর যোগদানের তারিখ লিখেছেন ১০ই মে। এ থেকেও মনে হয়, তিনি মে মাসের গোড়ায় দেশে ফিরে আসেন।

সূর্য চক্রবর্তী বিশেষ করে হৃদরোগ এবং ফুসফুসের রোগে পারদর্শিতা দেখান। তবে অন্যান্য রোগ নিয়েও তিনি গবেষণা করেন এবং কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ে তিনি এক মৃগীরোগীর এমন অভিনব চিকিৎসা করেন যে, সে সম্পর্কে তিনি দেশে-বিদেশে প্রশংসা লাভ করেন। এ বিষয়ে ১৮৫২ সালে লন্ডনের *Medical Times and Gazette* পত্রিকায় প্রশংসা করে লেখা হয় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই চিকিৎসাকে তাঁর মৌলিক অবদান বলে মেনে নিতে হবে। পরে বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর অধ্যাপক জীবনে তিনি ম্যালেরিয়া-সহ বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগসমূহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেন। এ সম্পর্কে বিলেতের মেডিকেল জার্নালে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাঁর কয়েকটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছিলো।

চিকিৎসাবিদ্যার বাইরে বিলেতি সমাজ এবং জীবনযাত্রা দিয়েও তিনি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরপরই তিনি পৈতা ত্যাগ করেছিলেন। তার চেয়েও বড়ো কথা, প্রথম যৌবন থেকেই তিনি খৃষ্টধর্ম এবং ইংরেজি সভ্যতা দিয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কয়েক বছর লন্ডনে বাস করার পর ১৮৪৮ সালে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজের নামের সঙ্গে অধ্যাপক গুডিবের নাম জুড়ে দেন। তাঁর নাম হয় সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী। তবে অধ্যাপক গুডিবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে তিনি খৃষ্টান হননি। কারণ তিনি খৃষ্টান হওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই অধ্যাপক গুডিব অন্য দুই ছাত্রের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু সূর্য চক্রবর্তী নিজের নামের সঙ্গে গুডিব নামটা জুড়ে দেওয়ায় অধ্যাপক গুডিব নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি ছাত্রের আনুগত্য এবং ভক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে থাকবেন।

দেশে ফিরে এসে সূর্য চক্রবর্তী কলকাতা মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক হন। ১৮৫৪ সালে যখন কম্পেনি ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস (আইএমএস) চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন তিনি ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার বিলেতে যান। কয়েক সপ্তাহ পরে জানুয়ারি মাসের ৮ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তিনি দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। কিন্তু ১৮৫৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি থেকেই তাঁকে কভেনেন্টেড মেডিকেল সার্ভিসে সহকারী সার্জন এবং জেনারেল হসপিটালের সহকারী প্রধান চিকিৎসকের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কভেনেন্টেড কর্মচারী — আর, দ্বিতীয় নন, দেশীয়দের মধ্যে তৃতীয় কভেনেন্টেড কর্মচারী হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেশ কয়েকবার অস্থায়ী অধ্যাপক পদে থাকার পর ১৮৬৬ সালে সূর্যকুমার স্থায়ী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি সার্জন পদ লাভ করেন ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে আর সার্জন মেজরের পদ ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে। ৭৪ সালের গোড়ায় চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি তৃতীয়বারের মতো বিলেত যান নিজের চিকিৎসার জন্যে। ঐ বছরই ২৯শে সেপ্টেম্বর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে গুডিব চক্রবর্তী লন্ডনের কেনসিংটনে মারা যান। যে-দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে তিনি একত্রে লন্ডনে গিয়েছিলেন এর ২৯ বছর আগে, তাঁর সমাধির কাছেই তিনি চিরদিনের জন্যে আশ্রয় নেন। ভাগ্যের আরও পরিহাস, যাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন, তাঁর সেই শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষক অধ্যাপক হেনরি গুডিব তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। সেটা নিশ্চয় অধ্যাপক গুডিবের জন্যে আন্তরিক দুঃখের কারণ হয়েছিলো।

সূর্য চক্রবর্তী কালাপানি পার হওয়ায় এবং দেশে ফেরার আগেই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করায় সমাজ তাঁকে কতোটা গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করেছিলো, তা উল্লেখ না-করলে তাঁর কাহিনী অপূর্ণ থেকে যায়। আগেই বলেছি, বাল্যকালেই তিনি পিতামাতাকে হারিয়েছিলেন। সে দিক দিয়ে তাঁর ওপর পারিবারিক বন্ধন অথবা চাপ সামান্যই ছিলো। তা ছাড়া, খৃস্টান হবার ফলে হিন্দু সমাজে গৃহীত হওয়ার তাঁর তেমন কোনো প্রয়োজন ছিলো না। হিন্দুরা তাঁকে গণ্য করতেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা মাইকেল মধুসূদনের মতো যাঁরা খৃস্টান হয়েছিলেন, তাঁদের মতোই। অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের সামাজিক যোগাযোগ ছিলো না। কিন্তু তাই বলে তিনি একঘরেও ছিলেন না। ডাক্তার হিশেবে উচ্চ সম্মানের আসনেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

লন্ডনের বিয়ের রেজিস্টার থেকে তাঁর বিয়ের খবর জোগাড় করতে চেষ্টা করেছিলাম। কলকাতার রেজিস্টার থেকেও। কিন্তু কোথাও তাঁর বিয়ের কোনো তথ্য পাইনি। তাঁর

সম্পর্কে *Calcutta Review* পত্রিকায় (১৯১৩) হরিহর দাস লিখেছেন যে, তিনি যাঁকে বিয়ে করেন, সেই তরুণী ছিলেন বাঙালি খৃষ্টান এবং কলকাতার স্কুলে পড়া ইংরেজি-শিক্ষিত। অপর পক্ষে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী লিখেছেন যে, এই তরুণী ছিলেন মালয়ী খৃষ্টান। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর তথ্যকেই আমি সঠিক মনে করি। কারণ, সূর্য চক্রবর্তীর এক কন্যার চেহারা কেমন ছিলো, তা বলতে গিয়ে জ্ঞানদা লিখেছেন যে, এই কন্যা তাঁর মায়ের চেহারার বৈশিষ্ট্য (ভোট-চীনা) লাভ করেছিলেন। তা ছাড়া, জ্ঞানদা মা এবং মেয়ে দুজনকেই দেখেছিলেন। হরিহর দাস শোনা-কথা লিখেছিলেন। ১৮৫২ সালে মেরী নামে তাঁদের প্রথম সন্তান জন্মে। তারপর স্যারা, হেনরি, উইলিয়াম, মেরী অ্যান, অ্যালেক্সান্ডার, এডওয়ার্ড, মহেন্দ্র এবং অ্যালফ্রেড নামে একে-একে তাঁদের দশটি সন্তান হয়েছিলো। পাঁচটি সন্তানের নামের সঙ্গে সূর্যকুমার তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গুডিবের নামটি জুড়ে দিয়েছিলেন এবং একটি সন্তানের নাম রেখেছিলেন হেনরি। এ থেকে অধ্যাপকের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা — দুই বোঝা যায়। কিন্তু একটি ছেলের তিনি দিয়েছিলেন বাংলা নাম — মহেন্দ্র, কেন অথবা কার প্রতি ভালোবাসাবশত আমার জানা নেই।

দ্বিতীয় যে-বাঙালি কভেনেন্টেড চাকরি পান, আগেই বলেছি তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। তাঁর নাম রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র। ১৮৫৫ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি হন। আগের চারজন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রের মতোই তিনিও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। দেশে ফিরে ১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি তিনি ২৪ বছর বয়সে কভেনেন্টেড চাকরি পান। বিলেতে থাকার সময়েই তিনি এক অভিজাত ইংরেজ পরিবারের কন্যাকে বিয়ে করেন। সেকালে বাঙালিরা যে-ইংরেজ নারীদের বিয়ে করেছিলেন, তাঁরা কেউই এই মহিলার মতো উচ্চবংশীয় ছিলেন না। এঁর ভাই ছিলেন বিলেতের সলিসিটর-জেনারেল স্যর হার্ডিংস গিফোর্ড। পরে তিনি লর্ড চ্যান্সেলর হন এবং তাঁর পদবী হয় লর্ড হ্যালস্‌বেরি। রাজেন্দ্র চন্দ্র প্রথম দিকে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেন। তারপর ১৮৭৪ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঐ বছর অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণের পর তিনি লন্ডনে গিয়ে হাইড পার্ক এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এবং সেখানেই মারা যান ১৮৯৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর।

রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র যে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই প্রসঙ্গে স্বভাবত প্রশ্ন জাগে, কালাপানি পার হওয়ার সাহস তিনি কোথায় পেয়েছিলেন এবং বিলেত যাওয়ার খরচই বা জোটালেন কোথা থেকে? বিশেষ করে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো কেউ যখন তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না অথবা কম্পেনিও যখন তাঁকে বৃত্তি দেয়নি? এর

উত্তর অনুমান করা কঠিন নয়। রক্ষণশীল তো দূরের কথা, তিনি আদৌ হিন্দুই ছিলেন না।

তাঁর পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, প্রথমে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন অ্যালেক্সান্ডার ডাফের স্কুল স্কটিশ ফ্রী চার্চ ইনস্টিটিউশনে। ১৮৫০-এর দশকের গোড়ায় ডাফের কাছেই তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হয়তো খৃস্টীয় সূত্রেই বিলেতে যাওয়ার সুযোগ এবং অর্থ জুটেছিলো। মোট কথা, খৃস্টান হয়েছিলেন বলে কালাপানির ভয় থেকে তিনি অন্তত মুক্ত হয়েছিলেন।



লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (ইউসিএল) দ্বারকানাথ বসু, সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু-সহ অনেক বিখ্যাত বাঙালিই এখানে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

প্রসঙ্গত বলতে পারি, কালাপানির ভয় থেকে মুক্ত হলেও, কোনো কোনো বিদ্বেষ থেকে তিনি খুব সম্ভব মুক্ত হতে পারেননি। যেমন, নারীবিদ্বেষ। ১৮৮০-এর দশকে যখন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রীদের ভর্তির কথা ওঠে, তখন মেডিকেল কলেজের একজন প্রবীণ অধ্যাপক হিশেবে তিনি তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। বিরোধিতা করে তিনি ঠিক কী কারণ দেখিয়েছিলেন, তা কোথাও লেখা নেই। তবে সাধারণভাবে তখন যে-আপত্তি উঠেছিলো, তা হলো: চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানোর সময় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হয়, নারীদের সামনে তা করতে পুরুষ শিক্ষকরা বিব্রত বোধ করবেন। আর এর ফলে শিক্ষার মান নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

এই আপত্তির মুখে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কিছু দিন মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা পড়া ঠেকিয়ে রেখেছিলো। তবে মেয়েরা মাদ্রাসে মেডিকেল পড়ার অনুমতি পাওয়ায়, কলকাতাও বেশি দিন আপত্তি করতে পারেনি। বিশেষ করে তখনকার আইন অনুযায়ী গ্র্যাজুয়েট হলে সবাই ডাক্তারি পড়ার জন্যে গৃহীত হতেন। কাদম্বিনী বসুও গ্র্যাজুয়েট হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রী। তিনি চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না-পারার পেছনে নাকি রাজেন্দ্র চন্দ্রের অবদান ছিলো। রাজেন্দ্র চন্দ্র ছিলেন মেডিসিনের অধ্যাপক। আর কাদম্বিনী পাশ মার্কের চেয়ে এক নম্বর কম পেয়েছিলেন এ বিষয়ে। এ জন্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজ তাঁকে তাদের নিয়মিত এমবি ডিগ্রি না-দিয়ে, প্রথম দিককার ডিগ্রি — জিবিএমসি — দিয়ে ডাক্তারি করার অনুমতি দেয়। এ কথা সত্য হলে একে রাজেন্দ্র চন্দ্রের উদারতা বলে গণ্য করা যায় না। কিন্তু এ তথ্য যাচাই করে দেখতে পারিনি।

বাঙালি ছাত্ররা প্রথমে বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে। এবং যে-পাঁচজন গিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের লেখাপড়া শেষ করেছিলেন। দেশে এসে তাঁরা ভালো চাকরিও করেছেন। সুতরাং তাঁদের দৃষ্টান্ত দেখে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রের বিলেতে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার কথা ছিলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এঁরা দেশে ফেরার পর ১৮৬০-এর দশকে মুষ্টিমেয় ছাত্রই চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে যান। প্রথম পাঁচজনের মতো সুযোগ এবং সরকারী আনুকূল্য সম্ভবত তাঁরা পাননি। এবং নিজেদের ব্যয়ে যাওয়ার মতো অর্থও সবার ছিলো না। এ ছাড়া, লোকাচারের বাধা তো ছিলোই! এর পরে বরং অনেক বেশি ছাত্র যেতে আরম্ভ করেন ব্যারিস্টার হবার জন্যে।

১৮৬০-এর দশকে যাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে যান, তাঁদের মধ্যে সবার আগে যান বসন্তকুমার বসু। আগের পাঁচজনের মতোই তিনি ১৮৬৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে আসেন এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ঠিক কখন বিলেতে যান, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি — হয়তো এর দুতিন বছর আগে। তাঁর মতো একই বছর আর-একজন ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন — তিনি হলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতা থেকে এলএমএস পাশ করে স্কটল্যান্ডে যান এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলআরসিপিএস পাশ করেন। মনে হয়, তাঁর আগে স্কটল্যান্ড থেকে কোনো বাঙালি চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হননি। তিনিও দেশে ফিরে মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন।

পরে চিকিৎসাবিদ্যার জন্যে বাঙালি ছাত্ররা বেশির ভাগই স্কটল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই বেছে নিয়েছিলেন। এগুলো হলো এডিনবরা, গ্লাসগো আর

অ্যাবারডিন। এর কারণ, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্যে লন্ডনের তুলনায় অনেক কম ব্যয় হতো। তা ছাড়া, চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ ছিলো ইংল্যান্ডের তুলনায় অনেক বেশি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গদেশে বিলেত থেকে যে-ডাক্তাররা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্কটিস ডাক্তারদের সংখ্যা ইংলিশ ডাক্তারদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলো। একটা দৃষ্টান্ত থেকে এটা বোঝা যাবে — ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত যাঁরা মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন, তাঁদের মধ্যে স্কটিশ ডাক্তার ছিলেন ৫৪১জন, ইংলিশ ডাক্তার ৩৫৬জন। পরে অবশ্য ইংলিশ ডাক্তারদের সংখ্যা স্কটিশদের ছাড়িয়ে যায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজেও স্কটিশ অধ্যাপকের সংখ্যা ইংলিশদের তুলনায় বেশি ছিলো। সেই সূত্রে কলকাতা থেকে বেশির ভাগই যেতেন স্কটল্যান্ডে। ফকিরচন্দ্র ঘোষ, কালীপদ গুপ্ত, কৃষ্ণধন ঘোষ, গোপালচন্দ্র রায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদাস বসু, বঙ্কুবিহারী গুপ্ত, রসিকলাল দত্ত, হেমচন্দ্র ব্যানার্জি, সৈয়দ হোসেন — প্রথম দিকের ডাক্তাররা বেশির ভাগই স্কটল্যান্ডের ছাত্র ছিলেন।

যাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন, তেমন আরও দু-একজনের কথা এখানেই উল্লেখ করছি। প্রথমেই ক্ষেত্রমোহন দত্ত। তিনি ১৮৬৫ সালের শেষ দিকে আসেন। তিনি ঐতিহ্যিক হিন্দু পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিভাবে কালাপানির নিষেধ অগ্রাহ্য করে বিলেতে এলেন তিনি, তার কোনো সহজ উত্তর নেই। হতে পারে, ধনীর সন্তান হিশেবে এবং বিদ্যাসাগরের মতো বিখ্যাত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষণা ও উৎসাহ পেয়ে তিনি বিলেতের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, ততোদিনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করা এবং তা অধ্যয়ন করতে দরকার হলে বিলেত যাওয়ার ধারণা মোটামুটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলো। নয়তো, আগেই বলেছি, কালাপানি পাড়ি দিয়ে পারে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব হলেও, জাতের ভরাডুবি হতো মধ্যপথেই। পরের বছরের প্রথম দিকে তিনি কয়েক মাস মাইকেল মধুসূদন দত্তের পরিবারের সঙ্গে বাস করেন। মাইকেল লিখেছেন যে, ক্ষেত্রমোহন ডাক্তারি পড়বেন কিনা, তা নিয়ে প্রথম দিকে দোদুল্যমান ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি হয়েছিলেন, সম্ভবত ১৮৬৭ সালে।

মনে হয়, ডাক্তারি শাস্ত্র তিনি ভালো করেই অধ্যয়ন করেছিলেন। *Pathology of Fever* নামে তাঁর অন্তত একটি চটি বই প্রকাশিত হয়েছিলো। তিনি উত্তর লন্ডনের যে-বাড়িতে টাকাপয়সা দিয়ে অতিথি হিশেবে থাকতেন, সে বাড়ির কন্যা ২০ বছর বয়সী এলেন অ্যান জে-কে ১৮৬৬ সালের জুন মাসের শেষে বিয়ে করে তিনি স্থায়ীভাবে এ দেশেই থেকে যান। বিয়ের সময় এলেন কেরানির চাকরি করতেন। তখন ক্ষেত্রমোহনের বয়স ছিলো ২৬ বছর।

আর-একটি বিশিষ্ট ডাক্তারের নাম কৃষ্ণধন ঘোষ। কেশব সেনের সঙ্গে ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যে-চারজন তরুণ লেখাপড়া শেখার জন্যে বিলেত যাত্রা করেছিলেন, ইনিও ছিলেন সেই দলে। তিনি দেশে থাকতেই ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। কিন্তু এমডি ডিগ্রি করতে গিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডিগ্রি ছাড়াও বিলেত থেকে তিনি আর-একটা জিনিশ প্রচুর পরিমাণে নিয়ে গিয়েছিলেন: সে হলো সাহেবিয়ানা। পোশাকে-আশাকে, খানাপিনায়, চলাফেরায় তিনি ছিলেন কালো সাহেব। এমন কি, তাঁর স্ত্রীকেও পাড়াপ্রতিবেশীরা বলতেন পাগলী মেম। দেশে ফিরে কৃষ্ণধন প্রধানত রংপুর এবং খুলনায় কাজ করেন। প্রথমে তিনি ছিলেন সহকারী স্যার্জন। ১৮৮৪-৮৫ সালেও তিনি খুলনায় এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮৬ সালের দিকে তিনি সেখানকার সিভিল স্যার্জন হন। জনহিতৈষী হিশেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিলো। আজও খুলনায় তাঁর নামে সড়ক আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নিজে ব্রাহ্ম না-হলেও তিনি ছিলেন ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর জামাতা। নামে ব্রাহ্ম অথবা হিন্দু – যাই হন না কেন, ধর্মের প্রতি তাঁর নিজের বিশেষ ভক্তি ছিলো না। সে কারণে হিন্দু সমাজের লোকাচার অমান্য করে কালাপানি পার হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো সহজেই। পরে আমরা দেখতে পাবো, তাঁর পুত্ররাও বিখ্যাত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণধনের সঙ্গে আরও একজন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলেন – গোপালচন্দ্র রায়। তিনি ভর্তি হন গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম ভারতীয় ছাত্র (১৮৭০)। সেখান থেকে তিনি অনেকগুলো ডিগ্রি করেন – এমআরসিএস (১৮৭০), এফআরসিএস (১৮৭০) এবং এমডি (১৮৭১)। তাঁর আগে কোনো বাঙালি রয়েল কলেজ অব স্যার্জন্সের ফেলো হতে পারেননি।

প্রায় এক দশক পরে রবীন্দ্রনাথের ছোটো ভগ্নীপতি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও গিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডে। দেবেন্দ্রনাথের খরচে লেখাপড়া শিখে তিনি ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন। এমবি ডিগ্রি তিনি পেয়েছিলেন অ্যাবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ১৮৮০ সালের সম্ভবত মার্চ-এপ্রিল মাসে। তাঁর পাশ করার খবর *জার্নাল অব ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে*র জুন মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি এর পরই তাঁর অধ্যয়ন শেষ করেননি। আরও দু বছর পরে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এমডি ডিগ্রি লাভ করে ইউরোপ ঘুরে কলকাতায় ফিরে আসেন, ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে। স্কটল্যান্ডে পড়তে যাওয়ার প্রবণতা পরে আরও বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্র বসু যখন এডিনবরায় যান, তখন সেখানে বেশ কয়েকজন বাঙালি ছাত্র দেখেছিলেন। এঁদের একজনের সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিলো। স্কটল্যান্ডে পড়া যে

কেবল কম খরচের ব্যাপার ছিলো, তাই নয়, সেখানকার লোকেরা ইংলিশদের তুলনায় বেশি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিলেন বলে অনেকেই মন্তব্য করেছেন।

আর-একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রের কথা না-বললে বিলেতযাত্রীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তির কথা বলা হয় না। এঁর নাম উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। তিনি ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের সন্তান। রমেশচন্দ্র দত্তদের জ্ঞাতি। কিন্তু এঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। তিনি নিজে অবশ্য খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। সেই সুবাদে ১৮৭৬ সালে গিলক্রিস্ট বৃত্তি পেয়ে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শেখার সুযোগ পান। সেখানেও ছাত্র হিশেবে তিনি বিশেষ মেধার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রথম দিকের ছাত্র দ্বারকানাথ বসু, ভোলানাথ বসু, গোপাল শীল, সূর্যকুমার এবং রাজেন্দ্র চন্দ্রের মতো তিনিও বেশ কয়েকটি পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু পাশ করার পর তিনি যখন বিলেতেই চাকরি করতে চেষ্টা করেন, তখন বিভিন্ন জায়গা থেকেই প্রত্যাখ্যাত হন। বর্ণবিদ্বেষই এর একমাত্র কারণ। শেষ পর্যন্ত লন্ডন থেকে এক শো মাইল দূরে মফস্বলে — লেস্টারে — একটি চাকরি জোটান তিনি। সেখানে সামান্য কিছু উপার্জন করে কেমব্রিজের শ্রমিক শ্রেণীর একটি এলাকায় তিনি চিকিৎসা করতে আরম্ভ করেন। খুব সামান্য ফী নিতেন বলে তাঁকে বলা হতো ৬ পেনির ডাক্তার। তাঁর বদান্যতার জন্যে সেখানে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষরা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমনি সমাজের ওপর তলার লোকেদের কাছ থেকে তিনি বিরোধিতার মুখোমুখি হন।

১৮৯০ সালের প্রথম দিকে প্রচণ্ড বর্ণবিদ্বেষের মুখেই উপেন্দ্রকৃষ্ণ বিয়ে করেন সুইডিশ লেখিকা অ্যান পামকে। এঁদেরই প্রথম সন্তান ক্লেমেন্স, জন্ম ১৮৯৩ সালের মাঝামাঝি; আর দ্বিতীয় সন্তান রজনী পাম দত্ত। তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৬ সালে। রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং কার্যকলাপের জন্যে রজনী পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ব্রিটেনে তিনিই কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণও রাজনীতি সচেতন ছিলেন। কেমব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের প্রথম সংগঠন 'মজলিশ' গড়ে উঠেছিলো তাঁরই বাড়িকে কেন্দ্র করে। ভারতের জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বাড়িতেই জড়ো হয়ে দেশোদ্ধার করতেন।

প্রথম দিকে যাঁরা বিলেতে গিয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে আর-একটা কথা বলা উচিত — তাঁরা সবাই ছিলেন মেধাবী ছাত্র। এবং তাঁদের কেউ কেউ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোনো না কোনো দিক নিয়ে মৌলিক চিন্তা করেছিলেন এবং তাঁদের গবেষণা দিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, রাজনীতি এবং সমাজ-সেবায়ও অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন।

সওয়া শো বছর পরে এখনও ব্রিটেনই হলো বাঙালি চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রদের প্রধান

লক্ষ্য। এখনো এখানেই তাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্যে আসেন। আমরা ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিক পর্যন্ত যাঁরা বিলেত থেকে ডাক্তার হয়েছিলেন, নিচে তাঁদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিচ্ছি। এ থেকে দেখা যায়, যাঁরা চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে গিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা সেই আদি পর্বেও একেবারে কম ছিলো না। তা ছাড়া, কারা পড়তে গিয়েছিলেন, তারও একটা ধারণা করা যায় এ তালিকা থেকে।

নাম	কোথায় লেখাপড়া করেন	ডিগ্রি ও বছর
দ্বারকানাথ বসু	লন্ডন	এমআরসিএস, ১৮৪৬
ভোলানাথ বসু	ঐ	এমআরসিএস, এমডি ৪৭
গোপাল শীল	ঐ	এমআরসিএস, এমডি ৪৭
সূর্য গুডিব চক্রবর্তী	ঐ	এমআরসিএস, এমবি, এমডি ৪৭-৪৯
রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র	ঐ	এমআরসিএস (৫৭)
বসন্তকুমার বসু	ঐ	এমআরসিপি (৬৬)
উমেশচন্দ্র দত্ত	এডিনবরা	এলআরসিপিএস (৬৬)
ক্ষেত্রমোহন দত্ত	লন্ডন	এমডি (৬৭?)
কালীপদ গুপ্ত	এডিনবরা, কেমব্রিজ	এলআরসিপিএস (৬৮), এফআরসিএস (৭৯), এসএসসি (৮৪)
ফকিরচন্দ্র ঘোষ	এডিনবরা	এলআরসিএসপি (৬৮)
গোপালচন্দ্র রায়	গ্ল্যাসগো	এমআরসিএস, এফআরসিএস, এমডি
কৃষ্ণধন ঘোষ	এডিনবরা	এমডি
রসিকলাল দত্ত	অ্যাবারডিন	এমআরসিএস (৭১), এমডি (৭২)
জালনুর আলি আহমদ	গ্ল্যাসগো, লন্ডন	এলআরসিপি, এলএফপিএসজি (৭২)
বঙ্কুবিহারী গুপ্ত	এডিনবরা	এলআরসিপি, এলএফপিএসজি, (৭২)
ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গ্ল্যাসগো	এমবিসিএম (৭৫)
ধর্মদাস বসু	এডিনবরা	এলআরসিপি, এলএফডিএসসি (৭৬)
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এডিনবরা, গ্ল্যাসগো	এলআরসিপি,এলএফপিসিজি ৭৮
সৈয়দ হোসেন	লন্ডন	এলআরসিপি (৭৯)
অমৃতলাল রায়	এডিনবরা	১৮৮২

দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে শিক্ষার্থীরা যেতে আরম্ভ করেন ১৮৬০-এর দশকের মধ্য ভাগ থেকে। হয়তো সরকারী বৃত্তির প্রবর্তন এর একটা কারণ। তা ছাড়া, শিক্ষার্থীরা বেশির ভাগই ছিলেন বৈদ্য অথবা কায়স্থ। দুজন মুসলমানের নাম দেখা যাচ্ছে, তাঁরা বাঙালি ছিলেন কিনা বলা মুশকিল। অন্তত প্রথমজনের নাম থেকে তাঁকে বাঙালি বলে মনে হয় না। এই ডাক্তারদের মধ্যে কালীপদ গুপ্তকে একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। কারণ, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৬৬ সালে এমএ এবং ১৮৬৮ সালে এমবি করে ঐ বছরই এডিনবরা থেকে এলআরসিপিএস

করেন। তার এগারো বছর পরে আবার এডিনবরায় ফিরে গিয়ে এফআরসিএস করেন। আগেই বলেছি, বাঙালিদের মধ্যে তিনি প্রথম এফআরসিএস। এতেও সন্তুষ্ট হননি তিনি। তাই আরও পাঁচ বছর পরে তিনি কেমব্রিজ থেকে স্যানিটারি সায়েন্সে এসএসসি করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর-সহ সেকালের বিলেতফেরত বাঙালিদের অনেকেই একবার বিলেতের স্বাদ পাওয়ার পর আবার বিলেতে ফিরে গেছেন, কিন্তু কেউই অধ্যয়নের জন্যে তিন-তিনবার যাননি।

কয়েক বছর বাদ দিয়ে সব শেষে অমৃতলাল রায়ের কথা উল্লেখ করেছি এ জন্যে যে, তিনি ১৮৮২ সালে এডিনবরায় ডিগ্রি নিয়ে ঐ বছরের নভেম্বর মাসে হল্যান্ড হয়ে অ্যামেরিকার পথে যাত্রা করেন। অ্যামেরিকায় তিনি তিন বছর বাস করেন। তাঁর *রেমিনিসেন্স ইংলিশ অ্যান্ড অ্যামেরিকা* (১৮৮৯) গ্রন্থের দু খণ্ডে তিনি যথাক্রমে তাঁর অ্যামেরিকা এবং বিলেত বাসের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। চমৎকার ইংরেজি লিখতেন তিনি এবং দেশে ফিরে একাধিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। বলিষ্ঠভাবে সরকারের সমালোচনা করায় দেশীয় পত্রপত্রিকায়ও তাঁর সমালোচনা করা হতো।

১৮৮০ সালের পর থেকে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে কেবল বাঙালি নয়, ভারতীয়দের সংখ্যা খুবই কমে যায়। এ সময়কার বিরল বাঙালি ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছিলেন লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিনহার ভাই কর্নেল আই পি সিনহা। তিনি আইএমএস হয়ে শেষ পর্যন্ত কর্নেল হয়েছিলেন। তিনি পাশ করেন ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে। এর পরে বিলেতে চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার জন্যে যাঁরা যান, হতে পারে, তাঁরা সরকারী বৃত্তি পেয়ে যাননি, গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত ব্যয়ে। এবং দেশে ফিরে এসেও সরকারী চাকরি না-করে প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করেছেন।

সরকারী চাকরি করতেন না, অথবা চাকরি পাননি — বিলেতে শিক্ষিত এ রকমের একাধিক ডাক্তারের সন্ধান পাওয়া যায় ১৮৭০-এর দশকে। একজন আনন্দমোহন বসুর ছোটো ভাই — মনোমোহন বসু। ইনি স্কটল্যান্ড থেকে এমডি এবং এলআরসিএস উপাধি পান। খুব সম্ভব ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। ঐ দশকের আর-একজন ডাক্তার হলেন ডি এন বোস। তিনিও ছিলেন এমডি, এমআরসিএস। এ রকমের আর একজন ডাক্তার যিনি সরকারী চাকরি করেননি, তিনি হলেন কে জি সরকার। তিনি এমবি পাশ করে এলআরসিপি হয়েছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে ১৮৮২ সালে আর-একজন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে লন্ডনে গিয়েছিলেন, তিনি অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের ছোটো ভাই দ্বারকানাথ রায়। তিনি বিলেতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হয়েছিলেন।

আরও একজন ডাক্তারের কথা জানতে পেরেছি, যিনি বিলেতে পাশ করে ক্ষেত্রমোহন

দত্ত এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের মতো বিলেতেই থেকে যান — তার নাম অরুণচন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন তরু এবং অরু দত্তের খুড়তুত ভাই। কেমব্রিজে লেখাপড়া শিখে ডাক্তার হন। তিনি বিয়ে করেছিলেন এক আইরিশ মহিলাকে।

আইন অধ্যয়ন

১৮৫৯ সাল থেকে যাঁরা বিলেতে লেখাপড়া করতে যান, তাঁরা যান প্রধানত আইন অধ্যয়ন করার জন্যে। কেউ কেউ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশেও গিয়েছিলেন। কেউ কেউ গিয়েছেন উভয় উদ্দেশে। এই ছাত্রদের মধ্যে সবার আগে নাম উল্লেখ করতে হয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের। মজার ব্যাপার হলো, তিনিও ছিলেন আধা-ডাক্তার। ১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি ডাক্তার হওয়ার জন্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ভর্তি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করেননি। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু এবং আত্মপরিচয়ের সংকট এর একটা কারণ হতে পারে। শেষে ১৮৫৯ সালে স্ত্রী কমলমণি এবং দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিলেত গিয়েছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে নয়, বরং নিজের চিকিৎসা করানোর উদ্দেশে। তবে একবার সেখানে যাওয়ার পর শুধু নিজের চিকিৎসাই করাননি; তিনি সেখানে আইনও অধ্যয়ন করেন। আইনের প্রতি তাঁর একটা সহজাত অনুরাগ ছিলো। তাঁর পিতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছিলেন সেকালের কলকাতার সবচেয়ে নামকরা উকিল। সুতরাং আইনের চর্চা তিনি বাল্যবয়স থেকে নিজের বাড়িতেই দেখেছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তাঁদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব না-থাকলেও, কতোগুলো ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে ছিলো আশ্চর্য মিল। প্রসন্নকুমারের মতো বিখ্যাত উকিল অথবা ধনী ছিলেন না মধুর পিতা — রাজনারায়ণ দত্ত, কিন্তু তিনিও উকিল ছিলেন। বাল্যকাল থেকে মধুও বাড়িতে আইনের চর্চা লক্ষ্য করেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র এবং মধু — দুজনই ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র। তাঁরা দুজনই ভালো ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষার মাপে বিচার করলে জ্ঞানেন্দ্রমোহনই মধুর চেয়ে বেশি মেধাবী ছিলেন। দুজনই শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার হয়েছিলেন এবং ব্যারিস্টার হিশেবে দুজনের কেউই বিশেষ সফল হতে পারেননি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং মাইকেলের মধ্যে আর-একটি ছোট্টো কাকতালীয় যোগাযোগ হলো এই যে, যেদিন মধু ব্যারিস্টার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বিলেতের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন, তার দুদিন পরেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। তবে মধু অথবা কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজের এ কথা জানা ছিলো না। তাঁদের ধারণা ছিলো মধুই প্রথম বাঙালি যিনি ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে বিলেত যাচ্ছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিঙ্কন্স ইনে ভর্তি হয়েছিলেন এবং ১৮৬২ সালের ১১ই জুন তারিখে ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন। কেবল বাঙালিদের মধ্যেই তিনি প্রথম ব্যারিস্টার নন, অনেকে বলেন, গোটা এশিয়ার মধ্যেই। ওদিকে, তাঁর স্ত্রী কমলমণির সঙ্গে আইনের কোনো যোগাযোগ ছিলো না, কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রসঙ্গে কমলমণির কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় এই জন্যে যে, শিক্ষিত বাঙালি নারীদের মধ্যে তিনিই সবার আগে বিলেতে গিয়েছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং মধুর মধ্যে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ছিলো — দুজনই ইংরেজিয়ানা দিয়ে প্রভাবিত হয়ে খৃস্টান হয়েছিলেন। ধর্ম হিশেবে খৃস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বেও দুজন বিশ্বাসী ছিলেন। মাইকেলের *The Anglo-Saxon and the Hindu* বক্তৃতায় এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনের *Thoughts by a Christian Brahmin on the Position and Prospects of Religion in India* পুস্তিকায় খৃস্টধর্মের প্রতি তাঁদের মনোভাব প্রকাশ পায়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই পুস্তিকার উৎসর্গে দেশীয় খৃস্টানদের সম্বোধন করে লিখেছিলেন:

> ... I have faith in the religion you have adopted, as the strong foundation upon which India will rear the fabric of her future glory.

সে যাই হোক, খৃস্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে মধুকে তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ত্যাজ্য করেননি, কিন্তু কার্যত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। অপর পক্ষে, প্রসন্নকুমার পুত্রকে ত্যাজ্য করেছিলেন এবং নিজের অগাধ সম্পত্তির কানাকড়িও তাঁকে দিয়ে যাননি। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা যায় — পিতা তাঁকে ত্যাজ্য করলেও পিতার প্রতি জ্ঞানেন্দ্রমোহনের ভালোবাসা লোপ পায়নি। এর একটি প্রতীকী প্রমাণ মেলে একটি ঘটনা থেকে। তিনি যখন লন্ডনে ছিলেন সে সময়ে — ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি — তাঁর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। পিতার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি সেই পুত্রের নাম দেন প্রসন্নমোহন ঠাকুর। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, অ্যালবিয়ন ব্যানার্জি নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণ সন্তান, যাঁর জন্ম ইংল্যান্ডে (১৮৭১)। বলা বাহুল্য, তা সঠিক নয় — তার আট বছর আগেই অন্য একটি ব্রাহ্মণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো লন্ডনের মাটিতে।

প্রথম ব্যারিস্টার হওয়া ছাড়াও, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের আর-একটি কৃতিত্ব — তিনি লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে হিন্দু আইন এবং বাংলা ভাষার, সম্ভবত অবৈতনিক, অধ্যাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই পদে থাকার সময়ে (১৮৬০-৬৫) তিনি একাধিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যা পরে মুদ্রিত হয়েছিলো। এসবের মধ্যে ছিলো ধর্ম এবং জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কেও তাঁর পর্যবেক্ষণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তিনি ধর্মীয় যুগে ভাগ করে লিখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম পর্ব হলো বেদের যুগ, দ্বিতীয় পর্ব পৌরাণিক যুগ, তৃতীয় পর্ব বৌদ্ধযুগ, এবং চতুর্থ পর্ব রামমোহনের একেশ্বরবাদিতার যুগ। কিন্তু এ পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করতে পারেননি। তবে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পরে তিনি একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অধ্যাপক হওয়ার পর বহু বছর পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও হিন্দু আইনের এই পদটি বহাল ছিলো। ১৮৬৫ সালের দ্বিতীয় ভাগে তিনি কলকাতায় ফিরে ব্যারিস্টারি করতে শুরু করলে (হাইকোর্টে যোগদানের তারিখ ২৮ নভেম্বর) — ভারতবিদ্যা বিশারদ গোল্ডস্টুকার মাইকেল মধুসূদনকে এই পদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কবি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ দেখিয়ে বলেন যে, তাঁর অনেক অর্থের প্রয়োজন — অবৈতনিক চাকরি তাঁর পোষাবে না। মাইকেল তাই ক্ষেত্রমোহন দত্ত নামে এক ভদ্রলোককে এই পদের জন্যে সুপারিশ করেন। ১৮৬৬ সালে তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁর নাম আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র হিশেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ছিলেন সমাজের উপর তলার সদস্য। তার ওপর, তিনি খৃস্টান হয়েছিলেন ১৮৫১ সালে ১০ই জুলাই। তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের নেতা এবং প্রথম বাঙালি পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর খানেক পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিয়ে করেন কৃষ্ণমোহনের বড়ো মেয়ে কমলমণিকে (১৫ই এপ্রিল)। সুতরাং সমাজের শাসন অমান্য করে তিনি যে একেবারে সপরিবারে বিলেত গেলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। এমন কি, তাঁর আগে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্যে যাঁরা বিলেত গিয়েছিলেন, তাঁরাও ছিলেন হয় খৃস্টান, নয়তো খৃস্টান-প্রভাবিত। অন্যের আর্থিক সহায়তায় এই ছাত্ররা কি করে সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, তার পটভূমিও আমরা জানি।

হিন্দুধর্মের প্রতি আনুগত্য না-থাকলেও সমাজের প্রতি খানিকটা আনুগত্য ছিলো — এমন যিনি আইন পড়ার উদ্দেশ্য নিয়েই বিলেতে যান এবং সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তিনি হলেন রাখালদাস হালদার। কালাপানির নিষেধ তিনি ভঙ্গ করতে পেরেছিলেন দুটো কারণে। প্রথমত, তিনি ১৮৫২ সালে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তখনকার ব্রাহ্মরা কেউ বিস্কিট খেয়ে, কেউ মাংস খেয়ে, কেউ বা মদ্যপান করে — অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান অমান্য করে হিন্দুধর্ম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের মুক্তি ঘোষণা

করতেন। রাখালদাসও ছিলেন সেই দলে। লোকাচার যে তিনি গ্রাহ্য করতেন না, তার প্রমাণ মেলে এই ঘটনা থেকে যে, তিনি জাতিভেদ না-মানার এবং পৈতা ত্যাগ করার জন্যে ব্রাহ্মদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, পুত্রের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণকে তাঁর পিতা সমর্থন করতে না-পারলেও, শিক্ষিত এবং সরকারী চাকুরে হিশেবে তিনি বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। আইন পড়ানোর জন্যে রাখালদাসের পিতাই পুত্রকে খরচ দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন — ১৮৬১ সালের ১১ই এপ্রিল।

২১শে মে ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর এক সপ্তাহের মধ্যে রাখালদাস মেরী কার্পেন্টার এবং কেনসিংটন পার্ক গার্ডেনে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। পরের মাসে অক্সফোর্ডে গিয়ে তিনি দেখা করেছিলেন ভারতবিদ্যাবিশারদ ম্যাক্স মূলারের সঙ্গে। উইলিয়াম অ্যাডামের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

তিনি বিলেতে থাকার সময়ে যে-ডাইরি রাখেন পরে তা *The English Diary of an Indian Student* নামে প্রকাশিত হয়। এই ডাইরি থেকে অনেক আগ্রহব্যঞ্জক তথ্য জানা যায়। যেমন, তিনি বাংলা পড়িয়ে ঘণ্টায় পাঁচ শিলিং পেতেন। (শতাব্দীর শুরুতে যেখানে ফারসি শিখিয়ে মুনশিরা পেতেন এক গিনি অর্থাৎ একুশ শিলিং।) তা ছাড়া, তিনি মাঝেমাঝে ভারতবর্ষ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় লিখতেন এবং তার জন্যে কলাম প্রতি পেতেন এক গিনি। আর কোথাও বক্তৃতা দিলে তার জন্যে পেতেন তিন গিনি এবং সেই সঙ্গে রেলের ভাড়া। এই অর্থকে বর্তমানের মাপে নিতান্তই নগণ্য মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি যখন লন্ডনে বাস করতেন, তখনকার খরচের তুলনায় এই আয়কে খুব ভালো বলেই বিবেচনা করা উচিত। ১৮৬২ সালের মার্চ মাসের ব্যয়ের বিস্তারিত হিশেব তিনি তাঁর ডাইরিতে দিয়েছেন। তিনি থাকতেন মধ্য লন্ডনে, রাসেল স্কোয়ারের কাছেই — ইউনিভার্সিটি হলে। হলের খরচ বাবদে ঐ মাসে তাঁর দিতে হয়েছিলো চার পাউন্ড, এক শিলিং আর আধ পেনি। টুকিটাকি খরচ হয়েছিলো প্রায় তেরো শিলিং। ডাক টিকিটের জন্যে প্রায় ছয় শিলিং। বাসের খরচ সাড়ে সাত শিলিং। বইয়ের জন্যে খরচ পাঁচ শিলিং দেড় পেনি। আর কাপড়চোপড়ের জন্যে এক পাউন্ড। কুল্লে ছ পাউন্ড বারো শিলিং দুই পেন্স।

রাখালদাসের পাঁচ বছর পরের যে-হিশেব মাইকেল মধুসূদন দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে, তাতে তিনি ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়েছিলেন অনেক বেশি। অংশত তার কারণ: তিনি সেখানে সপরিবারে ছিলেন; কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ: তিনি অত্যন্ত বেহিশেবি ছিলেন। সবচেয়ে কম ব্যয়ের কথা লিখেছেন আরও বিশ বছরে পরে — গিরিশচন্দ্র বসু। তিনি লিখেছেন: 'উপযুক্তরূপে সাজানো দুটী ঘর লন্ডনে সপ্তাহে ৯/১০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে। ... খাওয়া ও ঘরের জন্য সপ্তাহে ৩০ শিলিং অর্থাৎ মাসিক ৬০ টাকায় বেশ চলিতে পারে।' তিনি আরও লিখেছেন যে, বছরে

১০০০ টাকা দিয়ে সেখানে টিকে থাকা সম্ভব। সে যাই হোক, রাখালদাস ইংল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডের কোন কোন জায়গায় ঘুরেছিলেন — তারও খবর দিয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি ব্রিস্টলেও গিয়েছিলেন রামমোহন রায়ের কবর দেখতে।

১৮৬২ সালের জুন মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর জুলাই মাসে বিলেত থেকে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি। বিলেত ত্যাগ করার আগে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার দেখা হয়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মনোমোহন ঘোষের। ব্রাহ্মসমাজের সূত্রে তিনি এঁদের আগে থেকেই চিনতেন। তাঁদের কাছ থেকে দোসরা মে একটা টেলিগ্রাম পেয়ে জানতে পান যে, তাঁরা আসছেন। চৌঠা মে তাঁরা লন্ডনে পৌঁছান এবং রাখালদাস তাঁদের স্বাগত জানান। তারপরও এই দুই তরুণের সঙ্গে একাধিকবার তাঁর দেখা হয়। চৌঠা জুলাই লন্ডন ত্যাগ করে রাখালদাস কলকাতায় এসে পৌঁছেন ৯ই অগস্ট তারিখে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি জুরিসপ্রুডেন্সে যে-ডিগ্রি করেছিলেন, তার জোরে ইচ্ছে করলে তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসা করতে পারতেন। কিন্তু তার বদলে তিনি সরকারী চাকরি নেন। অক্টোবর মাসে তিনি বর্ধমানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে চাকরিতে উন্নতি করে ১৮৭৫ সাল নাগাদ এক্সট্রা অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার হন।



চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যা-ই হোক, দেশে ফিরে আসার পর তাঁর ওপর সবচেয়ে বড়ো আঘাত আসে একঘরে হওয়ার। এমন কি, পৈতৃক বাড়ির দরজাও বন্ধ হয় তাঁর জন্যে। আমরা লক্ষ্য করেছি, তাঁর বিলেত যাওয়ার খরচ দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। তা হলে দেশে ফেরার পর পরিবার থেকে তাঁকে গ্রহণ করা হলো না কেন, সেটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। আমার ধারণা, রাখালদাস বিলেত যাওয়ার পর সমাজের তরফ থেকে তাঁর পিতামাতার ওপর চাপ এসেছিলো। সে যাই হোক, নিজের পরিবারের কাছ

থেকেই তিনি প্রত্যাখ্যাত হননি, শ্বশুর পরিবার থেকেও তিনি গৃহীত হননি। তাই অগত্যা তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে কলকাতায় আনিয়ে নেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, তখন বিলেত গেলে জাত যেতো কেবল কালাপানি পার হওয়ার জন্যেই নয়, তার পেছনে আর-একটা বড়ো কারণ ছিলো বিদেশে নিষিদ্ধ খাবার এবং পানীয় গ্রহণ। রাখালদাস হালদার লিখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা লন্ডনে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম মুদালিয়ার নামে এক ভদ্রলোক খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জাত বজায় রাখার 'ভান' করতেন। যে-যুগের কথা বলছি, সেকালে বিলেতে ভাত আর মাছের ঝোল জুটতো না। আবার, সাধারণ লোকেদের পক্ষে ইতেশাম উদ্দীন, আবু তালিব, রামমোহন অথবা দ্বারকানাথের মতো নিজেদের রাঁধুনী নিয়েও যাওয়ার উপায় ছিলো না। সুতরাং ইংরেজদের বাড়িতে অতিথি হয়ে তাঁদের খাদ্য — ঠাণ্ডা গোরুর মাংস আর শুয়োরের মাংসই খেতে হতো রোজ রোজ। মনোমোহন ঘোষও একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, শুয়োর আর গোরুর মাংস খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। কবে দেশে গিয়ে ভাত আর মাছের ঝোল খাবেন, তার জন্যে দিন গুনছেন। মনোমোহনের বিশ-একুশ বছর পরে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু। তিনিও দেশী খাবারের জন্যে হাপিত্যেশ করেছিলেন।



মনোমোহন ঘোষ

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনা থেকেও আভাস পাওয়া যায়, বিলেতফেরতরা কি ধরনের নিষিদ্ধ খাদ্যের জন্যে একঘরে হতেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো নিষিদ্ধ খাদ্যের জন্যে একঘরে হতে হতো — এ কথা বললেও তিনি কোনো পানীয়ের কথা বলেননি। মনে হয়, হিন্দু সমাজের একটা অংশে — শাক্তদের মধ্যে — যেহেতু মদ্যপান প্রচলিত ছিলো, সে কারণে মদ্যপানের প্রতি সমাজের মনোভাব অতো প্রতিকূল ছিলো না। তা ছাড়া, কলকাতাতেই ইংরেজি শিক্ষিতরা প্রচুর মদ্যপান করতেন। ওটা সমাজের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো। আমরা পরে বিলেতফেরত ব্যক্তিদের একঘরে হওয়ার প্রসঙ্গে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখতে পাবো।

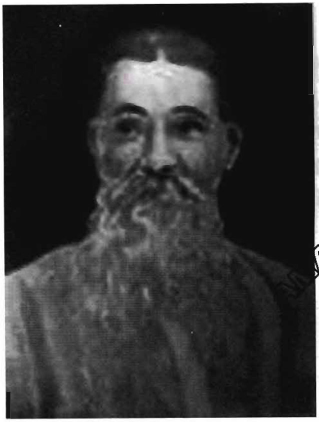
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আর রাখালদাস হালদারের পরে অন্য যাঁরা আইন পড়ার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের। কারণ, তিনিই ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি এবং তিনি গিয়েওছিলেন এ দুজন ছাড়া অন্য সবার আগে। তিনি বিলেতের উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করেন ১৮৬২ সালের জুন মাসে, যে-মাসে রাখালদাস আইনের ডিগ্রি লাভ করেন আর জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যারিস্টার হন। কিন্তু সত্যি সত্যি বিলেতে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই তাঁর মধ্যে বিলেত গমনের তীব্র বাসনা বাসা বেঁধেছিলো – আমরা আগেই তা উল্লেখ করেছি। তাঁর এই স্বপ্নের কথা তিনি ১৮৪১ সালে এক কবিতায় লিখেছিলেন। তা ছাড়া, কথাটা গোপন রাখার অঙ্গীকার আদায় করে তারপর বলেছিলেন বন্ধু গৌরদাসকে। অবশ্য তখন তিনি আইন অধ্যয়নের কথা কল্পনাও করেননি। তিনি যেতে চেয়েছিলেন কবি হওয়ার জন্যে। তাঁর বিশ্বাস ছিলো একবার বিলেত যেতে পারলেই তিনি বড়ো কবি হতে পারবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৬২ সালে তিনি যখন বিলেত গেলেন, তখন আর কবি হওয়ার জন্যে নয়, গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে। (যাওয়ার আগে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে গর্ব করে লিখেছিলেন, আর কবি মধুসূদন নয়, এবারে মাইকেল এম এস ডাট, এস্কোয়ার, বার-এট-ল, ইনার টেম্পলস। হা! হা! হা!) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতও তাঁর বিলেত যাওয়ার বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তার কারণ মাইকেল যখন যান, তখন কলকাতায় প্রায় অর্ধশত ব্যারিস্টার থাকলেও একজনও বাঙালি ব্যারিস্টার ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের মতো স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা তাই বাঙালিদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টার দেখতে চেয়েছিলেন।


মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল উচ্চাভিলাষ নিয়ে বিলেত গেলেও তাঁর বিলেত-বাস খুব সুখের হয়নি। দেশ থেকে নিয়মিত টাকাপয়সা না-পাওয়ায় তাঁকে ১৮৬৩ সালে সপরিবারে লন্ডন ত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে যেতে হয়। ভার্সাই নগরীতে তাঁরা দু বছরেরও বেশি সময় বাস করেছিলেন। তাঁর আগে কোনো কোনো বাঙালি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে ভ্রমণ

করতে গেলেও কেউ এতোদিন বাস করেছেন বলে জানা যায় না। বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে টাকাপয়সা পেয়ে ১৮৬৫ সালের অগস্ট মাসের দিকে ব্যারিস্টারি পড়া শেষ করার উদ্দেশে তিনি বিলেতে ফিরে যান এবং ৬৭ সালের গোড়ায় দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু দেশে ফেরার সময়ে তিনি তাঁর দু সন্তান এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে ভার্সাইতে রেখে আসেন।

মাইকেলের পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে লন্ডনে যান উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জন্মেছিলেন কলকাতার শহরতলী খিদিরপুরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা অ্যাটর্নি হলেও তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না। ভালো ছাত্র হিশেবে তিনি রুস্তামজী জামশেদজী জিজিভাই বৃত্তি লাভ করেন বলেই তাঁর পক্ষে বিলেত যাওয়া সম্ভব হয়। তবে তাঁর পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়রা তাঁর বিলেত যাওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি লুকিয়ে তাঁর পিতার বন্ধু ককেরেল স্মিথের সঙ্গে দেখা করেন। এবং মি. স্মিথই তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তারপর ১৮৬৪ সালের গরমের সময় তিনি কাউকে কিছু না-জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে ওঠেন। বিলেতে পৌঁছে তবে তিনি তাঁর পিতাকে চিঠি লেখেন। তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী তখন ছিলেন তাঁর পিতার বাড়িতে। তিনি যে তাঁর স্বামীকে আটকে রাখতে পারেননি, সে জন্যে আত্মীয়রা তাঁকেই দোষারোপ করেন।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলেতে যাওয়ার পরেই উমেশচন্দ্র আইন পড়ার জন্যে মিডল টেম্পলে ভর্তি হন। তিন বছর পরে ৬৭ সালের এগারোই জুন তারিখে তিনি উত্তীর্ণ হন ব্যারিস্টার হিশেবে। কিন্তু কলকাতায় ফিরে হাইকোর্টে যোগদান করেন পরের বছর নভেম্বর মাসের শেষে। এই দেড় বছর তিনি বিলেতে কী করেন, আমার তা জানা নেই। তবে তাঁর বিলেত-প্রীতি ছিলো অসাধারণ। একই সঙ্গে তিনি আবার ছিলেন খুব দেশপ্রেমিক। আর, রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিলো গোড়া থেকেই। লন্ডনে থাকার সময়ে ১৮৬৫ সালে তিনি দাদাভাই নওরোজিকে নিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠন করেন এবং তার সম্পাদক হন। প্রায় দু দশক পরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন তিনি।

তারকনাথ পালিত বয়সে ছিলেন উমেশচন্দ্রের চেয়ে বড়ো। আর টাকাপয়সার দিক

দিয়ে তাঁদের তুলনাই চলে না। তাঁর পিতা ছিলেন রীতিমতো ধনী। কিন্তু তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে যান উমেশচন্দ্রের বছর তিনেক পরে। ১৮৭০ সালের জুন মাসে তিনি ব্যারিস্টার হন। ব্যারিস্টার হওয়ার পরেও সম্ভবত কিছু কাল তিনি লন্ডনেই বাস করেন। পরের বছর কলকাতায় ফিরে এসে নভেম্বর মাসে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি চেম্বার খোলেন যেখানে মাইকেল আইন ব্যবসা করতেন, সেই ঠিকানায়। তারকনাথের পাশ্চাত্য-প্রীতি ছিলো উমেশচন্দ্রের মতোই অসাধারণ। দুজনই সম্ভবত সে কারণে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সহজে দেশে ফেরেননি। এবং পরে আবার বিলেতের মায়ায় একাধিকবার সে দেশে গেছেন। উমেশচন্দ্রের পর এবং তারকনাথের আগে একজন ব্যারিস্টারের নাম পাচ্ছি — সৈয়দ আহমদ আলি। ইনি কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস করার জন্যে অনুমোদন নিয়েছিলেন, কিন্তু বাঙালি ছিলেন কিনা, বলতে পারছিনে। ধরে নিচ্ছি ছিলেন না। তারকনাথ পালিতের পর যে-দুজন বাঙালি ব্যারিস্টার হন, তাঁরা হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। কিন্তু তাঁরা কেউই আইন ব্যবসা করেননি। সেদিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী। আইন ব্যবসা না-করার কারণ, তাঁরা দুজনই আইসিএস কর্মকর্তা হয়েছিলেন। আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যেই তাঁরা বিলেতে গিয়েছিলেন; কিন্তু সিভিলিয়ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিস্টারিও পাশ করেন। এঁরা ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন ১৮৭১ সালের জুন মাসে। এঁদের প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করবো।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বিহারীলাল গুপ্ত পর্যন্ত যাঁরা ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং মাইকেল ছিলেন খৃস্টান। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ছিলেন খৃস্টান-প্রভাবিত। আর মনোমোহন ঘোষ ছিলেন ব্রাহ্ম। সৈয়দ আহমদ আলি মুসলমান, তা তাঁর নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে তারকনাথ প্রথম সত্যিকারের হিন্দু ব্যারিস্টার। রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলাল ব্যারিস্টারি পাশ করে এই হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। ওদিকে, লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে কেউই ততোদিনে ব্যারিস্টার হননি। এমন কি, ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার মতো আকাঙ্ক্ষা এবং সঙ্গতিও তাঁদের কারো মধ্যে ছিলো কিনা, সন্দেহ হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সৈয়দ আমীর আলি ছিলেন রীতিমতো ব্যতিক্রম। যদিও হাওড়াবাসী হলেও তিনি আদৌ বাঙালি ছিলেন কিনা, সে প্রশ্ন অবশ্য উঠতেই পারে। এক কথায় এর উত্তর হলো: ছিলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি বেশির ভাগ অভিজাত মুসলমানদের মতো কেবল উর্দুভাষীও ছিলেন না। তাঁর আত্মজীবনী থেকে মনে হয়, তিনি বাংলা ভালোই জানতেন, যদিও তাঁর মাতৃভাষা ছিলো উর্দু।

সৈয়দ আমীর আলি সরকারী বৃত্তি লাভ করে ব্যারিস্টারি পড়তে যান ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। সঙ্গী এবং ভৃত্য নিয়ে রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত

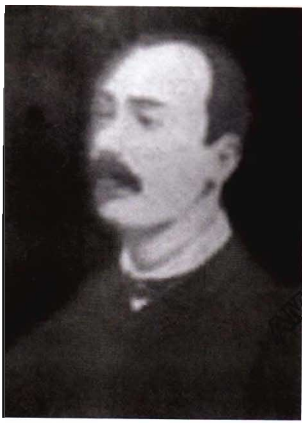
গিয়েছিলেন। নয়তো তাঁদের পরে অন্য যাঁদের কথা লিখেছি, তাঁরা কেউই ভৃত্য নিয়ে যেতে পারেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন আমীর আলি। তিনি অবশ্য লিখেছেন যে, জাহাজে ওঠার পর অচিরেই তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ভৃত্য না-থাকলেই ভালো হতো, তবু সেই ভৃত্য শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে লন্ডন পর্যন্ত গিয়েছিলেন — পথে একবার হারিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও।


সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলি এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। দেশীয়দের বদলে তিনি ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতেন — বিশেষ করে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সাহেবদের সঙ্গে। তাঁর মতো ইংরেজি সাহিত্য এবং ইতিহাসে আগ্রহী ছাত্র সেকালে আরও ছিলেন। কিন্তু অধ্যয়নের সূত্র ধরে ইংরেজ বড়ো কর্তাদের সঙ্গে অমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অন্য কোনো বাঙালি অথবা বঙ্গবাসীর হয়নি।

আমীর আলি বিলেতে যাওয়ার আগে ছোটো লাটের কাছে একটি পরিচিতিমূলক পত্র দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ছোটোলাট তাতে রাজি হননি। এর ফলে আমীর আলির ক্ষতি না-হয়ে, সম্ভবত লাভই হয়েছিলো। কারণ, তাঁর প্রশংসা করে পরিচিতিমূলক পত্র দিয়েছিলেন বড়ো লাট, লর্ড মেয়ো। তিনি আর. বার্ক, স্যর উইলিয়াম কেই, সাবেক ভাইসরয় লর্ড লরেন্স, ফ্রেডারিক হ্যালিডে, মিস্টার ও মিসেস ফসেট-সহ অনেকের কাছে আমীর আলির জন্যে চিঠি লেখেন। ফলে গোড়া থেকেই তিনি লন্ডনে সমাজের অভিজাত ও উপর তলার লোকেদের সঙ্গে পরিচিত হন। সাধারণ লোকেদের সঙ্গে বলতে গেলে তিনি মেলামেশাই করতেন না। আবু তালিব, রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর ছাড়া অন্য যাঁরা কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন, তাঁরা কেউ আমীর আলির মতো এ রকম অভিজাত সমাজে ওঠা-বসা করার সুযোগ পাননি।

মিস্টার ও মিসেস ফসেটের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে আমীর আলি মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের সঙ্গে ভালো করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। মহিলাদের ভোটাধিকার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ১৮৭০ সালে। সে সভায় আমীর আলি অংশ গ্রহণ করেন। সেন্ট জেমসেস হলে কেশব সেন যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তিনি তাতেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, কেশব সেনের ভাষণে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওদিকে, ১৮৭১ সালে মিস ম্যানিং ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করলে, আমীর আলি তার সঙ্গেও যুক্ত হন। এই সমিতি ভারতীয় এবং ইংরেজদের মধ্যে মিলনসেতুর মতো কাজ করতো।


লালমোহন ঘোষ

আমীর আলি ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাশ করে গিয়েছিলেন। ব্যারিস্টারি পড়ার শর্ত হিশেবে তিনি যে-ব্যারিস্টারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তিনি আইন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান দেখে তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেশ এবং আগ্রহব্যঞ্জক জিনিশগুলো দেখে নিতে। মোট কথা, ব্যারিস্টারির জন্যে তাঁর তেমন লেখাপড়া করতে হয়নি। ১৮৭৩ সালের ২৭শে জানুয়ারি তিনি ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ফ্রান্স এবং জেনোয়া হয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিলেতে যাওয়ার পথেও তিনি ফ্রান্স হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখনই একদিন তাঁর ভৃত্য হারিয়ে যান। পরে অবশ্য তিনি তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

আমীর আলি যেদিন ব্যারিস্টার হন, সেই একই দিনে একই ইন — মিডল টেম্পল — থেকে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনিও আমীর আলির মতো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল পাশ করে বিলেতে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম যুগের ব্যারিস্টার হলেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অথবা সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। কলকাতা হাই কোর্টে তিনি যোগ দিয়েছিলেন পাশ করার পনেরো মাস পরে — ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে।

লালমোহন ঘোষ ছিলেন মনোমোহন ঘোষের ছোটো ভাই। মনোমোহনের দৃষ্টান্ত দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি ব্যারিস্টার হবার জন্যে বিলেত যাত্রা করেন খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে। এর তিন বছর পরে — ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ব্যারিস্টার

হন এবং জুন মাসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। তাঁর আগে যাঁরা ব্যারিস্টার হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মস্ত একটা পার্থক্য হলো এই যে, তিনি ১৮৮৩ সালে বিলেতের পার্লামেন্ট নির্বাচনে লিবারেল দলের হয়ে প্রথম ভারতীয় হিশেবে অংশ গ্রহণ করেন। তাতে তিনি সাফল্য লাভ করেননি, প্রধানত স্থানীয় লোকেদের বর্ণবাদী মনোভাবের কারণে। কিন্তু তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। একদিকে, তিনি যেমন চমৎকার ইংরেজি জানতেন, তেমনি জানতেন বিলেতের রাজনীতি। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ লোকেরা তাঁর টোরি প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুয়ো দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সেকালে তিনি যে রক্ষণশীল দলের বদলে লিবারেল দলে যোগদান করেন, তা থেকেও তাঁর বিশেষ মানসিকতা প্রকাশ পায়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। তিনিও লিবারেল দলের হয়ে পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনিও লালমোহনের মতো নির্বাচনে জয়ী হতে পারেননি।



আনন্দমোহন বসু

লালমোহনের মতো মনোমোহন ঘোষও রাজনীতি-সচেতন ছিলেন এবং তিনিও কয়েকবার বিলেতে গিয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে তিনি গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সঙ্গে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে ভারতবাসীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ব্রিটেনে আন্দোলন করার জন্যে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। ইলবার্ট বিল, জুরি প্রথার বিচার পদ্ধতি — যখনই যে-আন্দোলন হতো, তাতে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং বহুবারই এসব আন্দোলনে নিজের অবদান রেখেছিলেন।

প্রথম যুগে যাঁরা ব্যারিস্টার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু বিশেষ খ্যাতিবান ছিলেন। রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা হিশেবে পরে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র এবং প্রগতিশীল ভাবনা দিয়ে প্রভাবিত। ছাত্র থাকার সময়েই তিনি নিজের রক্ষণশীল পরিবারের গণ্ডী কাটিয়ে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন কেশব সেনের কাছে। তিনি বিয়ে করেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসুর ভগ্নী স্বর্ণপ্রভাকে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা

নেওয়ার পর থেকে কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁর পৈতৃক পরিবার রক্ষণশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি যে বিলেত যাওয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন, তার কারণ এই যোগাযোগ। আর, তিনি যে বিলেত যেতে পেরেছিলেন, তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করে ১৮৭০ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করে দশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন। কেশব সেন তখন বিলেত যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। আনন্দমোহন এবং অন্য চারজন যুবক কেশব সেনের সঙ্গী হন। তাঁরা কলকাতা থেকে যাত্রা করেন ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পরের মাসে গিয়ে বিলেতে পৌঁছান।



লালমোহনের নির্বাচনী প্রচার

আনন্দমোহন ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ১৮৭৪ সালের তেসরা এপ্রিল। তবে কলকাতা হাইকোর্টে তিনি যোগ দিয়েছিলেন বছরের শেষ দিকে — ১৪ই ডিসেম্বর। মাঝখানের আট মাস তিনি কোথায় ছিলেন, অথবা কী করেন, তা আমার জানা নেই।

প্রথম আট-দশজন ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৮৭০-এর দশকেও আরও বেশি সংখ্যক বাঙালি ছাত্র ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলেত যেতে থাকেন। এর কারণ, বাঙালি ব্যারিস্টাররা কলকাতা হাইকোর্টে ভালো ব্যবসা করছিলেন। তা ছাড়া, এতো সহজে পাশ করার মতো অন্য কোনো পরীক্ষাও বিলেতে ছিলো না। ফলে রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল এবং আমীর আলির পর ১৮৭০-এর দশকে লালমোহন ঘোষ এবং আনন্দমোহন বসু-সহ আরও তিরিশ জনেরও বেশি বাঙালি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন।

বস্তুত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্র ধরে বঙ্গদেশে মামলা-মকদ্দমা খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিলো। এ জন্যে ওকালতিকে সবচেয়ে দ্রুত ধনী হওয়ার একটা পথ বলে বিবেচনা করা হতো। আনন্দমোহন বসুর মতো অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি র‍্যাংলার হয়েও ব্যারিস্টারি করেছিলেন। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় সাড়ে সতেরো শো পরীক্ষার্থী বিএ, এমএ এবং বিএল পাশ করেন। ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এঁদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাড়ে সাত শোরও বেশি অর্থাৎ শতকরা চল্লিশ জনেরও বেশি ওকালতি করতেন অথবা চাকরি করতেন আইন বিভাগে। এ থেকেই বোঝা যায়, আইন ব্যবসা তখন কতো লোককে আকর্ষণ করেছিলো। এ বিষয়ে একটি অসামান্য দৃষ্টান্ত হলো আশুতোষ চৌধুরী এবং তাঁর চার ভাইয়ের। তাঁরা পাঁচ ভাই ব্যারিস্টার হয়েছিলেন।

এ রকমের আর একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত দুর্গামোহন দাসের পরিবারের। তিনি নিজে নামকরা উকিল ছিলেন। আর তাঁর তিন পুত্র সত্যরঞ্জন, সতীশরঞ্জন এবং জ্যোতিষরঞ্জন — তিনজনই ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। সতীশরঞ্জন অ্যাডভোকেট জেনারেলও হয়েছিলেন। দুর্গামোহন দাসের ছোটো ভাই ভুবনমোহন দাস। তাঁর তিন পুত্র ব্যারিস্টার হয়েছিলেন — চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন এবং বসন্তকুমার।

নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে ১৮৭০-এর দশকে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া ছাত্রদের সংখ্যা কিভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যেখানে ১৮৬০-এর দশকে মাত্র আট-নজন এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন, সেখানে পরের দশকে গিয়েছিলেন তার দ্বিগুণেরও বেশি।

প্রথম দিকের ব্যারিস্টারদের তালিকা

নাম	ব্যারিস্টার হওয়ার তারিখ
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর	১১ জুন ১৮৬২
মনোমোহন ঘোষ	৬ জুন ১৮৬৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১৭ নভেম্বর ১৮৬৬
উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি	১১ জুন ১৮৬৭
সৈয়দ আহমদ আলি	২৬ জানুয়ারি ১৮৬৯
তারকনাথ পালিত	১০ জুন ১৮৭০
রমেশচন্দ্র দত্ত	৬ জুন ১৮৭১
বিহারীলাল গুপ্ত	৬ জুন ১৮৭১
রাজনারায়ণ মিত্র	৬ জুন ১৮৭২
সৈয়দ আজগর আলি খান	১১ জানুয়ারি ১৮৭৩
সৈয়দ আমীর আলি	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৩
কৃষ্ণমোহন চ্যাটার্জি	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৩
লালমোহন ঘোষ	৭ জুন ১৮৭৩

চারুচন্দ্র দত্ত	২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪
আর কে সেন	২৪ জানুয়ারি ১৮৭৪
আনন্দমোহন বসু	৩ এপ্রিল ১৮৭৪
ব্রজেন্দ্রনাথ দে	১৮৭৫
প্রমথনাথ মিত্র	২৬ জানুয়ারি ১৮৭৫
মন্মথচন্দ্র মল্লিক	৭ জুন ১৮৭৫
বিপিনবিহারী মুখার্জি	১১ জুন ১৮৭৫
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ	২৮ জুন ১৮৭৬
গিরিশ সেন	২৮ জুন ১৮৭৬
এ সি মিত্র	২৮ জুন ১৮৭৬
আর ঘোষ	১৭ নভেম্বর ৭৬
নন্দলাল দে	১৭ নভেম্বর ৭৬
যোগেন্দ্রনাথ সরকার	১৩ জানুয়ারি ১৮৭৭
এ সি রুদ্র	১৩ জুন ১৮৭৭
ঋষিবর মুখোপাধ্যায়	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৯
এন হালদার	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৯
ডাবলিউ এম দাস	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৯
ডাবলিউ সি ঘোষ	২৭ জানুয়ারি ১৮৭৯
প্যারীলাল রায়	২১ এপ্রিল ১৮৮০
মোহাম্মদ সেরাজুদ্দীন	২১ এপ্রিল ১৮৮০
এ হোসেন	২১ এপ্রিল ১৮৮০
আবদুল হালিম	২১ এপ্রিল ১৮৮০
এ এফ এম আবদুর রহমান	২১ এপ্রিল ১৮৮০
সৈয়দ আবদুর রহমান	৯ জুন ১৮৮০
সৈয়দ মোহাম্মদ শরফুদ্দীন	৯ জুন ১৮৮০
সৈয়দ নূরুল হুদা	৯ জুন ১৮৮০
কে এন মিত্র	১০ জুন ১৮৮০

ব্যারিস্টারের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পাওয়ায়, ১৮৮০ সালের পরে ব্যারিস্টারি পড়া আর ব্যতিক্রম অথবা অসাধারণ বলে গণ্য হয়নি। ব্যারিস্টারদের এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, ব্যারিস্টার হওয়া কেবল আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক ছিলো না; এটা মর্যাদার একটা প্রতীকেও পরিণত হয়। এ কারণে, যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য ছিলো, তাঁরা অনেকেই ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। নয়তো আইন ব্যবসায়ে তাঁদের পরিচিতি ছিলো সামান্যই। যাঁরা সত্যিকার পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তাঁরা অন্য গুণ দিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন, ব্যারিস্টারি পড়ার কারণে নয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট হতে পারে:

আশুতোষ চৌধুরী কলকাতা থেকে এমএ পাশ করে বিলেতে যান ১৮৮১ সালে। তিনি ১৮৮৫ সালে কেমব্রিজ থেকে বিএ পাশ করেন। পরের বছর ১৬ই জানুয়ারি

ব্যারিস্টারি পাশ করেন তিনি। তা ছাড়া, একই বছর তিনি কেমব্রিজ থেকে এমএ এবং এমএল পাশ করেন। কলকাতায় বিচারপতি এবং নামজাদা ব্যারিস্টার হিশেবে খ্যাতি লাভ করা ছাড়াও, সাহিত্যিক হিশেবেও তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তাঁর আর-এক পরিচয়, তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়। সেই সূত্রে *জীবনস্মৃতির* কল্যাণেও বিদ্বজ্জন সমাজে তিনি আজও অমর হয়ে আছেন। তাঁর ছোটো ভাইদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র অক্সফোর্ড থেকে বিএ এবং এমএ পাশ করে তারপর ব্যারিস্টার হয়েছিলেন (২৮শে জানুয়ারি ১৮৯৫)। তিনিও সাহিত্যিক হিশেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ছোটো — কুমুদনাথও বিলেতে এমএ এবং ব্যারিস্টারি পাশ করেন। অন্য এক ভাই — অমিয়নাথও অক্সফোর্ড থেকে বিএ পাশ করে তবে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন (১৯০৪)। এ ছাড়া, প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীও তাঁর ভাই। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সেখান থেকে ১৮৯০ সালে এমএ পাশ করে বিলেতে যান ১৮৯৩ সালের ১৭ অক্টোবর তারিখে এবং ১৮৯৬ সালের ১৭ই জুন ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন। এ রকমের একই পরিবারে পাঁচ ভাই ব্যারিস্টার হওয়া খুবই অসামান্য ঘটনা। কিন্তু ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁরা সবাই সমান সাফল্য লাভ করেননি। সবচেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন প্রমথনাথ। দেশে ফিরে এসে ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ করতে আরম্ভ করলেও তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। বরং বলা ভালো যে, তিনি ব্যারিস্টার হিশেবে ব্যর্থ হন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হন বাংলা গদ্যে চলিত রীতি প্রবর্তন করা এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্যে।



প্রমথ চৌধুরী

প্রমথ চৌধুরীর মতো অতুলপ্রসাদ সেনের নাম এখানে বলতে পারি। তিনি আজও অমর হয়ে আছেন বাংলা গানের ধারায় নতুন একটি শাখা সংযোজন করার জন্যে — ব্যারিস্টার হিশেবে নন। তিনি ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ২৬শে জুন ১৮৯৫ সালে। চিত্তরঞ্জন দাশও অনেকটা তেমনি। তিনি খুবই সফল এবং নামকরা ব্যারিস্টার ছিলেন। কিন্তু বাংলার ইতিহাসে তিনি আজও বেঁচে আছেন খ্যাতিবান রাজনীতিক হিশেবে। ১৮৯৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি তিনি ব্যারিস্টারিতে উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে আসেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ১৮৮৬ সালে। আইন ব্যবসায়ে প্রথমে ব্যর্থ হয়ে মুনসেফের চাকরিও খুঁজেছিলেন। কিন্তু শেষে ব্যারিস্টার হিশেবে খুবই নাম করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম লর্ড খেতাব লাভ করেন।

১৮৮০ সালের পর মুসলমানদের মধ্যেও ব্যারিস্টারি পড়া এতো আকর্ষণীয় বিষয় হিশেবে চালু হয় যে, বড়ো লোকের ছেলেরা অনেকেই ব্যারিস্টার হয়ে আসেন। উপরের তালিকায় একমাত্র ১৮৮০ সালে উত্তীর্ণ সাতজন মুসলমান ব্যারিস্টার থেকে এ কথার সত্যতা বোঝা যায়। এই সাতজনই ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা হাই কোর্টে কাজ করার জন্যে অনুমোদিত ছিলেন। কিন্তু এঁরা সবাই বাঙালি অথবা বাংলাভাষী ছিলেন কিনা, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি; যদিও এঁরা যে কেউ ব্যারিস্টার হিশেবে বিখ্যাত হতে পারেননি, সেটা জানা কথা। মুসলমান ব্যারিস্টারদের মধ্যে প্রথম যে-তিনজন খ্যাতি লাভ করেন, আমীর আলি ছাড়া তাঁদের অন্য দুজনের নাম আবদুর রহিম এবং আবদুর রসুল। তাঁরা অবশ্য ব্যারিস্টারির থেকেও বেশি খ্যাতি অর্জন করেন অন্য কারণে। আবদুর রহিম ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ১৮৯০ সালে আর আবদুর রসুল ১৮৯৮ সালে। আবদুর রহিম পরে শিক্ষা, আইন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভ করেন। আবদুর রসুলও রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে।


সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কেউ কেউ ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে ব্যারিস্টার না-হয়েও ফিরে এসেছিলেন। যেমন, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বরে লন্ডনে গিয়ে পৌঁছেছিলেন ব্যারিস্টারি পড়ার লক্ষ্য নিয়ে। ইনার টেম্পলে তিনি ভর্তিও হয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৮০ সালের মে মাসে দেশে ফিরে আসেন মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে।

আইসিএস প্রতিযোগিতা

ডাক্তার অথবা ব্যারিস্টারই নয়, যাঁরা খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, তাঁদের সামনে আর-একটা প্রলোভন ছিলো আইসিএস হওয়ার। কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে হলেও আইসিএস হওয়ার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো লন্ডনে। যে-দুজন বাঙালি প্রথম বিলেতে যান এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে, তাঁরা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষ। তখন কারা বিলেতে যেতে পারতেন, আগের অনেকগুলো উদাহরণ থেকে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। যেতে পারতেন তাঁরাই, যাঁরা ছিলেন ধনী এবং প্রতিপত্তির অধিকারী। সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহনও পড়েন এই শ্রেণীতে।

এঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ কেবল ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন না, তিনি ছিলেন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্রাহ্ম। সে তুলনায় মনোমোহনের অবস্থান ছিলো হিন্দু সমাজের আর একটু কাছে। তাঁদের পরিবার থাকতোও কলকাতার বাইরে – মফস্বলে। তার মানে সেখানে সমাজের চাপ ছিলো আর-একটু বেশি। তা সত্ত্বেও তিনি যে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার কারণ তিনি খুবই ব্রাহ্ম প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর পিতা রামলোচন ঘোষ রামমোহন রায়ের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিলো। তা ছাড়া, তিনি বিত্ত এবং প্রতিপত্তির দিক দিয়ে সমাজের ওপর তলার সদস্য ছিলেন।

মনোমোহন কৃষ্ণনগর থেকে এনট্রেন্স পাশ করে, যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন, তখন তিনি থাকতেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের অর্থ সাহায্য নিয়ে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন তিনি। এ সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে মনোমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এঁদের দুজনের পক্ষে তাই সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো। তাঁরা বিলেত যাত্রা করেন ১৮৬২ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। এবং আগেই আমরা রাখালদাস হালদারের কথা থেকে লক্ষ্য করেছি, তাঁরা লন্ডনে পৌঁছেছিলেন চৌঠা মে তারিখে।

আইসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে তাঁরা দুজনই কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। লন্ডনেই বেশির ভাগ সময় কাটালেও, কিছুকাল লন্ডনের বাইরে গিয়েও টিউটরিয়াল হোমে থেকে তাঁদের লেখাপড়া শিখতে হয়েছিলো। ১৮৬৩ সাল থেকে তাঁরা গর্ডন

স্কোয়ারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকতে আরম্ভ করেন। তাঁদের আগের বছর রাখালদাস হালদারও এই হলে থেকে গিয়েছিলেন। পার্থক্য এই যে, রাখালদাস নিজে আয় করে থাকতেন এই ছাত্রাবাসে, আর সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন টাকা পেতেন দেশ থেকে। আরবি, সংস্কৃত, ল্যাটিন এবং গ্রীকসহ অনেকগুলো ভাষা শিখতে হয়েছিলো তাঁদের। ইংরেজি সাহিত্য এবং ইউরোপের ইতিহাসও তাঁদের পড়তে হয়েছিলো খুব ভালো করে। তাঁদের এই কঠোর পরিশ্রম সম্পর্কে জানা যায় মনোমোহন ঘোষের চিঠি থেকে। ১৮৬২ সালের ডিসেম্বরে তিনি লিখেছিলেন যে, লেখাপড়া ছাড়া তাঁদের জীবনে অন্য কোনো আনন্দ অথবা কাজ নেই। ছ-সাত বছর পরে রমেশচন্দ্র দত্তও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, এমন কঠোর পরিশ্রম করে তিনি কখনো লেখাপড়া করেননি। রমেশচন্দ্রের পর ব্রজেন্দ্রনাথ দে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে, তিনি দিনে ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা লেখাপড়া করতেন।

ইংল্যান্ডের আবহাওয়া সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহনকে দারুণ কাবু করেছিলো। তদুপরি, আগেই বলেছি, ঠাণ্ডা গরু এবং শুয়োরের মাংস খেয়ে খেয়ে দুজনেরই বিরক্তি ধরে গিয়েছিলো। কবে দেশে ফিরে ভাত আর মাছের ঝোল খেতে পারবেন, সে কথা লিখে মনোমোহন বিলাপ করেছিলেন। খাওয়ার কথা নিয়ে দু দশক পরে গিরিশচন্দ্র বসুও কম দুঃখ করেননি। তাঁর *বিলাতের পত্র* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, 'হাজারই ঘৃণা করি না, তথাচ মুগের ডাল, মাছের ঝোল, কলাইয়ের ডাল, মাছের অম্বল, শাকচচ্চড়ি, মোচার ঘণ্ট, পলতার শুকতানি খাইতে এক একবার বড় ইচ্ছা হয়।'

সে যাই হোক, প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও ১৮৬৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে যে-আইসিএস পরীক্ষা হয়, তাতে মনোমোহন উত্তীর্ণ হতে পারেননি। কিন্তু তাতে সফল হয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। অল্পদিন পরেই মনোমোহন দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার আগে মাইকেল মধুসূদন তাঁকে ইটালিয়ান এবং ল্যাটিন শিখতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া, শেক্সপীয়র অধ্যয়নে সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এর দু বছর আগেই। সে সহায়তা সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন কতোটা নিয়েছিলেন, তা অবশ্য জানা যায় না। মাইকেলের ধারণা ছিলো যে, এই দুই তরুণ শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোমোহনই বেশি মেধাবী। তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান হয়েছিলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন ১৮৬৪ সালের অক্টোবরে। তাঁর এই অসাধারণ কৃতিত্বে দেশবাসীর সঙ্গে মাইকেলও এতোটাই আনন্দিত এবং গর্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি একটি সনেট লিখেছিলেন। অপর পক্ষে, সিভিলিয়ান হতে না-পেরে মনোমোহন ব্যারিস্টারি পাশ

করে দেশে ফেরেন আরও দু বছর পরে — ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি। এটা কিছু অসাধারণ ছিলো না। পরে অনেকেই সিভিলিয়ান হতে না-পেরে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনিও মনোমোহনের মতো দুবার আইসিএস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে (১৮৯২ ও ৯৩ সালে) ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছিলেন।

পরে অন্য যাঁরা আইসিএস প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চেয়েছিলেন, মনোমোহনের ব্যর্থতা তাঁদের কমবেশি নিরুৎসাহ করেছিলো। তা ছাড়া, ভারতীয়রা যাতে সহজে এ পরীক্ষায় সফল হতে না-পারেন, তার জন্যে সত্যেন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ প্রার্থীদের বয়স তেইশের বদলে একুশে নামিয়েছিলো। তার চেয়েও বড়ো বাধা ছিলো ইংরেজি ভাষা। মাইকেল সে জন্যে ভ্যার্সাই থেকে গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন যে, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সেই তরুণদের এই প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে বিলেতে পাঠানো দরকার, যাতে তারা ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে পারে। মোট কথা, এই পরীক্ষা কঠিন হওয়ার কারণে পরে খুব বেশি বাঙালি এতে অংশ নিতে বিলেতে যাননি। আর সাফল্য লাভ করেছিলেন আরও কম।

এ রকমের কঠিন বাধা সত্ত্বেও ১৮৬৮ সালের তেসরা মার্চ একই জাহাজে করে তিন বন্ধু বিলেতে গিয়েছিলেন এই পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্যে — সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্ত। এঁরা কেউই ব্রাহ্ম অথবা খৃস্টান ছিলেন না। তাই এঁরা বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে পরিবার এবং সমাজের কাছ থেকে কমবেশি বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যেমন, রমেশচন্দ্র পরিবারের তরফ থেকে বাধা এবং সহায়তা উভয়ই পেয়েছিলেন। তাঁর পিতামাতা এর অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। তাঁরা থাকলে কী করতেন, বলা যায় না; কিন্তু তাঁর পিতামহ একঘরে হওয়ার ভয়ে তাঁর বিলেত গমনের বিরোধী ছিলেন। এই অবস্থায় বড়ো ভাইয়ের কাছ থেকে গোপনে অর্থ সাহায্য নিয়ে রমেশচন্দ্র যেতে পেরেছিলেন। রমেশচন্দ্রের জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরে রমেশচন্দ্রের যে-জীবনী লেখেন, তাতে দাবি করেছেন যে, রমেশচন্দ্র বড়ো ভাইয়ের সাহায্য নিলেও, তাঁকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিলো।

সুরেন্দ্রনাথ সে তুলনায় ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি সাহায্য এবং উৎসাহ পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন যে, তাঁর পিতামহ ছিলেন কুলীন পরিবারের সন্তান এবং খুব রক্ষণশীল। অপর পক্ষে, তাঁর পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্র। শিক্ষা এবং রুচিতে তিনি ছিলেন রীতিমতো আধুনিক। নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিলো যথেষ্ট মাত্রায়। তিনি বুঝেছিলেন যে, জীবনে সাফল্য লাভের চাবিকাঠি হলো উচ্চশিক্ষা। তাই সুরেন্দ্রনাথের

বয়স যখন মাত্র পাঁচ, তখন তিনি যে-উইল করেন, তাতেই সুরেন্দ্রনাথকে শিক্ষার জন্যে বিলেতে পাঠানোর কথা লিখেছিলেন। তাই বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে পুরো সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন সুরেন্দ্রনাথের বিলেতে যাওয়ার সময় হলো, তখন সমাজের কাছ থেকে পাছে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়, এই আশঙ্কায় সুরেন্দ্রনাথ সাগর পাড়ি দিচ্ছেন — এ খবর সবার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিলো, এমন কি, তাঁর মায়ের কাছ থেকেও। যাওয়ার ঠিক আগে যখন তাঁর মাকে এ কথা জানানো হয়, তখন তিনি মর্মাহত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।



সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তৃতীয় সহযাত্রী — বিহারীলাল গুপ্তও তাঁর যাওয়ার কথা ঢোল পিটিয়ে রাষ্ট্র করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে সম্ভবত পরিবারের কাছ থেকে তিনি তেমন কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। তাঁর মাতামহ হরিমোহন সেন হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ ইয়ং বেঙ্গলের সহপাঠী ছিলেন। তা ছাড়া, তিনি ছিলেন কেশব সেনের জ্ঞাতি। সুতরাং অনুমান করলে অসঙ্গত হবে না যে, বিলেতে যাওয়ার অনুপ্রেরণা এবং সহায়তা বিহারীলাল হয়তো মাতামহের কাছ থেকেই পেয়ে থাকবেন। অন্তত, এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের সন্তান ছিলেন না। আর, বিলেত থেকে ফিরে এসে অন্নদাচরণ খাস্তগিরের কন্যা সৌদামিনীকে বিয়ে করে তিনি রীতিমতো ব্রাহ্মদের দলে নাম লিখিয়েছিলেন। আইসিএস জামাতা পেয়ে অন্নদাচরণ তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিয়ে দেন আধা-হিন্দু, আধা-ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তার অর্থ অন্নদাচরণ যেমন খানিকটা আপোশ করেছিলেন, বিহারীলাল গুপ্তের পরিবারও খানিকটা ব্রাহ্ম মতের সঙ্গে আপোশ করেই বিয়ে দিয়েছিলেন।

সে যাই হোক, বিলেত যাওয়ার আগে যখন এই তিন বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সাহায্য এবং পরামর্শ চান, তখন তিনি তাঁদের খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। এঁদের সাহায্য করার জন্যে তিনি চিঠি লিখেছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে। তাই এপ্রিলের গোড়ার দিকে

তাঁরা যখন দক্ষিণ ইংল্যান্ডের সাউথ্যাম্পটন বন্দরে গিয়ে পৌঁছান, তখন তাঁদের স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন উমেশচন্দ্র।

অধ্যয়নকে তপস্যা জ্ঞান করে তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তিনজনই এক সঙ্গে প্রথম বছরের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৮৬৯ সালে। প্রায় ৩৩০ জন প্রার্থীর মধ্যে রমেশচন্দ্র তৃতীয়, বিহারীলাল চতুর্দশ এবং সুরেন্দ্রনাথ ৩৮-তম স্থান লাভ করেন। এর পরই সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে আইনী জটিলতা দেখা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সহ অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেন এই বাধা কাটিয়ে উঠতে। বয়সের সমস্যা পুরোপুরি মীমাংসা হওয়ার আগেই তিনি ১৮৭১ সালের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। এতে রমেশচন্দ্র দ্বিতীয়, বিহারীলাল চতুর্থ এবং সুরেন্দ্রনাথ বিংশতিতম স্থান অধিকার করেন। সে বছর একজন অবাঙালিও আইসিএস হয়েছিলেন। চার-চারজন ভারতীয়কে এই প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে দেখে কর্তৃপক্ষ অতঃপর প্রার্থীদের বয়স আরও দু বছর কমিয়ে উনিশ করেছিলো। এর পর বাঙালি তথা ভারতীয় প্রার্থীদের পক্ষে আইসিএস হওয়া আরও শক্ত হয়ে পড়ে।

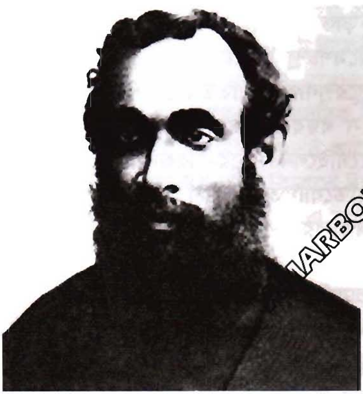

রমেশচন্দ্র দত্ত

বিহারীলাল এবং রমেশচন্দ্র কেবল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হননি, তাঁরা ব্যারিস্টার হয়েছিলেন ১৮৭১ সালের ৬ই জুন তারিখে। সুরেন্দ্রনাথও মিডল টেম্পলে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে আট টার্ম উপস্থিত ছিলেন। বাকি ছিলো চার টার্ম। কিন্তু আইসিএস হওয়ায় ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন শেষ না-করেই দুই বন্ধুর সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। অগস্ট মাসে রওয়ানা করে ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড এবং ইটালি হয়ে তাঁরা ব্রিন্দিসিতে এসে জাহাজে ওঠেন। তারপর বোম্বাই থেকে স্থলপথে কলকাতায় পৌঁছান সেপ্টেম্বরের শেষে। রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলাল সেপ্টেম্বরের শেষে এবং সুরেন্দ্রনাথ নভেম্বরে চাকরিতে যোগদান করেন।

বিলেতে থাকার সময়েই — ১৮৭০ সালে — সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে হারিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এ খবর যখন লন্ডনে পৌঁছায়, তখন কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, তারকনাথ পালিত, লালমোহন ঘোষ এবং কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁকে

বিশেষ সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। দেশে ফিরেই তিনি বিধবা মায়ের কাছে ছুটে যান। মা এবং পরিবারের অন্যরা তাঁকে গ্রহণ করেন। কিন্তু রক্ষণশীল পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁদের কার্যত একঘরে করেন।

রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলাল পরিবার এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কতোটা সমাদর পেয়েছিলেন, তার লিখিত কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু তিনজন তরুণকে এক সঙ্গে সিভিলিয়ান হতে দেখে শিক্ষিত দেশবাসীরা গর্ব বোধ করেছিলেন। তাই প্রগতিশীল সমাজ তাঁদের একটি নাগরিক সংবর্ধনা দিয়েছিলো অক্টোবর মাসে। এই উদ্যোগে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র। তরুণ সিভিলিয়ানরা যখন বোম্বাই থেকে হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছান, তখনো সেখানে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৬৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতায় ফিরে আসার পর তাঁকেও নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিলো এবং তাতেও বিদ্যাসাগর বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন।


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলাল – দুজনই খ্যাতি এবং দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিন সিভিলিয়নের দায়িত্ব পালন করেন। শেষ পর্যন্ত রমেশচন্দ্র কমিশনার হয়েছিলেন। তাঁর আগে কোনো ভারতীয় এতো উচ্চপদ লাভ করেননি। অপর পক্ষে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ওপর অজ্ঞাত কারণে কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট ছিলো। তাঁর চাকরিতে প্রবেশের সময়ে যেমন বয়সের প্রশ্নে তাঁকে বাদ দিতে চেষ্টা করেছিলো, তেমনি চাকরি শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর বিরুদ্ধে ঠুনকো ও ভিত্তিহীন অজুহাত দেখিয়ে অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কর্তৃপক্ষ তাঁকে শেষ পর্যন্ত চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। চাকরি বাঁচানোর তদবির করার জন্যে তিনি ১৮৭৪ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয়বার বিলেতে যান। কিন্তু শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও চাকরি তিনি ফিরে পাননি। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তিনি তখন ব্যারিস্টার হতে চেষ্টা করেন। আগেই বলেছি, তিনি আটটি টার্ম করেছিলেন। এখন বাকি চারটি টার্ম করার পর ব্যারিস্টার হিশেবে তাঁকে বারে ডাকার জন্যে নাম প্রকাশ করা

হয়। কিন্তু এ সময়ে কেউ একজন মিডল টেম্পলের কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে দেয় যে, সুরেন্দ্রনাথ সিভিল সার্ভিস থেকে পদচ্যুত হয়েছেন। এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে ব্যারিস্টার হিশেবেও মিডল টেম্পল স্বীকৃতি দেয়নি। অনেকটা এসব ব্যক্তিগত ক্ষোভ থেকেই পরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ১৮৭৬ সালে আনন্দমোহন বসুকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন।

রমেশচন্দ্র এবং তাঁর দুই বন্ধুর দু বছর পর যিনি আইসিএস হয়েছিলেন, তিনি কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (১৮৫১-১৯২৬)। তিনিও রমেশচন্দ্র এবং বিহারীলালের মতো খুবই উচ্চপদে উঠে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯০৪ সালে। তাঁর পরে ১৮৭৩ সালে আর-একজন কৃতী বাঙালি আইসিএস হয়েছিলেন, তাঁর নাম ব্রজেন্দ্রনাথ দে (১৮৫২-১৯৩২)। ভারতীয় আইসিএসদের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী ছাত্র। লাখনৌয়ের ক্যানিং কলেজ থেকে কলকাতায় এসে বিএ পরীক্ষা দেন তিনি উনিশ বছর বয়সে। এর দু/তিন মাস পরেই ছিলো এমএ পরীক্ষা। কাউকে না-জানিয়ে তিনি নিজে নিজে এমএ ক্লাসের (ইংরেজিতে) সব বই পড়ে ফেলেছিলেন। তাই একজন শিক্ষকের সুপারিশ নিয়ে তিনি সেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এ রকম দু-তিন মাসের মধ্যে পরপর বিএ এবং এমএ পাশ করার কোনো নজির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নেই।

পরের বছর (১৮৭২) জুলাই মাসের ২৬ তারিখে তিনি ধার করে মাত্র ১৩০০ টাকা নিয়ে বোম্বাই থেকে বিলেত যাত্রা করেন। তাঁর আগে যাঁরা গিয়েছিলেন, সবার আর্থিক অবস্থা তাঁর চেয়ে অনেক ভালো ছিলো। তবে তিনি যে যান, তার কারণ তাঁকে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন তাঁর পিতামাতা — দুজনেই। তা ছাড়া, তাঁর মায়ের মামা ছিলেন নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা প্যারীচরণ সরকার। তিনিও তাঁকে উৎসাহ দিয়ে থাকবেন। যাবার আগে রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁকে উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

বিলেতে যাবার পর তাঁকে যাঁরা স্বাগত জানান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, প্রসন্নকুমার রায়, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, লালমোহন ঘোষ, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর পিতা), নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ডাক্তার জালনুর আলি আহমেদ। তিনি লন্ডনে থাকতেন প্রসন্নকুমার রায়ের সঙ্গে। *Reminiscences of an Indian Member of the Indian Civil Service* নামে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন যে, তিনি বলতে গেলে সারাক্ষণ লেখাপড়া করতেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তাঁকে লেখাপড়ায় সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া, তিনি রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল এবং

সুরেন্দ্রনাথের তৈরি করা নোটও পেয়েছিলেন অন্য বাঙালিদের কাছ থেকে। ১৮৭৩ সালের প্রথম ভাগে যে-পরীক্ষা হয়, তাতে তিনি ছাড়া আরও দুজন বাঙালি অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিই সফল হয়েছিলেন। ৩৫জন সফল প্রার্থীর মধ্যে তাঁর স্থান ছিলো সপ্তদশ। এরপর তিনি মিডলটেম্পল থেকে ব্যারিস্টার হন। দেশে ফিরে আসার আগে তিনি অক্সফোর্ডে গিয়ে মনিয়ের উইলিয়ামসের ছাত্র হিশেবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯১০ সালে অবসর নেওয়ার পর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আর-একজন ব্যারিস্টার — মন্মথচন্দ্র মল্লিক।

সত্যেন্দ্রনাথ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছ জন বাঙালি আইসিএস হলেও সাধারণভাবে বললে বাঙালি তথা ভারতীয়রা প্রথম দিকে আইসিএস খুব বেশি হতে পারেননি। বিশেষ করে ব্রজেন্দ্রনাথের পর বছর দশেকের মধ্যে আর কোনো বাঙালি এই প্রতিযোগিতায় সফল হননি।

শ্রীনাথ দত্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ দের সহপাঠী। তিনিও খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিন্তু ১৮৭২ সালে আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তিনি সফল হতে পারেননি। এ রকম আর-একজন অসফল ছাত্র ছিলেন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথের ছোটো ভাই দেবেন্দ্রনাথ দাস। তিনিও খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। ১৮৭২ সালে তিনি এনট্রেন্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান এবং ৭৪ সালে এফএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৭৬ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত যান। যাওয়ার আগে তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ দের কাছ থেকে কী করতে হবে — সে বিষয়ে উপদেশ নেন। পরের বছর তিনি ঐ পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে তিনি সপ্তদশ স্থান লাভ করেন — সে বছর নেওয়া হয়েছিলো মাত্র ষোলোজন প্রার্থীকে। এর ফলে চাকরি পাননি তিনি। তখন তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত অধ্যয়নের জন্যে ভর্তি হন। মেধার জন্যে সেখানে তিনি বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তৃতীয় বছর পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিএ উপাধি লাভ করেন। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। বেশ কয়েক বছর লন্ডনে বাস করার সময়ে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতেন। তাঁর আত্মজীবনী *পাগলের কথায়* তিনি লিখেছেন যে, ১৮৮২ সালে তিনি দেশে ফিরে এসেছিলেন। তবে মাস ছয়েক পরেই — সেপ্টেম্বর মাসের ২৬শে — পিতামাতার ওপর অভিমান করে স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে নিয়ে আবার লন্ডনের পথে বোম্বাই যাত্রা করেন।

কেউ কেউ বলেছেন যে, বিলেত যাওয়ার জন্যে তিনি ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলেন। তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস ছিলেন হাইকোর্টের নামকরা উকিল। বিদ্যাসাগরের বন্ধু হলেও প্রগতিশীল বলে তাঁর পরিচয় ছিলো না। উপেন্দ্রনাথ দাস যখন ১৮৭৯ সালে

বিধবাবিবাহ করতে চান, তখন শ্রীনাথ দাস তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার হুমকি দিয়েছিলেন। এ অবস্থায় বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় উপেন্দ্রনাথ এই বিবাহ করতে সমর্থ হন। তা সত্ত্বেও, শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে, উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের জন্যে ছিন্ন হয়। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাজ্যপুত্র করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। স্ত্রীকে নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বিলেতে যাওয়ার সময়ে তাঁর পিতা তাঁদের বালিকা কন্যাকে বিলেতে যেতে না-দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দেন। এর সাত বছর পরে স্বামী-স্ত্রী কলকাতায় ফিরে আসেন, ১৮৮৯ অথবা ১৮৯০ সালে। ততোদিনে এই কন্যার বিবাহ হয়ে গিয়েছিলো এক রক্ষণশীল পরিবারে। ফলে ম্লেচ্ছ পিতামাতার সঙ্গে কন্যার আর কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পিতা রক্ষণশীল হলেও ধর্মের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ দাস গোড়া থেকেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'অতি বাল্যকালেই পৌত্তলিক হিন্দু ধর্ম্মে আমার সমস্ত বিশ্বাস লোপ পাইয়াছিল। জ্ঞান হইয়া অবধিই শিলা, পুতুল, প্রতিমাদির প্রতি আমি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষী ছিলাম; আর ঠাকুরপূজা, মালাজপ বা অন্য কোনপ্রকার বাহ্য আড়ম্বর দেখিলেই আমি জ্বলিয়া উঠিতাম। আমি কোন ধর্ম্ম ব্যবস্থায় আসক্ত ছিলাম না, কিন্তু আমার অন্তরে বিলক্ষণ ধর্ম্মভাব ছিল।' প্রচলিত ধর্ম এবং লোকাচারের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা থেকেই তিনি হয়তো কালাপানি পার হয়ে বিলেত যেতে সাহস পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্রথমবার বিলেতে গিয়েছিলেন আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে। তিনি যে আইসিএস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাচ্ছেন এবং সে কারণে তাঁর বয়সের একটি স্যার্টিফিকেট দরকার – এ আবেদন জানিয়ে তিনি বঙ্গদেশ সরকারের সেক্রেটারির কাছে দরখাস্ত করেছিলেন ১৮৭৮ সালের ১২ই মার্চ তারিখে। প্রশান্তকুমার পালের *রবিজীবনী*তে দরখাস্তটির পুরো বয়ান দেওয়া আছে। এই প্রতিযোগিতার জন্যে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তুতিও নিতে আরম্ভ করেছিলেন। ব্রাইটন এবং লন্ডনে তিনি ইংরেজি সাহিত্য, ল্যাটিন ভাষা, ইংরেজ জাতির ইতিহাস ইত্যাদি অধ্যয়ন শুরু করেন। তবে এসব বিদ্যায় অথবা ধরা-বাঁধা শিক্ষায় তাঁর আদৌ কোনো আগ্রহ ছিলো না। দেশ ছাড়ার আগে তিনি বোম্বাইতে আনা তরখড়ের কাছে ইংরেজি আদব-কায়দাও শিখেছিলেন। আনা তার মাত্র দু বছর আগেই ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছিলেন।

ওদিকে, তাঁর অভিভাবকদের প্রত্যাশা ছিলো যে, আইসিএস হতে না-পারলে রবীন্দ্রনাথ যেন অন্তত ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের পরিবার এবং সমাজ নিয়ে প্রগতিশীল মন্তব্য করে তিনি এমন সব চিঠিপত্র লিখতে আরম্ভ করেন যে, তা তাঁর অভিভাবকদের বিচলিত করেছিলো, বিশেষ করে তাঁর রক্ষণশীল পিতা

দেবেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো প্রকাশিত হচ্ছিলো *ভারতী* পত্রিকায়। এসব চিঠিতে তিনি যেসব মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে মনে হতেই পারে যে, তিনি পাশ্চাত্য মূল্যবোধ দিয়ে বড্ডো বেশি প্রভাবিত হচ্ছিলেন। তদুপরি, তিনি স্কট-পরিবারের দুই কন্যার সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন — এ খবরও হয়তো দেবেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলো। সর্বোপরি, দেড় বছর বিলেত বাস করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ গান-বাজনায় কিছু উন্নতি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু লেখাপড়ায় অগ্রগতি করেছিলেন সামান্যই। হেনরি মর্লির কাছে ইংরেজি সাহিত্য পড়া ছাড়া, অন্য কোনো বিদ্যা তাঁর বিশেষ ভালো লাগেনি। সাহিত্যের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ ছাড়াও হেনরি মর্লি ছিলেন খুবই আকর্ষণীয় এবং স্নেহশীল শিক্ষক। তাঁর কাছে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্তও লেখাপড়া শিখেছিলেন আগের দশকে। তাঁরা দুজনেই লিখেছেন যে, মর্লির মতো ভালো মানুষ এবং ভালো শিক্ষক তাঁরা আর কোনো দিন দেখেননি।


লন্ডনে তরুণ রবীন্দ্রনাথ

সে যাই হোক, অভিভাবকরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন। এ সময়ে স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দুই ভগ্নীপতি বিলেতে ছিলেন। তাঁর পরিবারের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন দক্ষিণ ইংল্যান্ডে, জানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন লন্ডনে আর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অ্যাবারডিনে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখাশোনা করতে পারতেন হয়তো। তা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে দেশে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেন।

১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেশের উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেন। তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন মার্চ মাসের

তৃতীয় সপ্তাহে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিলেতে যাওয়ার পথেও রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে বিলেতে যাত্রা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে, ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সত্যেন্দ্রনাথের পরিবার এর এক বছর আগে থেকেই বিলেতে বাস করছিলো। রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিয়ে সেখানে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে আসা ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়েছিলেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফার্লো অর্থাৎ দীর্ঘ ছুটি কাটাতে।

আগেই লক্ষ্য করেছি, সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু তারকনাথ পালিত ১৮৭০ সালে ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি, কেবল ব্যারিস্টার হননি, ইংরেজি সভ্যতা



১৮৮০ সালের ব্রাইটন

দিয়েও তিনি দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাই তিনি কন্যা এবং পুত্রদের লেখাপড়া শেখাতে চান বিলেতে রেখে। এই উদ্দেশে তিনি স্ত্রী এবং পুত্রদের নিয়ে লন্ডনে পৌঁছেছিলেন ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। আগের দশকে লন্ডনে থাকার সময়ে তিনি যে-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তা থেকে বুঝেছিলেন যে, ছেলেকে কম বয়সে ধ্রুপদী ভাষা এবং ইংরেজিসহ অন্যান্য বিষয় ভালো করে না-শেখালে আইসিএস হওয়া শক্ত হবে। পুত্র লোকেন্দ্রনাথকে তিনি তাই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি করে দেন ১৮৭৯ সালের গোড়ার দিকে। এ বছর রবীন্দ্রনাথও লন্ডন

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সাত-আট মাস অধ্যয়ন করেছিলেন। এই সূত্রেই লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আজীবনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। লোকেন্দ্রনাথ এখানে ১৮৮১ পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে তবে ১৮৮৬ সালে আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নেন।

লোকেন পালিতের আগে বারো বছরের মধ্যে কোনো বাঙালি আইসিএস হতে পারেননি। কিন্তু একবার তিনি সফলভাবে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর হঠাৎ যেন বাধা সরে যায়। অতঃপর প্রায় প্রতি বছরই কোনো না কোনো বাঙালি আইসিএস হতে থাকেন। নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, কোনো কোনো বছর দুজন, তিনজন, এমন কি, এক বছরে চারজনও আইসিএস হয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল, শশিপদ ব্যানার্জির পুত্র অ্যালবিয়ন এবং সেকালের বিলেতফেরত সবচেয়ে বড়ো ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তীর পুত্র অ্যালফ্রেড ইউলিয়াম গুডিবও বিলেতে গিয়ে সেখানে লেখাপড়া শিখে তবে আইসিএস পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অ্যালফ্রেড পাশ করেন ১৮৮৯ সালে। আর জ্যোৎস্নানাথ এবং অ্যালবিয়ন পাশ করেন ১৮৯৪ সালে।

জ্যোৎস্নানাথ বিলেতে যান কলকাতা থেকে এফএ পাশ করে। তিনি সেখানে গিয়ে পৌঁছান ১৮৯০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। তাঁকে লন্ডনে স্বাগত জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ এবং লোকেন পালিতও তখন সেখানে ছিলেন। তাঁরা তিনজনই এক সঙ্গে লন্ডনের উদ্দেশে বোম্বাই ত্যাগ করেছিলেন এর আগের মাসে। জ্যোৎস্নানাথ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর মামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বোম্বাইতে চাকরি নেন ১৮৯৫ সালে। এর অল্পদিন পরেই কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর কন্যার সঙ্গে পরিবারের একাংশের অমতে তাঁর অসবর্ণ বিবাহ হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসব ব্যাপারে খুব রক্ষণশীল হলেও এ বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। জ্যোৎস্নানাথের সহপাঠী জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আইসিএস হয়েছিলেন জ্যোৎস্নানাথের দু বছর আগে – ১৮৯২ সালে।

শশিপদ ব্যানার্জির পুত্র অ্যালবিয়ন ব্যানার্জি ১৮৯২ সালে অক্সফোর্ড থেকে বিএ পাশ করে ১৮৯৩ সালে আইসিএস প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। চিত্তরঞ্জন দাশও সে বছর দ্বিতীয়বারের জন্যে এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। অ্যালবিয়ন আইসিএস হন ১৮৯৪ সালে। মনোমোহন ঘোষের পুত্র মহীমোহন ঘোষও আইসিএস হয়ে পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছিলেন ১৮৯০ সালে।

এই দশকে আইসিএস প্রতিযোগিতায় একজন বাঙালি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, যাঁর কথা আলাদা করে বলতে হয়। এই জন্যে যে, তিনি ছিলেন মুসলমান। আগেই বলেছি, বাঙালি মুসলমানরা লেখাপড়ায় খুব পিছিয়ে ছিলেন। রক্ষণশীল অভিজাত মুসলমানরা

ইংরেজি শেখাকে ভালো চোখে দেখতেন না। অপর পক্ষে, সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো ঐতিহ্য ছিলো না; আর্থিক সঙ্গতিও ছিলো না লেখাপড়া শেখানোর মতো। এমন কি, কলকাতা নগরীকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজি শেখার যে-সুযোগসুবিধা তৈরি হয়েছিলো, তাও বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্যে অবারিত ছিলো না। কলকাতা এবং তার আশেপাশে তখন মুসলমান খুব কমই বাস করতেন। তদুপরি, হিন্দু কলেজ এবং হেয়ার স্কুলের মতো যেসব প্রতিষ্ঠান ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে, সেসব প্রতিষ্ঠানও মুসলমানদের জন্যে হয় বন্ধ ছিলো, নয়তো এগুলোর অবস্থান ছিলো মুসলমান-পাড়া থেকে অনেক দূরে।

গজনফর আলি খানের জন্ম সিলেটে, ১৮৭২ সালে। এফএ পাশ করে তিনি বিলেতে যান ১৮৯২ সালে। একমাত্র আইসিএস পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বিলেতে যাননি। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিশেবে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন এবং সেখান থেকে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে বিএ পাশ করে র‍্যাংলার হন। আনন্দমোহন বসুর পরে তিনিই দ্বিতীয় বাঙালি র‍্যাংলার। তাঁদের মধ্যে আর-একটা মিল এই যে, আনন্দমোহন বসু যেমন র‍্যাংলার হয়েও শিক্ষা অথবা গবেষণার দিকে যাননি, গজনফর আলিও তেমনি শিক্ষকতা অথবা গবেষণা না-করে বরং আইসিএস হন ১৮৯৭ সালে।

প্রথম দিকের বাঙালি আইসিএসদের তালিকা

নাম	লেখাপড়া	উত্তীর্ণ হওয়ার বছর
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ইউসিএল	১৮৬৪
রমেশচন্দ্র দত্ত	ইউসিএল	১৮৬৯
বিহারীলাল গুপ্ত	ইউসিএল	১৮৬৯
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	ইউসিএল	১৮৬৯
কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	ইউসিএল	১৮৭২
ব্রজেন্দ্রনাথ দে	অক্সফোর্ড	১৮৭৩
লোকেন্দ্রনাথ পালিত	ইউসিএল	১৮৮৬
বসন্তকুমার মল্লিক	কেমব্রিজ	১৮৮৭
অ্যালফ্রেড উইলিয়াম চক্রবর্তী	ইউসিএল	১৮৮৯
মহীমোহন ঘোষ	অক্সফোর্ড	১৮৯০
সতীশচন্দ্র মুখার্জি	ইউসিএল	১৮৯০
বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন	ইউসিএল	১৮৯১
কিরণচন্দ্র দে	কেমব্রিজ	১৮৯২
জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত		১৮৯২
অ্যালবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জি	অক্সফোর্ড	১৮৯৪
জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল	অক্সফোর্ড	১৮৯৪

সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	কেমব্রিজ	১৮৯৬
অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		১৮৯৭
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	ইউসিএল, অক্সফোর্ড	১৮৯৭
গজনফর আলি খান	কেমব্রিজ	১৮৯৮
চারুচন্দ্র দত্ত	ইউসিএল	১৮৯৮
প্রতাপচন্দ্র দত্ত		১৮৯৮
যতীন্দ্রনাথ রায়	অক্সফোর্ড	১৮৯৮

শিক্ষার অন্যান্য শাখা

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, বাঙালি ছাত্রেরা প্রথমে বিলেতে যেতে আরম্ভ করেছিলেন চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্যে। বিলেত যাওয়া এবং সেখানে চিকিৎসাবিদ্যা শেখা অবশ্য সহজ ছিলো না। আইসিএস প্রতিযোগিতা ছিলো তার চেয়েও শক্ত। তুলনামূলকভাবে সহজ ছিলো ব্যারিস্টারি পড়া। এর জন্যে দেশ থেকে কোনো নির্দিষ্ট ডিগ্রি করে যাওয়ার দরকার হতো না; এমন কি, পাশ করার জন্যে দরকার হতো না কোনো পরীক্ষা দেওয়ার। এতে সময়ও লাগতো কিছু কম। সে জন্যে সবচেয়ে বেশি বাঙালি ছাত্র গিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে। দেশে ফিরে ডাক্তারি, আইসিএস এবং ব্যারিস্টারি — তিনটি থেকেই প্রভূত খ্যাতি এবং অর্থ লাভ করার দৃষ্টান্ত অনেকেই তৈরি করেছিলেন। অপর পক্ষে, সাধারণ বিএ, এমএ পাশ করার প্রতি কারো তেমন আগ্রহ ছিলো না। এসব পাশ করে কেউ বিশেষ অর্থ-খ্যাতি তখনো লাভ করেননি। কিন্তু ১৮৭০ সালের পর থেকে আনন্দমোহন বসুর মতো দু-একজন করে যেতে আরম্ভ করেন অ্যাকাডেমিক শিক্ষার জন্যে। ১৮৬৮ সাল থেকে বিলেতে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে সরকারও বছরে কয়েকটি বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিলেত যাওয়া খানিকটা সহজও হয়েছিলো। বস্তুত, এই সুযোগ পেয়ে এমন কেউ কেউ যেতে পেরেছিলেন, যাঁদের পক্ষে অন্যথায় কখনোই বিলেত যাওয়া সম্ভব হতো না।

আনন্দমোহন বসু বিখ্যাত ব্যারিস্টার হলেও তার থেকে অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্র হিশেবে। এখান থেকে ১৮৭৪

সালে তিনি র‍্যাংলার হন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম র‍্যাংলার। কেবল তাই নয়, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর আগে র‍্যাংলার হয়েছিলেন আর মাত্র পনেরো জন। এই ডিগ্রি লাভ কী অসাধারণ কৃতিত্বের বিষয় তা বোঝা যায় কাকে র‍্যাংলার বলা হয়, তা জানলে। যাঁরা দ্বিতীয় ভাগ-সহ তিন বছর গণিতের পাঠক্রমে ট্রাইপস ডিগ্রি করেন এবং তাতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি পান, তাঁদের বলা হয় র‍্যাংলার। এই র‍্যাংলারদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারীকে সিনিয়র র‍্যাংলার, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে দ্বিতীয় র‍্যাংলার, তৃতীয় স্থান অধিকারীকে তৃতীয় র‍্যাংলার বলা হয়। তবে র‍্যাংলার খুব কমই হন। সুতরাং আনন্দমোহন কতো প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তিনি গণিতের গবেষণা না-করে ব্যারিস্টারি এবং রাজনীতিতে নিজের মেধা ব্যয় করেন।

প্রথম দিকে যাঁরা উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁরা গিয়েছিলেন প্রধানত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-সহ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইংরেজি সাহিত্য ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করার উদ্দেশে। এমন কি, ১৮৮০-এর দশকের গোড়া থেকে কেউ কেউ কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্যেও যান। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার রায়, প্রমথনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ।

প্রসন্নকুমার রায়ের জন্ম ঢাকায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন তিনি। যৌবনে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে উপাধি নিয়ে তিনি গিলক্রিস্ট বৃত্তি লাভ করে বিলেতে যান, খুব সম্ভব ১৮৭১ সালে। দু বছর পরে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি পাশ করেন। তার আরও তিন বছর পরে — ১৮৭৬ সালে — তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিএসসি উপাধি লাভ করেন মনোবিজ্ঞানে। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম ডিএসসি। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রয়্যাল সোসাইটিতেও তিনি কিছুকাল লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরের বছর তিনি দেশে ফিরে এসে পাটনা, ঢাকা এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন। সেকালে ভারতীয় শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা বিভাগের অসংখ্য বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও তিনি অল্পকালের মধ্যেই অধ্যাপক হয়েছিলেন। তবে বৈষম্য থেকে তিনি পুরোপুরি রক্ষা পাননি — ১৮৯৮ সালেও তিনি ছিলেন শিক্ষা সার্ভিসের তৃতীয় গ্রেডে। পরে বিশ শতকের গোড়ায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তা ছাড়া, তিনি লন্ডনে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের উপদেষ্টার কাজ করেছিলেন দু বছর। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো তিনিও যে লোকাচার অমান্য করে বিলেত যেতে পেরেছিলেন, তার প্রধান কারণ তিনি ছিলেন

উৎসাহী ব্রাহ্ম। তিনি এতো উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন যে, লন্ডনেও ব্রাহ্মদের নিয়ে সমিতি গঠন করেন এবং তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেন।

প্রসন্নকুমারের পর যিনি বিজ্ঞান শিখতে গিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি হলেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ঢাকার ব্রাহ্মণগাঁয়ে (১৮৫০)। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি। সেখান থেকে পাশ করে গিলক্রিস্ট বৃত্তি পেয়ে খুব সম্ভব ১৮৭২ সালে এডিনবরায় যান রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করার জন্যে। ৭৩ সালের গ্রীষ্মকালে ব্রজেন্দ্রনাথ দে যখন এডিনবরায় যান, তখন অঘোরনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এডিনবরায় সর্বোচ্চ মার্ক পেয়ে অঘোরনাথ বিএসসি পাশ করে হোপ পুরস্কার পান। তারপর ১৮৭৭ সালে রসায়নশাস্ত্রে ডিএসসি ডিগ্রি করেন তিনি। তখন রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ মর্যাদা ছিলো না। তিনি বঙ্গদেশে চাকরি পাননি। তাঁর দশ বছর পরে প্রফুল্ল রায়ও দেশে ফিরে সহজে চাকরি পাননি। অঘোরনাথ তখন হায়দারাবাদে গিয়ে নিজামের অধীনে কাজ করেন। তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হন সরোজিনী নাইডু এবং মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা দুজনই কেমব্রিজে ট্রাইপস করেছিলেন।

অঘোরনাথের পরপরই আর-একজন বিলেতে গিয়েছিলেন উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্যে। তিনিও ঢাকার মানুষ — নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ১৮৭৩ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ দে যখন এডিনবরায় বেড়াতে যান, তখন সেখানে অঘোরনাথ ছাড়া, নিশিকান্তের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়েছিলো। এখানে নিশিকান্ত কী পড়াশোনা করেছিলেন, আমার জানা নেই। কিন্তু জার্মেনির লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরে তিনি জার্মান এবং সংস্কৃত ভাষাসহ ভাষাতত্ত্ব এবং দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। তা ছাড়া, পরে জুরিখ থেকে পিএইচডি ডিগ্রিও করেছিলেন তিনি। তাঁর আগে পর্যন্ত বঙ্গদেশ অথবা ভারতবর্ষ থেকে অন্য কেউ ভাষা এবং মানবিক বিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে যাননি — সে দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। অধ্যয়ন শেষে তিনি রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবুর্গে দু বছর ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক ছিলেন। দশ বছর ইউরোপ বাস করার পর তিনি ১৮৮৩ সালে দেশে ফিরে আসেন। নিজামের আমন্ত্রণে তিনিও হায়দারাবাদে গিয়ে অধ্যাপনা করেন। বিলেতে যাওয়ার আগে তিনি নারীদের অগ্রগতির জন্যে বই লিখেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রমথনাথ বসু বিলেতে যান ১৮৭৮ সালে। অঘোরনাথের মতো তিনিও গিয়েছিলেন গিলক্রিস্ট বৃত্তি পেয়ে। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো ভূতত্ত্ব ও খনিজ বিদ্যায়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে তিনি বিএসসি পাশ করেন ১৮৭৮ সালে। পরের বছর তিনি রয়্যাল সোসায়েটি অব মাইনসের পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন এবং এই সোসায়েটির

ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এ বছরের পয়লা মার্চ তিনি ব্রিস্টল মিউজিয়ামে *A Brief Sketch of the Origin and History of the Caste System in India* নামে একটি বক্তৃতা দেন। এবং পরে ঐ বছরই সেটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সে যাই হোক, তিনি যখন দেশে ফিরে আসেন তখন এ বিদ্যায় দেশীয়দের মধ্যে তাঁর মতো উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কেউই ছিলেন না। সম্ভবত বিদেশীও ছিলেন না। তা সত্ত্বেও জিঅলজিক্যাল সার্ভের চাকরিতে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ডিঙিয়ে তাঁর এক সহকারীকে তত্ত্বাবধায়কের পদ দেওয়া হলে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হলে তিনি তার অধ্যক্ষ হন। এই ইনস্টিটিউট থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা।

বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তিনি একটা স্বাদেশিকতার মাত্রা যোগ করেছিলেন। কেবল নিজের লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি স্বদেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন। নিজের উদ্যোগে তিনি বিভিন্ন জায়গায় খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে লোহার খনি আবিষ্কারের পর তিনিই জামশেদজী টাটাকে রাজি করান সেখানে ইস্পাত-শিল্প স্থাপন করতে। তা ছাড়া, দেশে বিজ্ঞানচর্চা এবং দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

প্রসন্নকুমারের নিকটাত্মীয় ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁরা দুজনেই বিয়ে করেছিলেন ব্রাহ্মনেতা দুর্গামোহন দাসের দুটি কন্যাকে। তা ছাড়া, জগদীশ বসু নিজেও ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের উৎসাহী সদস্য। বিজ্ঞান পড়ার অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেন তাঁর অধ্যাপক, ফাদার ইউজিন লার্ফোর কাছ থেকে। আর বিলেত যাওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। বস্তুত, এ ব্যাপারে পরিবারের তরফ থেকে তিনি এতোটাই উৎসাহ লাভ করেন যে, তাঁর মা নিজের অলঙ্কার বিক্রি করে তাঁর বিলেত যাওয়ার খরচ দিতে রাজি ছিলেন। বিলেত যান তিনি ১৮৮০ সালে।

পিতামাতার ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়ার জন্যে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিলো না। তা ছাড়া, লাশ কাটা তাঁর আদৌ ভালো লাগতো না। সে জন্যে এক বছর পরে তিনি তাঁর ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর পরামর্শে কেমব্রিজে গিয়ে ভর্তি হন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ার জন্যে। সৌভাগ্যক্রমে ক্রাইস্ট কলেজে পড়ার জন্যে তিনি একটি বৃত্তি লাভ করেন। তা ছাড়া, তখনকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড রেইলি তাঁর পৃষ্ঠপোষক হন। এখান থেকেই তিনি সম্মান-সহ বিজ্ঞানে ট্রাইপস উপাধি লাভ করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও বিএসসি পাশ করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে দেশে ফিরে তিনি প্রেসিডেন্সি

কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষকদের তুলনায় তাঁর যোগ্যতা বেশি থাকা সত্ত্বেও সরকার তাঁকে ইংরেজ অধ্যাপকদের তুলনায় কম বেতন দিতে চাওয়ায়, তিনি প্রতিবাদ করে প্রথম তিন বছর বেতন নিতে অস্বীকার করেন এবং তারপর সরকার তাঁকে ইউরোপীয়দের সমান মর্যাদা দিতে রাজি হয়। অবশ্য তখনকার মতো সমান মর্যাদা দিলেও বৈষম্য পরেও থেকে গিয়েছিলো। তাঁর অমন শিক্ষা এবং গবেষণা সত্ত্বেও ১৮৯৮ সালে তিনি ছিলেন চতুর্থ গ্রেডের অধ্যাপক।



জগদীশ বসু

জগদীশ বসু ভারতবর্ষের সবচেয়ে খ্যাতিমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক। তিনি প্রথমে পদার্থ বিজ্ঞান এবং তারপর উদ্ভিদ বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করেন এবং তাতে অসামান্য অবদান রাখেন। পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি আলোর রিফ্র্যাকশন, বৈদ্যুতিক চৌম্বক তরঙ্গ এবং বেতার নিয়ে গবেষণা করেন। মার্কনি এবং তিনি – এর মধ্যে কে আগে বেতার আবিষ্কার করেন, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বসে একে অন্যের গবেষণার খবর না-জেনেই বেতারের মূল সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সত্যি বলতে কি, কমবেশি একই সময়ে আরও কেউ কেউ এ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তবে যাকে এখন মাইক্রোওয়েভ বলা হয়, তা প্রথমে আবিষ্কার করেন জগদীশ বসু। দুঃখের বিষয়, কোনো গবেষণাই তিনি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাননি। পদার্থ বিদ্যায় তিনি যে-মৌলিক অবদান রাখেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালে তাঁকে ডিএসসি উপাধি দেয়। পরে তাঁকে সম্মানসূচক ডিএসসি উপাধি দিয়েছিলো আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়।

পদার্থ বিদ্যার নানা দিক নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি আগ্রহী হন উদ্ভিদ বিদ্যায়। এ বিষয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি রীতিমতো একটি নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর উদ্ভিদ বিদ্যার গবেষণা সেকালে এতো অভিনব ছিলো যে, বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী সবাই তাঁর প্রশংসা করেন। যেমন, নাট্যকার জর্জ বানার্ড শ তাঁকে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন,

তিনি কতো বড়ো বৈজ্ঞানিক এবং আরও কতো বড়ো হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাঁর মধ্যে। সে জন্যে তিনি বারবার তাঁকে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের আর-একটি অবদান হলো তিনি নিজেই একাধিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। যেমন, উদ্ভিদের বৃদ্ধির পরিমাপ করার জন্যে তিনি অতি সূক্ষ্ম একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। মোট কথা, তিনি এখনো পর্যন্ত বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান বিজ্ঞানী বলে সম্মান লাভ করতে পারেন।

তাঁর আরও একটা কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না-করলে তাঁর অবদানের প্রতি সুবিচার করা হয় না। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর অব্যক্ত গ্রন্থ এখনো একটি অসাধারণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়।

জগদীশ বসুর মতো বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করার জন্যে ১৮৮২ সালের অগস্ট মাসে বিলেতে যান প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর সহযাত্রী ছিলেন ডাক্তার দ্বারকানাথ রায়। প্রফুল্লচন্দ্র গিয়েছিলেন গিলক্রিস্ট বৃত্তি লাভ করে। তিনি অবশ্য ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান ছিলেন না। তবে তাঁর পিতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত জমিদার। পিতার বইপত্রের সংগ্রহও ছিলো খুবই উল্লেখযোগ্য। সেই গ্রন্থাগারেই বালক প্রফুল্লচন্দ্র লেখাপড়ার সত্যিকার আস্বাদ পেয়েছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গির উদারতাও লাভ করেছিলেন সেখানে। তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, বিজ্ঞানে তাঁর যে-আগ্রহ রয়েছে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে তাঁকে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর পিতামাতা — দুজনেরই উৎসাহ লাভ করেছিলেন। তিনি যখন লন্ডনে পৌঁছান, তখন জগদীশ বসু কেমব্রিজ থেকে এসে এবং চিত্তরঞ্জন দাশের বড়ো ভাই সত্যরঞ্জন দাশ তাঁকে স্বাগত জানান। এভাবে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তা ছাড়া, লর্ড সিনহা এবং তাঁর ভাই কর্নেল (ডাক্তার) আইপি সিনহা তাঁদের সমাদরের সঙ্গে ক দিন লন্ডন ঘুরে দেখিয়েছিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র অক্টোরব মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি রসায়নশাস্ত্রে প্রথমে বিএসসি এবং পরে ১৮৮৭ সালে ডিএসসি উপাধি লাভ করেন। ডিএসসি হওয়ার পরে তিনি অর্গানিক ক্যামিস্ট্রি নিয়ে আরও কিছু পড়াশোনা করে ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে লন্ডন ত্যাগ করে ইটালি হয়ে কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পরে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি আরও তিনবার বিলেতে যান।

প্রফুল্লচন্দ্রও জগদীশচন্দ্রের মতো দেশে ফিরে এসে ইংরেজদের বর্ণবৈষম্যের শিকার হন। সরকার প্রথমে তাঁকে চাকরি দিতেই রাজি হয়নি। তিনি প্রায় এক বছর বেকার ছিলেন। তারপর তিনি যদি বা প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে চাকরি পান, তবু সরকার তাঁকে ইউরোপীয়দের তুলনায় কম বেতন দেয়। ১৮৯৮ সালেও তিনি ছিলেন

প্রাদেশিক সার্ভিসের চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যাপক। বেতন চার শো টাকা। এই বৈষম্যে তিনি ক্ষুব্ধ এবং হতাশ হন। তাঁর প্রবল স্বাদেশিকতার অন্যতম কারণ হয়তো এই ক্ষোভ। জগদীশ বসুর মতো তিনিও নিজের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষ করে ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার বিকাশ এবং দেশীয় গাছগাছড়া দিয়ে ওষুধপত্র তৈরি করায় তিনি উৎসাহ দেখান। তিনিই প্রথম দেশীয়দের মধ্যে একটি রাসায়নিক কারখানা স্থাপন করে অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। স্বদেশী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।



প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১৮৮০-এর দশকের শুরু থেকে কৃষিবিদ্যা শেখানোর জন্যেও সরকার বৃত্তি দিতে আরম্ভ করে। এই বৃত্তি নিয়েই গিয়েছিলেন জ্ঞাত-অজ্ঞাত বেশ কয়েকজন বাঙালি। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা ছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮৭৮ সালে উদ্ভিদ বিদ্যায় এমএ পাশ করে গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ সালের ২১শে ডিসেম্বর স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে যান। বিলেত যাওয়ার পথে এবং সেখানে গিয়ে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, তিনি তার বিস্তারিত এবং সরস বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর একাধিক ভ্রমণকাহিনীতে। বিশেষ করে বর্ণনা দিয়েছেন পোশাক-আশাক, খানাপিনা, চলাফেরা, আচার-আচরণ এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার। তিনি লিখেছেন যে, বিলেতে রওয়ানা করার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়রা চোগা-চাপকান ছেড়ে কোট-প্যান্ট পরতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁদের পোশাকে এবং সে পোশাক পরার মধ্যে নানা রকমের খুঁত থেকে যায়। ফলে তা দেখে সাহেবরা নিজেদের মধ্যে 'টেপাটেপি' করেন। তাঁর মতে দেশীয় পোশাক পরলে তাতে কোনো অগৌরবের কারণ নেই, বরং তা গৌরবের বিষয়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, 'আজকাল' কেউ কেউ কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করার জন্যে বিলেতে আসছেন। এ থেকে মনে হয়, তখন সেখানে অন্য কোনো বাঙালি অথবা ভারতীয় কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন।

সে যাই হোক, পরের বছর তিনি সিসেস্টার কলেজ থেকে রয়্যাল এগ্রিকালচারাল

সোসাইটির এবং তার পরের বছর হাইল্যান্ড এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা ও ফেলোশিপ লাভ করেন। পরীক্ষায় প্রথম বছর তিনি প্রথম স্থান এবং দ্বিতীয় বছর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। বিলেত থেকে ফেরার আগে তিনি স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড ভ্রমণ করেন। তাঁর বিলেত গমন এবং প্রবাস জীবন নিয়ে তিনি *বিলাতের পত্র* নামে একটি বই লিখেছিলেন। সে পত্রগুলো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা, আমার জানা নেই। ১৮৮৪ সালের জুন মাসের চার তারিখে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন। তারপরে ভ্রমণ করতে যান ইউরোপে — ফ্রান্স, সুইৎজারল্যান্ড এবং ইটালিতে। তাঁর এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন *ইউরোপ ভ্রমণ* নামক আর-একটি গ্রন্থে। তাঁর ভ্রমণকাহিনী দুটো এতো কৌতুক এবং কৌতূহলপূর্ণ যে, সেগুলোর কয়েকটি সংস্করণ হয়েছিলো। প্রকাশের পর পরই প্রথম বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিলো। আর ১৯০৪ সালের মধ্যে *ইউরোপ-ভ্রমণে*র তিনটি সংস্করণ হয়। আসলে তিনি কৃষিবিদ হলেও কলমও চালাতে পারতেন সমান দক্ষতায়।

জগদীশ বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বসুর একটা জায়গাতে মিল লক্ষ্য করি — তিনিও চাকরির চেয়ে নিজের কাজকে বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বিলেতে গিয়েও বিলেতি না-হয়ে বরং স্বাদেশিকতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিলেতের ডিগ্রি নিয়ে তিনি অনায়াসে ডেপুটিগিরি-সহ ভালো একটা চাকরি পেতে পারতেন। কিন্তু তা না-করে তিনি স্বাধীনভাবে প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুল এবং পরে বঙ্গবাসী কলেজ স্থাপন করে সেখানে ৪৬ বছর অধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেন। স্বদেশের সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি দেশের লোকেদের কৃষিবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যা শেখানোর জন্যে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই দুই বিদ্যা শেখানো ছাড়াও, তিনি কৃষি ও উদ্ভিদ বিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ও ইংরেজিতে কৃষিবিষয়ক একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

স্বাদেশিকতা দিয়ে উদ্বুদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও হয়েছিলেন — তাঁর সাহিত্য থেকে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু তিনি বিলেতে যে-বিদ্যা শিক্ষা করেন তাকে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের মতো বাস্তবে প্রয়োগ করেননি। ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করে তিনি কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে। এ থেকে বোঝা যায়, বিদ্যা অর্জনের চেয়েও তাঁর বেশি আগ্রহ ছিলো বিলেত যাওয়ার প্রতি। ভালো ছাত্র হিশেবে কৃষিবিদ্যা শিখতে তাঁর অবশ্য কোনো অসুবিধে হয়নি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৮৮৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় ফিরে আসেন। কৃষিবিদ্যায় তাঁর আগ্রহ কতো কম ছিলো, তার একটা প্রমাণ এই যে, তিনি কৃষি বিভাগে যোগ না-দিয়ে দেশে ফেরার দুদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে কাজ শুরু করেন। বাকি জীবন তিনি এই পদেই

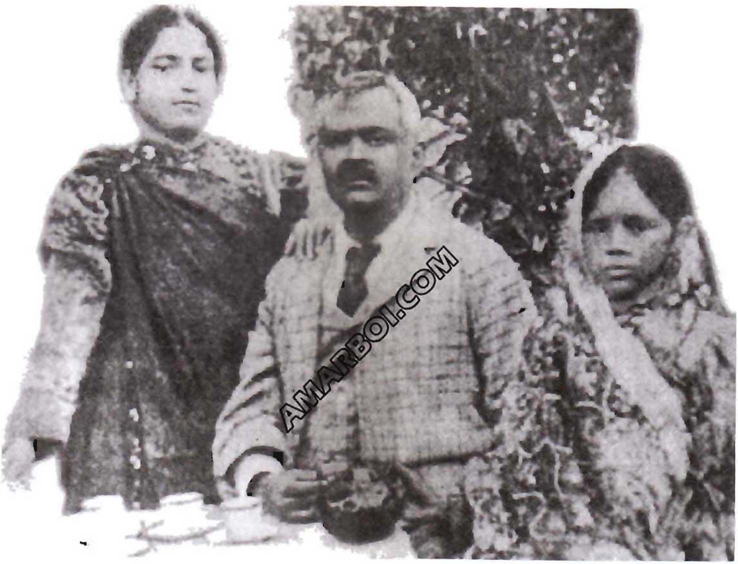
বহাল ছিলেন।

বিলেত থেকে শিখে আসা কৃষিবিদ্যা প্রয়োগ না-করলেও, সেখান থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য যা নিয়ে এসেছিলেন, তা কাজে লাগিয়েছিলেন সার্থকভাবে। পুঁথিগত বিদ্যার অতিরিক্ত তিনি নিয়ে এসেছিলেন সাংস্কৃতিক উপাদান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। বিলেতে যাওয়ার আগেই একটি কাব্য প্রকাশ করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, তিনি কেবল সাহিত্যের ছাত্র নন, তিনি সাহিত্যিক। এ ছাড়া, তাঁদের পরিবারে সঙ্গীতচর্চার চমৎকার পরিবেশ রচিত হয়েছিলো। তাঁর পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত, আদি পর্বে বঙ্গদেশে যাঁরা খেয়াল গানে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি সাহিত্যেও আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর আত্মজীবনী সরল এবং সাবলীল ভাষায় লেখা। বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল পারিবারিক সূত্র থেকেই সাহিত্য এবং সঙ্গীতের প্রতি সহজাত অনুরাগ এবং মেধা লাভ করেছিলেন।


দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিলেতে গিয়ে এই দুই বিদ্যায়ই তিনি নতুন তার সংযোজন করেছিলেন। সেখানে থাকার সময়ে সে দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড় হয়েছিলো। তা ছাড়া, তিনি নিজে ইংরেজিতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। এবং এই কবিতাগুলো একটি বই আকারে প্রকাশ করেন দেশে ফিরে আসার মাস দুয়েক আগে। বিলেতের একাধিক পত্রিকায় এই সংকলনের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো বলে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন। কিন্তু এর চেয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল লাভবান হয়েছিলেন সঙ্গীত এবং মঞ্চ-নাটক দিয়ে। পরবর্তী কালে তিনি বাংলা গানের প্রবাহে যে নিজের একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন, তার কারণ পিতা এবং ওস্তাদদের কাছ থেকে শেখা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একটি সূক্ষ্ম সমন্বয়ও ঘটিয়েছিলেন। সে কেবল তাঁর হাসির গানে অথবা কথাপ্রধান কাব্যসঙ্গীতে নয়, তাঁর অন্য গানে সুরেও তা লক্ষ্য করা যায়।

গানের থেকেও দ্বিজেন্দ্রলালের ওপর বেশি প্রভাব পড়েছিলো নাটকের। বিলেতে তিনি নাটক, অভিনয় এবং মঞ্চ-কৌশল কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ছিলো কলকাতায় তিনি যে-নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন, তার থেকে যথেষ্ট আলাদা এবং উন্নত। এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি এতোটাই অনুপ্রাণিত বোধ করেন যে, দেশে ফিরে এসে একের পর এক অনেকগুলো সফল এবং জনপ্রিয় নাটক লিখেছিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে একজন প্রধান



রোকেয়া ও সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন

ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দী চলে গেছে, তা সত্ত্বেও এখনো তাঁর নাটক পড়া হয় — মাঝেমধ্যে অভিনীতও হয়। বস্তুত, কৃষিবিদ্যা শিখে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল চাষ করেছিলেন কেবল সাহিত্য, সঙ্গীত এবং নাটকের জমি।

অন্য যাঁরা কৃষিবিদ্যা শিখেছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ যে ডেপুটি না-হয়ে কৃষির দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন — এমনটা জানা যায় না। তবে অন্তত একজন কৃষিবিদ্যার দিকে খানিকটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন — তিনি সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই তিনিও ডেপুটি হয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর কৃষিবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করলে সাখাওয়াত তাতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন।

সাখাওয়াত হোসেনের নাম আজও টিকে আছে — ঠিক নিজের কারণে নয়, বরং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী রোকেয়ার কারণে। রোকেয়াকে তিনি যখন বিয়ে করেন তখন রোকেয়া লেখাপড়া জানতেন, তবে খুব বেশি নয়। বিশেষ করে ইংরেজি জানতেন বলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সাখাওয়াত যত্নের সঙ্গে রোকেয়াকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। তা ছাড়া, লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। এমন কি, রোকেয়া যে নারীদের স্বাধীনতা এবং পুরুষের সমকক্ষতার কথা অমন জোরালো ভাষায় লিখতে পেরেছিলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার রশদ জুগিয়েছিলেন সাখাওয়াত। তিনি যখন বিলেতে ছিলেন, তখন মেয়েদের শিক্ষা, ভোটাধিকার এবং সমানাধিকারের জোরালো আন্দোলন চলছিলো। সেই আন্দোলন সাখাওয়াত কেবল কাছ থেকে লক্ষ্য করেননি, মনে হয়, তা দিয়ে আন্তরিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেই অনুপ্রেরণাই তিনি রোকেয়ার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। কেবল তাই নয়, আমার ধারণা, নারীমুক্তি-সংক্রান্ত নানা ধরনের ইংরেজি গ্রন্থের সঙ্গেও রোকেয়ার পরিচয় ঘটে স্বামীর দৌলতে। বিয়ের সময় রোকেয়ার বয়স ছিলো বছর ষোলো, আর সাখাওয়াতের স্যার্টিফিকেট অনুযায়ী বয়স ছিলো চল্লিশ। অর্থাৎ আসল বয়স হয়তো আরও বেশি ছিলো। তদুপরি বহুমূত্র রোগ ছিলো তাঁর। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিনি আগে বিয়ে করেছিলেন এবং সে পক্ষের প্রাপ্তবয়স্ক কন্যা ছিলো। তা সত্ত্বেও, আমার মতে, রোকেয়ার সৌভাগ্য যে, সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। তা না-হলে তাঁর সুপ্ত প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটতো কিনা, সন্দেহ হয়।

সাখাওয়াত হুগলি কলেজ থেকে ১৮৭৮ সালে বিএ পাশ করেন এবং ১৮৮৪ সালে সপ্তম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। মাঝখানকার কয়েক বছরের খবর আমার জানা নেই। আমার ধারণা তিনি স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে যান ১৮৮১ সালে। সেখানে কৃষি অধ্যয়ন করে রয়্যাল এগ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা লাভ করেন। গিরিশচন্দ্র বসু 'কেউ কেউ' কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করতে আসছেন বলে যাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি অথবা তাঁদের একজন হলেন সাখাওয়াত হোসেন।

সে যাই হোক, এ পর্যন্ত যাঁদের কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছাড়া অন্য সবাই যান বিজ্ঞান পড়তে — যার ব্যবস্থা স্বদেশে খুব কমই ছিলো। কিন্তু এর পর অনেকে যেতে আরম্ভ করেন সাহিত্য এবং মানবিক বিদ্যায় শিক্ষা নেওয়ার জন্যে। এমন কি, যাঁদের টাকাপয়সা ছিলো তাঁরা সাধারণ শিক্ষার জন্যেও বিলেত গিয়েছিলেন। যেমন আমরা আগেই দেখেছি, তারকনাথ পালিত শিক্ষার জন্যে তাঁর কন্যা লিলিয়ান, পুত্র লোকেন এবং স্ত্রীকে বিলেতে রেখে এসেছিলেন। তেমনি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিও তাঁর কমবয়সী ছেলেমেয়েদের একে-একে বিলেতে রেখে

এসেছিলেন সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মানুষ করবেন বলে। এই ধারাটি পরে ধীরে ধীরে জোরালো হয়েছিলো।

প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, শিক্ষার জন্যে না-হলেও অন্য কাজ নিয়ে অথবা ভ্রমণের জন্যে বিলেতে যাওয়ার ব্যাপারে গোড়াতে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অগ্রণী ছিলেন, কারণ কালাপানি পাড়ি দেওয়ার ফলে তাঁদের জাত যাওয়ার আশঙ্কা ছিলো না। কিন্তু রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, সূর্য গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ একবার কালাপানি পার হওয়ার বাধা দূর করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্যে হিন্দুরাই আগে বিলেত যেতে আরম্ভ করেন এবং তাঁরা যান প্রধানত লেখাপড়া শেখার উদ্দেশে। মুসলমানরা তখন থাকেন পিছিয়ে। কারণ ইংরেজি শিক্ষায়ই তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন। তবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব এবং সুফল সম্পর্কে একবার তাঁদের মধ্যে যখন সচেতনতা জেগে উঠলো, তখন অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরাও হিন্দুদের অনুকরণ করে বিলেত যেতে আরম্ভ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমনটা আগেই লক্ষ্য করেছি, ১৮৮০ সালে — একই বছরে — সাতজন মুসলমান ব্যারিস্টার হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, যে-মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিলো না, তাঁদের পক্ষে সাগর পাড়ি দেওয়া আদৌ সম্ভব ছিলো না। প্রথম দিকে যে-মুসলমানরা বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন জমিদার পরিবারের সন্তান অথবা অন্য কোনো সূত্রে ধনী।


আবদুর রসুল

এই অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে ১৮৬০-এর দশকে বিলেতের পথে যাঁরা সবার আগে যাত্রা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নাম পাওয়া যায় দুজন ডাক্তারের আর দুজন ব্যারিস্টারের। কিন্তু পরে কেউ কেউ সাধারণ লেখাপড়া শেখার জন্যেও বিলেতে যান — কারণ ততোদিনে বিলেত যাওয়াটা একটা মর্যাদার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ রকম যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের একজন আবদুর রসুল। তাঁর জন্ম ১৮৭২ সালে।

বিলেতে এসে তিনি কিছুদিন লিভারপুলে লেখাপড়া শিখে ১৮৮৮ সালে লন্ডনে আসেন এবং কিংস কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯১ সালে এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্যে। অক্সফোর্ড থেকে তিনি ১৮৯৬ সালে বিএ এবং ১৮৯৮ সালে এমএ পাশ করেন। সেখানে লেখাপড়া করার সময়ে ১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি লন্ডনের মিডল টেম্পলেও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ভর্তি হন। এই ইন থেকে তিনি ব্যারিস্টারি এবং বিসিএল পাশ করেন ১৮৯৮ সালে। তখনো অন্য কোনো বাঙালি আইনের ছাত্র বিসিএল ডিগ্রি লাভ করেননি। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার আগেই ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেন। আগে আমরা যেসব বিয়ের উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এই বিয়েটির একটি লক্ষণীয় পার্থক্য হলো চার্চের বদলে এ বিয়ে হয়েছিলো রেজিস্ট্রারের অফিসে। তার অর্থ বিয়ে করার জন্যে আবদুল রসুলকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়নি। এই স্ত্রী — কেইটকে — নিয়ে তিনি ১৮৯৮ সালের অগস্ট মাসে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

আবদুর রসুলের মতো এক অভিজাত পরিবারের সন্তান ছিলেন আবদুল করীম গজনভি। তাঁর পিতা ছিলেন দেলদুয়ারের জমিদার। তাঁর আর-এক পরিচয় — তিনি ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের বড়ো বোন করিমুন্নেসার পুত্র। আবদুল করিম চিকিৎসা বিদ্যা নয়, আইসিএস নয় এমন কি ব্যারিস্টারি নয়, সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ইউরোপে যান। ইটালি, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডে লেখাপড়া শিখে তিনি দেশে ফিরে আসেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে — ১৮৯৪ সালে। তাঁর ছোটো ভাই আবদুল হালিম গজনভিও লেখাপড়া শেখেন ইউরোপে। তিনিও দেশে ফিরে বড়ো ভাইয়ের মতো রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। পার্থক্য এই যে, বড়ো ভাই ছিলেন সরকার-ঘেঁষা আর ছোটো ভাই সরকারের সমালোচক। তবে তাঁদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কৌশল সত্ত্বেও দুজনই পরে নাইটহুড পান।

যাঁরা প্রথম দিকে বিলেতে গিয়েছিলেন — ভ্রমণ করার জন্যে অথবা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে — পথিকৃৎ হিশেবে তাঁরা সবাই উল্লেখযোগ্য তো বটেই, এমন কি প্রশংসার যোগ্য। এঁরা একবার নানা বাধা অতিক্রম করে পথ দেখানোর পর বহু লোকই বিলেত গিয়েছিলেন। ফলে কালে কালে বিলেত যাওয়াটা ডাল-ভাতের মতো সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৬০ সালের পর থেকে ছাত্রদের সংখ্যাও তাই দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ডেভিড কফের মতে, ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে প্রায় আট শো বাঙালি বিলেতে গিয়েছিলেন। এই তথ্য যাচাই করা হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। তবে ১৮৭০ সালের পর থেকে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বছরে বছরে তাবৎ ভারতীয় ছাত্রদের হিশেব প্রকাশ করতো। এই হিশেব থেকে দেখা যায়, ছাত্রদের

সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। নিচের তালিকা থেকে এই বৃদ্ধির মাত্রা লক্ষ্য করা যায়:

বছর	ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা
১৮৭৩	৪০-৫০
১৮৮০	১০০
১৮৮৫	১৬০
১৮৯০	২০০
১৮৯৪	৩০০-র বেশি
১৯০০	৩৩৬
১৯০৭	৭০০-৮০০
১৯১৩	১৭০০-১৮০০

এই ছাত্রদের মধ্যে বাঙালিদের অনুপাত কেমন ছিলো, তা জানা যায় অন্য একটি হিশেব থেকে।

বছর	১৮৮৫	১৮৮৭	১৮৯০	১৮৯৪
বঙ্গদেশ	৫৮	৫০	৫৩	১০০
বোম্বাই	৫৪	৪৯	৬৩	৯৮
মাদ্রাস	৪	৩	১৩	১৫

উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে ভারতবর্ষের তুলনায় তখন ইংল্যান্ড যে অনেক প্রশস্ত এবং উপযুক্ত জায়গা ছিলো, তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া, তখন বিলেত ঘুরে এলেও সেই ভ্রমণকারীরা সাধারণ মানুষের চোখে বিশেষ সম্মানের পাত্র বলে গণ্য হতেন। এমন কি, লেখাপড়া না-শিখে এলেও বিলেতফেরত উপাধিটা কৃতিত্ব এবং মর্যাদার বস্তু বলে বিবেচিত হতো। যাঁদের অর্থ সঙ্গতি ছিলো, তাঁরা তাই বিলেত যাওয়া এবং সেখানে লেখাপড়া শেখার স্বপ্ন দেখতেন। আগেই লক্ষ্য করেছি, লোকাচার অমান্য করে প্রথম দিকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম, খৃস্টান অথবা প্রগতিশীল হিন্দু। কিন্তু ধীরে ধীরে রক্ষণশীল হিন্দুরাও তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস কাটিয়ে উঠে বিলেত যেতে এবং সেখানে লেখাপড়া শিখে তার সুফল ভোগ করতে আগ্রহী হন। আগ্রহী হন অভিজাত মুসলমানরাও।

ডাক্তারি, আইন এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে সেকালে যাঁরা বিলেতে যেতেন, তাঁরা সাধারণত যেতেন দেশে ফিরে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বড়ো লোক হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু অসাধারণ উদ্দেশ্য নিয়েও কেউ কেউ অন্যান্য বিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতের পথে যাত্রা করেছিলেন। যেমন, শশীকুমার হেশ। তিনি গিয়েছিলেন চিত্রাঙ্কন শিখতে। তিনি খুব সুন্দর পোর্টরেইট আঁকতে পারতেন। তেমন একটি ছবি এঁকে তিনি মুক্তাগাছার জমিদারের অর্থানুকূল্যে ইউরোপে যান, ১৮৯০-এর দশকের

শেষ দিকে। তিনি প্রথমে ইটালি, তারপর জার্মেনির মিউনিখ এবং সবশেষে প্যারিসে ছবি আঁকা শেখেন। এর পর বিলেতের অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে যান লন্ডনে। সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্যারিসে থাকার সময়ে তিনি ১৯০০ সালে এক ফরাসি মহিলাকে বিয়ে করেন।

শিল্পকলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে কৌশল মুখার্জি বিলেতে গিয়েছিলেন ১৯১০ সালের দিকে। ফোটোগ্রাফি এবং ছাপার কাজ শিখতে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের পিতা, সুকুমার রায়, ১৯১১ সালে। তিনি সেখানে ছিলেন প্রায় দু বছর। এ ছাড়া, নানা কাজের সূত্রে বিশ শতকের গোড়ায় শত শত লোক বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন। এভাবে এক দিকে ইউরোপ যাত্রীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বৃদ্ধি পায় ইউরোপের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান।

বিলেতে বঙ্গমহিলা

আগেই লক্ষ্য করেছি, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে সবার আগে — ১৮৫৯ সালে — বিলেতে গিয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী, কমলমণি। স্বামী এবং সন্তানদের নিয়ে তিনি সেখানে বাস করেন পাঁচ বছরেরও বেশি। ১৮৬৫ সালের শেষ দিকে তিনি পরিবারের সঙ্গে দেশে ফিরে আসেন। তারপর মারা যান ১৮৬৯ সালে। এর পর (১৮৬৩-৬৬) সপরিবারে যিনি বিলেত এবং ফ্রান্সে বাস করেন তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। হেনরিয়েটা বাঙালি না-হলেও বাঙালি স্বামীর সূত্রে তাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় বৈকি! বিলেতযাত্রী তৃতীয় বাঙালি মহিলা হলেন ক্ষেত্রমোহিনী দত্ত। কমলমণি এবং ক্ষেত্রমোহিনীর লক্ষ্য অবশ্য এক ছিলো না। প্রথম জনের লক্ষ্য স্বামীর চিকিৎসা। অপর পক্ষে, দ্বিতীয় জনের লক্ষ্য ছিলো সন্তানদের শিক্ষা।

ক্ষেত্রমোহিনী ছিলেন বিলেত-প্রেমিক গোবিন্দচন্দ্র দত্তের স্ত্রী। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই সন্তানদের পুরোপুরি ইউরোপীয় করে তুলতে চেয়েছিলেন। এবং সে চেষ্টায় খানিকটা সফলও হয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন, মাইকেল এবং গোবিন্দচন্দ্র — তিনজনই ছিলেন সহপাঠী। তিনজনই আকণ্ঠ পান করেছিলেন ইংরেজি সভ্যতার রঙিন শরাব। প্রথম দুজনের পরে, কিন্তু অন্য বাঙালিদের তুলনায় সবার আগে সপরিবারে বিলেত গিয়েছিলেন গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। সম্ভবত তিনিও স্থায়ীভাবে বিলেতে থাকার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক সময়ে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন তিনি। বিশেষ করে ইংরেজিতে তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের *Captive Ladie* প্রকাশিত হওয়ার এক বছর আগেই তিনি *Cherry Stones* নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। *Blackwood Magazine*-এ এই কাব্যের সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিলো, যে-ম্যাগাজিনে কবিতা পাঠিয়ে স্বয়ং মাইকেল এবং তাঁর গুরু ডেভিড রিচার্ডসন হতাশ হয়েছিলেন।

গোবিন্দচন্দ্রের আর-এক পরিচয় তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক এবং বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষার অন্যতম প্রবর্তক রসময় দত্তের পুত্র। কিন্তু তিনি সবচেয়ে পরিচিতি লাভ করেন তাঁর দুই কৃতী কন্যা — অরু এবং তরু দত্তের কারণে। তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে, তিনি যে-ধরনের শিক্ষা তাঁর কন্যাদের দিতে চান, তার

ব্যবস্থা স্বদেশে নেই। আপাতদৃষ্টিতে সে জন্যেই ১৮৬৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে স্ত্রী ক্ষেত্রমোহিনী এবং দুই কন্যাকে নিয়ে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। সুতরাং বিলেত যাওয়ার জন্যে যে-টাকাপয়সার প্রয়োজন তা তাঁর ছিলো।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: যে-রসময় দত্ত ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী হিন্দুনেতা, অন্য ভাষায় রক্ষণশীল মানুষ, তাঁর সন্তান হিশেবে তিনি কি করে সপরিবারে বিলেত যেতে পারলেন। তার উত্তর অবশ্য আমাদের জানা আছে — তাঁর পিতা মারা যান ১৮৫৪ সালে এবং তারপর তাঁর জীবিত তিন ভাই-সহ গোবিন্দ দত্ত সপরিবারে খৃস্টান হন ১৮৬২ সালে। সে জন্যেই সমুদ্রযাত্রার ব্যাপারে যে-সামাজিক বাধা দেখা দিতে পারতো, তার মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে খৃস্টানি ছড়াচ্ছেন — এই অভিযোগে কলেজ থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে যাঁরা বাধ্য করেন, রসময় দত্ত ছিলেন তাঁদের একজন। অদৃষ্টের পরিহাস যে, তাঁর পুত্ররাই খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং রীতিমতো সাহেবী জীবনধারা বেছে নেন।



তরু দত্ত

গোবিন্দ দত্ত তাঁর পরিবার নিয়েপ্রথমে যান ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে। সেখান থেকে ইটালির নীসে। কয়েক মাস তাঁরা সেখানেই বাস করেন। অরু ও তরু উৎসাহের সঙ্গে এখানেই ফরাসি ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। তারপরেও তাঁরা প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে ফরাসি ভাষা শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। নীস থেকে প্যারিস হয়ে তাঁরা ১৮৭০ সালের দ্বিতীয় ভাগে ইংল্যান্ডে যান। সেখানে তাঁরা প্রথমে লন্ডন এবং পরে কেমব্রিজে বাস করেন। লন্ডনে থাকার সময়ে তাঁরা সাবেক ভাইসরয় লর্ড লরেন্স, সাবেক ছোটোলাট বার্টল ফ্রায়ার, সাবেক প্রধান বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান প্রমুখের কাছাকাছি আসেন। লেখক থ্যাকারের কন্যাদের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হয়। তাঁদের জ্ঞাতি ভাই রমেশচন্দ্র দত্ত তখন আইসিএস পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্যে লন্ডনে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও তাঁদের প্রায়ই দেখা হতো। তরু ও অরু দুই বোন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাদের লেকচারে উপস্থিত থাকতেন।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজে সে সময়ে ছাত্রীদের রীতিমতো লেখাপড়া শেখার অথবা পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি পাওয়ার কোনো অধিকার ছিলো না। সেই কারণেই তাঁরা সেখানকার ছাত্রী হতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তাঁরা দুজনই ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য ভালোই শিখেছিলেন। তা ছাড়া, তাঁরা কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বিশেষ করে ছোটো বোন তরু। দুর্ভাগ্যক্রমে দুজনই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্প বয়সে মারা যান। অরু মারা যান মাত্র বিশ বছর বয়সে, আর তরু একুশ বছরে।

গোবিন্দ দত্ত স্থায়ীভাবে ইংল্যান্ডে থাকতে চেয়েছিলেন কিনা, জানা যায় না। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে তিনি সপরিবারে ভারতে ফিরে যান ১৮৭৩ সালের শেষ দিকে – তাঁরা যাত্রা করেন সেপ্টেম্বর মাসে। কেন ফিরে যান, সে তথ্য জানা যায় না। তবে সন্তানদের স্বাস্থ্য একটা কারণ হতে পারে।



মেরী কার্পেন্টার, যিনি ভারতবর্ষের নারী এবং শ্রমিকদের কল্যাণ চেয়েছিলেন।

কোনো কাজে নয়, বরং কেবল দেশভ্রমণের জন্যে এবং নিজেদের চোখে বিলেত দেখার জন্যে যিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে প্রথম সেখানে যান, তিনি হলেন ব্রাহ্ম সামজের উৎসাহী নেতা, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেরী কার্পেন্টার যখন কলকাতায় এসেছিলেন, তখন শশিপদ এবং তাঁর স্ত্রী রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো। তাঁরা নারীশিক্ষার জন্যে একযোগে কাজও করেছিলেন। মেরীই তাঁদের বিলেতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন। ১৮৭১ সালের শেষ দিকে তাঁর নিমন্ত্রণে শশিপদ এবং রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ইংল্যান্ডের উদ্দেশে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন ১৯শে এপ্রিল। তার পর ১০ই অক্টোবর ব্রিস্টলে মেরী কার্পেন্টারের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের পুত্র অ্যালবিয়ন। পরের বছর তাঁকে নিয়ে পিতামাতা স্বদেশে ফিরে যান। বড়ো হয়ে এই সন্তান আইসিএস হয়েছিলেন এবং পিতা শশিপদের একটি জীবনী লিখেছিলেন।

শশিপদ ছিলেন মদ্যপান নিবারণী সভার উৎসাহী কর্মী। তিনি বিলেতে গিয়েও নানা

জায়গায় মদ্যপান বিরোধী বক্তৃতা করেন। তা ছাড়া, নারীশিক্ষার উৎসাহী কর্মী ছিলেন তিনি। স্ত্রী রাজকুমারীকে লেখাপড়া শিখতে তিনিই উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁকে ইংরেজিও শিখিয়েছিলেন যৎকিঞ্চিৎ। আশা করেছিলেন যে, বিলেতভ্রমণ তাঁকে আরও আধুনিক এবং উদার করে তুলবে।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত যাওয়ার তিন বছর পরে স্ত্রী এবং সন্তানদের রীতিমতো বিলেতি করে তোলার উদ্দেশে তাঁদের বিলেতে পাঠিয়েছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সন্তানরাই উচ্চশিক্ষা লাভ করেননি, তাঁরা নিজেরাও স্থায়ীভাবে বিলেতবাসী হয়েছিলেন। পরে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।



রাজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

উমেশচন্দ্রের তুলনায় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ যেমন বহু সামাজিক রীতিনীতিতে এবং নারীস্বাধীনতার ব্যাপারে কমবেশি রক্ষণশীল ছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ততোটাই উদার। তিনি তাঁর বালিকা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে কতোটা আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষিতা এবং আধুনিকা করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ জ্ঞানদাকে লেখা তাঁর পত্রাবলী। তিনি মনে করেছিলেন যে, স্ত্রীকে বিলেত নিয়ে গিয়ে সেখানকার শিক্ষা দিতে পারলে, তিনি মুক্তদৃষ্টি লাভ করবেন এবং স্বামীকে সত্যিকারের ভালোবাসতে পারবেন। তাই ১৮৬৩ সালে তিনি যখন লন্ডনে থেকে আইসিএস পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন, তখনই তিনি তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেন জ্ঞানদাকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে। আর জ্ঞানদাকে লিখেছিলেন বিলেত যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে, যেমন, মোজা এবং জুতো পরার অভ্যাস করতে। বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রনাথ এমন অসম্ভব প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু পরে দেশে ফিরে সত্যেন্দ্রনাথ সার্থকভাবেই জ্ঞানদাকে শিক্ষিত এবং আধুনিক করে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহে স্ত্রীকে রীতিমতো ইংরেজির চর্চা করতে হয়েছিলো। সত্যেন্দ্রনাথের চিঠিপত্র থেকে দেখা যায় কিভাবে তিনি প্রতি সপ্তাহে জ্ঞানদাকে লিখতেন, কোন বইটা পড়তে হবে, বইটা কোথায় পাওয়া যাবে, কাকে দিয়ে আনাতে হবে ইত্যাদি।

যেকালে মেয়েদের পক্ষে বাইরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিলো, সেই সময়ে — ১৮৬৪ সালে — সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে তাঁর কর্মস্থান আহমেদাবাদে নিয়ে যান। বোম্বাইকে এক পাশ্চাত্য প্রভাবিত পারসি পরিবারে রেখে তাঁকে আধুনিক চাল-চলন শেখান, কলকাতায় ফিরে জাহাজ থেকে গাড়িতে করে স্ত্রীকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতে ফেরেন এবং গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে অনুষ্ঠিত পার্টিতে নিজে না-গিয়ে স্ত্রীকে একাকী পাঠান। সেকালে এগুলো ছিলো লোকাচার-বিরোধী পদক্ষেপ এবং এগুলোর জন্যে তাঁর অনেক সমালোচনা হয়েছিলো। যেমন, মহিলাদের জন্যে তখন গাড়িতে চড়া ছিলো একেবারে নিষিদ্ধ। জ্ঞানদা গাড়িতে চড়ায় রীতিমতো হৈচৈ হয়েছিলো এবং খবরের কাগজে তার খবর বেরিয়েছিলো। এই অপরাধে দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পুত্রবধূর সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি।


জ্ঞানদানন্দিনী দেবী

পিতা রুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ এখানেই থেমে যাননি। কারণ তাঁর ধারণা ছিলো যে, মেয়েরা সত্যিকারের শিক্ষিত হতে পারে, স্বাবলম্বী হয়ে উঠলে। সে জন্যে তিন সন্তানকে নিয়ে তাঁকে তিনি বিলেতে পাঠান ১৮৭৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে। জ্ঞানদা সন্তানদের নিয়ে বাস করেছিলেন ফ্রান্স, লন্ডন এবং দক্ষিণ ইংল্যান্ডে। তাঁরা প্রথমে যান ফ্রান্সে। সেখানে ইন্দিরা দেবী এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে জ্ঞানদা নিজেও খানিকটা ফরাসি ভাষা শেখেন। তা ছাড়া, বিলেতে যাওয়ার পর ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। প্রায় আড়াই বছর বিদেশে থাকার পর ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

শিক্ষা এবং আধুনিকতা অর্জন করে জ্ঞানদা বাঙালি নারীদের কাছে পর্দাভাঙা, পোশাক-আশাক এবং আধুনিকতার অনেক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার বই *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women towards Modernization* গ্রন্থে।) সে দিক দিয়ে, বঙ্গদেশের নারীমুক্তির ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

প্রসন্নকুমার রায় এবং জগদীশচন্দ্র বসু বিয়ে করেছিলেন ব্রাহ্মনেতা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা দুর্গামোহন দাসের দুই কন্যাকে। এই দুই কন্যাই শিক্ষিত ছিলেন। আর প্রসন্নকুমার এবং জগদীশচন্দ্র যেমন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ছিলেন প্রগতিশীল। তা সত্ত্বেও বাঙালি নারীমুক্তির ইতিহাসে এঁরা সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদা দেবীর মতো বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারেননি। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জগদীশ বসুর স্ত্রী অবলা স্বামীর সঙ্গে একাধিকবার ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোমোহন ঘোষও সত্যেন্দ্রনাথের মতো স্ত্রীকে শিক্ষিত এবং আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। বিলেতে যাওয়ার আগে মনোমোহন যখন স্বর্ণলতাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র চার বছর। তবে বিয়ের পর সম্ভবত বাড়িতে থেকে সামান্য লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে বাস করার সময়ে মনোমোহন তাঁর বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা এবং নারী-স্বাধীনতার আদর্শ দেখতে পান। বিলেতে গিয়ে তাঁর সেই আদর্শ আরও জোরালো হয়। সেখান থেকেই তিনি নির্দেশ দেন স্ত্রীকে ভালো করে ইংরেজি শেখানোর জন্যে। বালিকা স্বর্ণলতাকে তখন কনভেন্টে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেন অভিভাবকরা। মনোমোহন এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি তাঁকে একেবারে বিলেতি পোশাক পরিয়ে মেম সাহেব করে গড়ে তোলার প্রয়াস পান। একাধিক বার তাঁকে নিয়ে বিলেতেও যান। ঠিক কখন তাঁরা বিলেতে যান এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পুত্র মহীমোহন ছিলেন কিনা, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি। মহীমোহন পরে আইসিএস হয়েছিলেন।



মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী, স্বর্ণলতা, বিলেতি পোশাকে

আগেই উল্লেখ করেছি, দেবেন্দ্রনাথ দাস ১৮৮২ সালে স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে নিয়ে বিলেতে যান। তাঁরা কলকাতা থেকে বিলেতের পথে পা বাড়ান ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ২৯ তারিখ বোম্বাই পৌঁছান। তারপর সেখান থেকে জাহাজে ওঠেন। কৃষ্ণভাবিনীর লেখা থেকে জানা যায় যে, তিনি বোম্বাইতে পৌঁছানোর আগেই পাশ্চাত্য পোশাক পরেছিলেন এবং বিলেতে থাকার সময়ও এই পোশাক পরতেন। তিনি লিখেছেন যে, তাঁকে দেখলে অন্যরা মেম সাহেব বলে ভ্রম করতে পারেন। তাঁরা ইটালি, সুইৎজারল্যান্ড এবং ফ্রান্স হয়ে ২০শে অক্টোবর তারিখে লন্ডনে পৌঁছান।

কৃষ্ণভাবিনী পথের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি ভালো ছিলো এবং তিনি ইতিহাস সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। স্বামী বিলেতে থাকায় কৃষ্ণভাবিনী ছ বছর তাঁর জন্যে কলকাতায় অপেক্ষা করেছিলেন। এ সময়ে স্বাভাবিকভাবেই বিলেত সম্পর্কে তাঁর মনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিলো। তিনিও বিলেতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার,
গোপনে রয়েছে এক আশালতা,
দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা,
যাইব যে দেশে বসতি উহার।
যাইব তথায় স্বাধীনতাদেবী,
বিরাজে যেথায় প্রতি ঘরে ঘরে...

বিলেতে গিয়ে তিনি সেখানে কেবল স্বাধীনতার বসতিই দেখেননি, দেখেছিলেন সমাজে নারীদের উন্নত অবস্থা এবং মর্যাদা। সেখানে বিদ্যার যে-ভোজ চলছে, তাতে তাঁর নিজের দেশের পুত্ররা অংশ নিতে পারেন, অথচ কন্যারা পারেন না — এটাকে তিনি সুবিচার হিশেবে মেনে নিতে পারেননি।

কত পুত্র তব বিদ্যা শিখিবারে,
যায় মা! ইংলণ্ডে ছাড়ি প্রিয়জনে,
কত জ্ঞানরত্নে নিজ নিজ মন;
মণ্ডিত করিয়া পুন আসে ফিরে।
কেন মোরা তবে হয়ে তব সুতা,
পারি না জননি! সে দেশে যাইতে,
বিদ্যা জ্ঞানধনে হৃদয় ভূষিতে,
দেখিয়া স্বাধীন ব্রিটন-দুহিতা!

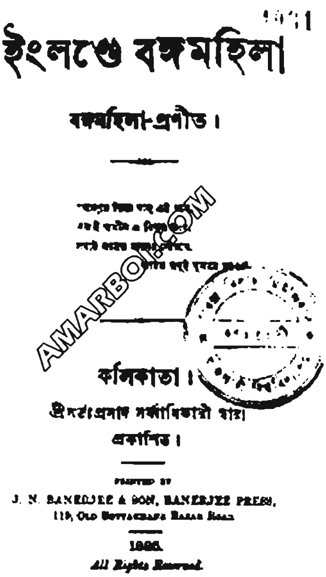
কৃষ্ণভাবিনী স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করতে বিলেতে যাননি। কিন্তু সেখানে গিয়ে সমাজ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে তাঁর মনে প্রবল বাসনা ছিলো। তিনি উপরের কবিতার শেষাংশে লিখেছেন যে, তিনি নিজের চোখে দেখতে চান কেন ব্রিটেন সবার কাছে এতো পূজ্য এবং কিভাবে অতো ছোটো দ্বীপ হয়েও ব্রিটেন জগতের রাজা।

দেখি ব্রিটনের ধর্ম্মনীতিচয়,
লিখিব হৃদয়ে প্রতি স্তরে স্তরে;
করিব যতন শিখিবার তরে
পারি যদি, ...

তাঁর এই আশা বিফলে যায়নি। তিনি কয়েক বছর ব্রিটেনে থেকে দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন সে দেশের শিক্ষা, সভ্যতা এবং সমাজ দিয়ে।

প্রথমেই তিনি অন্য ভ্রমণকারীদের মতো লন্ডন নগরী কতো বড়ো এবং কী সুন্দর, তা

দেখে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, পাতালরেল-সহ যানবাহনের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এসব ছাড়া, তিনি এমন কতোগুলো জিনিশের বর্ণনা দিয়েছেন, যা অন্যদের রচনায় পাওয়া যায় না। যেমন, পার্লামেন্টের নির্বাচন ব্যবস্থা, ইংল্যান্ডের গ্রামের জীবন, ইংরেজদের দৈনন্দিন জীবন ইত্যাদি। এমন কি, তিনি পত্রপত্রিকার কথাও লিখেছেন। কোন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কারা সেগুলো পড়েন, কেন পড়েন তিনি সে সম্পর্কেও উল্লেখ করতে ভুলে যাননি। এমন কি, রাস্তায় ফেরিওয়ালারা কী কী বিক্রি করেন, তা সবিস্তারে লিখেছেন। কিন্তু তার


ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা।

বঙ্গমহিলা-প্রণীত।

কলিকাতা।

প্রকাশিত।

J. N. BANERJEE & SON, BANERJEE PRESS,

All Rights Reserved.

চেয়েও অনেক বেশি মন্তব্য করেছেন ইংরেজদের চরিত্র সম্পর্কে। তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

> ইংরাজদের দেখিলেই বলিষ্ঠ, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়।... টাকা ইংরাজদের প্রধান আরাধ্য দেবতা। ... হিন্দুদের মত ইংরাজদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, কিন্তু এখানে ভয়ানক শ্রেণীভেদ দেখিতে পাই।... ইংরাজদের অন্তঃকরণে স্নেহ, মমতা, বিনয় ও দয়া দাক্ষিণ্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।...কি ধনী, কি দরিদ্র সকলেই যেমন উপার্জ্জন করে, তেমনি বা তাহার অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে, আর মদ্যপানে ইংরাজরা অদ্বিতীয়। ...এ জাতির মধ্যে অনেক ভণ্ড দেখিতে পাই। ... ইহাদের ভদ্র ব্যবহার অনেক সময়ে

কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। ... কোন ভিন্নাকৃতি [অর্থাৎ বিদেশী] লোক দেখিলে ইহারা তাহাকে জন্তু মনে করিয়া তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে ... ইংরাজরা মুখ বুজিয়া থাকিয়া কি সুখ পায়, তাহা বুঝিতে পারি না। ... কার্য্যক্ষমতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায়, তেজ, সাহস প্রভৃতি সদ্‌গুণ থাকাতেই এই জাতির এত সভ্যতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কর্ম্ম ইংরাজজীবনের সঙ্গীর মত ...ইংরাজরা যেমন স্বার্থপর, সেইরূপ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা করিতে জানে।... এই জাতির মধ্যে চমৎকার কর্ত্তব্যকর্ম্মের জ্ঞান দেখিতে পাই। ... ইংরাজরা অতিশয় বিদেশ-ভ্রমণ প্রিয়। ...

বিলেতের নারীদের তিনি কেবল কাছ থেকে লক্ষ্য করেননি, বরং তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। আসলে নিজের দেশের অশিক্ষিত এবং সামাজিক ভূমিকা-বর্জিত নারীদের সঙ্গে তুলনা করে তিনি ইংরেজ নারীদের অনেক শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছিলেন। তিনি তাঁদের শিক্ষা এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের বৃহত্তর ভূমিকার পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন, যদিও তিনি দেশীয় মূল্যবোধ দিয়ে তাঁদের বিচার করেছেন:

ইহারা অতিশয় কর্ম্মদক্ষ ও চতুর এবং অনেকে শিক্ষিত। এ দেশের পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও কখন কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা দেখায় না। ... আমাদের দেশের মত এখানে "বাহির" ও "ভিতর" বাড়ী নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকেদের বাড়ীর চারিদিক দেখাশুনা করিতে এবং কোন বন্ধু অথবা অভ্যাগত লোক আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। ... আমার মতে ইহারা বরং পুরুষদের যথার্থ অর্দ্ধাঙ্গ। এখানে স্ত্রীলোক সচরাচর যেরূপ পুরুষের সহায়তা করে ও অনেক সময়ে পুরুষের কাজ করিয়া থাকে, এরূপ আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ... আজকাল লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমান শিক্ষা পাইয়া থাকে। ... ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা বুদ্ধির প্রখরতায় পুরুষদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; ... অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কৃশাঙ্গী, এবং পুরুষদের ন্যায় কাজ ও পুরুষের সঙ্গে মিশামিশি করাতে ইহাদের শরীর পুরুষের মত অনেকটা লাবণ্যহীন। ... পোষাকের লালসা ইংরাজ মহিলাদের মনে একটা বিষম রিপুর মত হইয়াছে। ... ইংরাজ মহিলারা বিনয়বতী ও আতিথেয়ী নয়। ... ইহারা সময়ে সময়ে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। ইংরাজ মহিলারা জেলেদের মত বড় বড় স্থানে জাল পাতিয়া রাখে; মাছের মত পুরুষেরা একবার জালে আসিয়া পড়িলে আর নিস্তার নাই। ... এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা পুরুষের মধ্যে থাকিয়া, পুরুষের সহিত সমভাবে বেড়াইয়া ও আলাপ করিয়া নিজেদের অমূল্য ধর্ম্মরত্নকে না হারান, তাঁহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য ...। ইহারা ... পাগলের মত হইয়া পুরুষকে স্বর্গীয় দেবতা ভাবিয়া সর্ব্বদা প্রণয় ও সুখস্বপ্নের চিন্তা করে না। ...

ইংরেজদের বিবাহ পদ্ধতি এবং পারিবারিক জীবন যে বঙ্গদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভাবিনী তা বেশ উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন।

ইংলণ্ডে স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ কেহই নিজ ইচ্ছা ব্যতিরেকে কখন বিবাহ করে না, এবং এদেশীয় পিতামাতারাও কখন বলপূর্ব্বক বিবাহ দিয়ে পুত্রকন্যার জীবনে কণ্টক রোপণ

> করেন না। ... আমাদের দেশের মত ইংলণ্ডে ঘটক ও ঘটকালির ব্যবস্থা নাই, যুবক যুবতীরা নিজেই প্রণয়িনী ও প্রণয়ী জুটাইয়া লয়। ... আমাদের দম্পতির জীবন কি কষ্টকর তাহা বুঝিতে পারিলে মনে ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধ স্ত্রী, স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন কাটান, তাহা জানেন না, এবং স্ত্রী কিরূপে কালযাপন করেন তাহাও স্বামী জানেন না, বাবুর নামে বাড়ীর গৃহিণীরা ভয় পান। ... কোন কর্ম্ম করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী আগে স্ত্রীর পরামর্শ লন ও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে প্রভু না ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয় সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পান। এজন্য ইংরোজ পুরুষেরা গৃহে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুখ পান বলিয়া বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত হন না। এ কথায় ইংলণ্ডীয় স্ত্রী স্বামীর ডান হাত; ... স্ত্রীপুরুষে যথার্থ কি সম্বন্ধ তাহা আমাদের দেশের অতি অল্প লোকই বুঝেন। ...

কৃষ্ণভাবিনী ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে যে-শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাকে বার বার দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন। দেশের অনুন্নত অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর শিক্ষা তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে, বরং তাকে যদি দেশবাসীর কাছে ছড়িয়ে দিতে পারেন, তা হলে তা দিয়ে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসতে পারে। তাই সেখানে থাকার সময়েই তিনি *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা* নামে এই বই প্রকাশ করেন (১৮৮৫)। এ বই-এ তাঁর নাম ছিলো না। এ জন্যে সম্ভবত কারও জানা ছিলো না যে, লেখিকা কে। আমার ধারণা, *Reluctant Debutante* (১৯৮৩) গ্রন্থে আমিই প্রথম তাঁর পরিচয় তুলে ধরি। তাঁর গ্রন্থটি এখন সীমন্তী সেনের সম্পাদনায় নতুন করে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

কৃষ্ণভাবিনীই প্রথম বাঙালি নারী যিনি একটি ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সেখানকার সমাজ ও রাজনীতির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। দেশের অবস্থার সঙ্গে বিদেশের অবস্থা তুলনা করেন নিজেদের, বিশেষ করে মহিলাদের হীনাবস্থার সত্যিকার চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর আগে যে-বঙ্গমহিলারা বিলেত থেকে ফিরে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই কমবেশি আধুনিকতা নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী নিয়ে এসেছিলেন নারী-স্বাধীনতার ধারণা। দেশীয় নারীদের পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থার সঙ্গে বিলেতের নারীদের তুলনা করে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তিনি যখন সেখানে ছিলেন, তখন শিক্ষার অধিকার নিয়েতো বটেই, ভোটাধিকার নিয়েও নারীদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন চলছিলো। কৃষ্ণভাবিনী সেই আন্দোলনের কথা প্রথম বঙ্গদেশের নারীদের সামনে তুলে ধরতে চান। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক বছর পরে — ১৮৮৯/৯০ সালে দেশে ফিরে আসার পর থেকে তিনি যে-তিন দশক বেঁচে ছিলেন, তখন নানা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নারী-স্বাধীনতার সঙ্গে স্বদেশের নারীদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কেবল যে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি লিখতেন, তাই নয়, বরং তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে হাতে-কলমে কাজও করেন। তাঁর সম্পর্কে আমার *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির এক শো বছর* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

চার সন্তানকে নিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত বিলেতে যান ১৮৮৪ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁরা লন্ডনে পৌঁছান ২৫শে মে। আর লন্ডন থেকে দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন ডিসেম্বর মাসে। তার অর্থ তাঁরা সেখানে ছ মাসেরও বেশি ছিলেন। এ ছাড়া, ফ্রান্সেও গিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁর পরিবার ঘুরে বেড়াতে অতো আগ্রহী ছিলো না। ঘোরার জন্যে ব্যয়ও হচ্ছিলো প্রচুর। সে জন্যে পরিবার লন্ডনে রেখে রমেশচন্দ্র নিজে প্রায় আড়াই মাস ইউরোপ সফরে যান।

তাঁর পরিবার ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে যেমন প্রভাবিত হয়েছিলো, তেমনি প্রভাবিত হয়েছিলো পশ্চিমা জীবনযাত্রা এবং রীতিনীতি দিয়ে। বিশেষ করে তাঁর সন্তানরা খুব ভালো ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর চতুর্থ কন্যা সরলার পরে বিয়ে হয় এক আইসিএস কর্মকর্তা জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে। ইনি ১৯১১ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন এবং রচনাবলীর পরিচয় দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন লন্ডন থেকে। রমেশচন্দ্র যখন লন্ডনে যান, তখন তাঁর বন্ধু, সহপাঠী এবং সহকর্মী বিহারীলাল গুপ্তও সপরিবারে সেখানে ছিলেন। তিনিও ছিলেন দারুণ পাশ্চাত্য-প্রভাবিত তাঁর পোশাক, রুচিতে, এমন কি, খাদ্যাভ্যাসে। তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে অন্তত একজন — তাঁর কন্যা চারুলতাকে লন্ডনের স্কুলে শিক্ষা দিয়েছিলেন (১৮৯৩-৯৬)। ধারণা করি, তাঁর পুরো পরিবারই তখন সেখানে ছিলো।


রমেশচন্দ্র দত্তের চতুর্থ কন্যা সরলতা। এঁর সঙ্গে বিয়ে হয় আইসিএস জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্তের।

যে-বাঙালি মহিলারা কেবল বিলেতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট নারী হলেন কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবী। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো কুচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সঙ্গে। সেই সূত্রে তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণ জুবিলিতে যোগ দান করতে লন্ডনে যান ১৮৮৭ সালে। রানীর সঙ্গে দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন থেকে আরম্ভ করে অনেক ভারতীয় পুরুষেরই আগে দেখা হয়েছিলো, কিন্তু সুনীতি দেবীর আগে কোনো ভারতীয় মহিলার সাক্ষাৎ হয়েছিলো কিনা, সঠিক জানা নেই। সুনীতি দেবীকে দেখে ভিক্টোরিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁকে একটি সম্মানসূচক উপাধি দান করেন। সুনীতি দেবী এর পর আরও একাধিকবার বিলেতভ্রমণে যান। এভাবে স্ত্রীদের নিয়ে বিলেতে যাওয়া শতাব্দীর শেষ দুই দশকে রীতিমতো আভিজাত্যের প্রতীক এবং ফ্যাশানে পরিণত হয়।

বিহারীলাল গুপ্তের আইসিএস সহকর্মী ব্রজেন্দ্রনাথ দে যখন ছ পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রীকে নিয়ে বিলেতে লম্বা ছুটি কাটাতে যান ১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে, তখনও বিহারীলাল সপরিবারে সেখানে বাস করছিলেন। বস্তুত, এই দুই পরিবার কয়েক মাস একত্রে



সুনীতি দেবী, ১৮৮৭

বাস করেন। তা ছাড়া, বিহারীলালের পরিবার ব্রজেন্দ্রনাথের পরিবারের সঙ্গে প্যারিস ভ্রমণেও গিয়েছিলো। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর পরিবার নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে ইটালি হয়ে দেশে ফিরে আসেন। পথে জাহাজে তাঁর স্ত্রী এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন।

একই বছর ১৩ই মার্চ কলকাতা থেকে আর-এক ভদ্রমহিলা কোনো পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের পথে যাত্রা করেছিলেন, তাঁর নাম জগৎমোহনী চৌধুরী। তাঁর আগে এ রকম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া গিয়েছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আর হেমাঙ্গিনী দেবী। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে অন্তত তাঁদের ছেলেমেয়েরা ছিলো। জগৎমোহনী এ রকমের রীতিবিরুদ্ধ কাজ কী কারণে কেমন করে করলেন, তা বোঝা যায় তাঁর ভ্রমণকাহিনী *ইংলণ্ডে সাত মাস* থেকে (১৯০২)। তিনি ছিলেন অ-রক্ষণশীল একটি খৃস্টান পরিবারের এক বিধবা। তাঁর মায়ের অনুমতি নিয়ে বলতে গেলে ধর্মপ্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। ইংল্যান্ড দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তিনি সেখানকার ফল, ফুল, গাছপালা এমন কি মাছের সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করেছেন। ইংরেজি সভ্যতা এবং ইংল্যান্ডের সমাজ, বিশেষ করে মহিলাদের জীবনযাত্রা দেখে তিনি কতো বিস্মিত হয়েছিলেন, তাও তাঁর রচনা থেকে দেখা যায়।



কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

বস্তুত, বহু বাঙালি নারীই নানা কারণে উনিশ শতকের শেষের কয়েক দশকে বিলেতে গিয়েছিলেন। যাঁরা লেখাপড়া শিখতে যান, তাঁদের মধ্যে অরু এবং তরু দত্তকে বলতে পারি নিতান্তই ব্যতিক্রম। কারণ তাঁরা সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও একটা ধারার পত্তন করতে পারেননি। তাঁদের যেতে দেখে তক্ষুনি অন্য বাঙালি মেয়েরা বিলেতে যাওয়া শুরু করেননি — বেশির ভাগেরই সে সঙ্গতি ছিলো না, এমন কি, সাহসও ছিলো না লোকাচার অমান্য করার মতো। তা ছাড়া, মেয়েদের বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে পাঠানোর ব্যাপারে কেবল লোকাচারের বাধাই নয়, তার চেয়েও বড়ো বাধা আসতো অভিভাবক এবং আত্মীয়দের তরফ থেকে। নারীরা তখনও ছিলেন অবলা এবং অবোলা। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক পুরুষই নারীদের প্রতি অশালীন ব্যবহার করতেন। ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ডাক্তার আনন্দবাই যোশী যখন বিদেশে পড়তে যান, তখন সমস্ত পথ তাঁকে অনেক অশালীন আচরণ এবং অপমানের শিকার হতে হয়েছিলো। জাহাজে তিনি নিজের ঘরে বলতে গেলে পুরোটা সময়ই নিজেকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এসব কারণে মহিলাদের নিজেদের মনেই যথেষ্ট সংকোচ এবং ভয় ছিলো। অন্তত বর্তমান যুগের মতো আত্মবিশ্বাস তাঁরা অর্জন করেননি। এসব

কারণে কেবল উনিশ শতক নয়, বিশ শতকেও যে-দুঃসাহসী নারীরা উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে গেছেন, তাঁদের সাধারণ না-বলে অসাধারণ বলাই সঙ্গত।

তবে নানা রকমের বাধা সত্ত্বেও শুধু লেখাপড়া করার উদ্দেশে বাঙালি নারীরা বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন ১৮৯০-এর দশক থেকে। এ রকমের একজন ছিলেন ডাক্তার — কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবি পরীক্ষা দিলেও মেডিসিনে এক মার্ক কম পাওয়ায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। তবে তাঁকে জিবিএমসি (গ্র্যাজুয়েট বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ) উপাধি দেওয়া হয়েছিলো। সেই সুবাদে তিনি ডাক্তারি করতেন। ডাক্তার হিশেবে তিনি নামও করেছিলেন। কিন্তু এমবি প্যাশ করেননি বলে অনেকে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান জানাতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের একটা অংশ তো রীতিমতো তাঁর শত্রুতা করতেন। তিনি বিশেষ বিবেচনায় ডাক্তার হয়েছেন — অনেকটা এই নিন্দা ঘোচানোর জন্যেই তিনি স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ডে গিয়ে এডিনবরা, গ্লাসগো এবং ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনটি ডিপ্লোমা করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি বিলেত যাত্রা করেন ১৮৯৩ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি। তখন তাঁদের পারিবারিক বন্ধু মনোমোহন ঘোষ লন্ডনে ছিলেন। সম্ভবত তিনি বিলেত যেতে তাঁকে সাহায্যও করেছিলেন। ঐ বছরেরই শেষ দিকে কাদম্বিনী দেশে ফিরে আসেন।



যামিনী সেন

বাঙালি মহিলা ডাক্তারদের মধ্যে এর পর বিলেত যান কবি কামিনী রায়ের ছোটো বোন যামিনী সেন। কিন্তু সেটা ঘটতে আরও প্রায় দু দশক অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। তিনি গিয়েছিলেন ১৯১১ সালের মার্চ মাসে। সেখানে গিয়ে তিনি লেখাপড়া শেখেন আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে। বিশেষ করে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি যে

ফেলো অব দ্য রয়্যাল ফ্যাকাল্টি অব স্যর্জনস অ্যান্ড ফিজিসিয়ানস (এফআরএফএসপি) উপাধি লাভ করেন, সেটা ছিলো বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় — কারণ তখন পর্যন্ত কোনো বাঙালি দূরে থাক, কোনো বিলেতি মহিলাও এ উপাধি লাভ করেননি। চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি যামিনীর আগ্রহ আন্তরিক ছিলো। তাই তিনি এ ক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি দেখার এবং অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে অতঃপর জার্মেনিতে যান।


সরোজিনী নাইডু

অন্য যে-নারীরা প্রথম দিকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে বিলেত যান, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন সরোজিনী নাইডু (চট্টোপাধ্যায়)। তাঁর জন্ম (১৮৭৯) পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থল হায়দারাবাদে। ১৮৯৫ সালে ভালো ছাত্রী হিশেবে নিজামের বৃত্তি পেয়ে তিনি প্রথমে কিংস কলেজ এবং পরে কেমব্রিজের গ্যর্টন কলেজে লেখাপড়া শেখেন। আগেই দেখেছি, এই কলেজে শিক্ষা লাভ করেছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির কন্যা নলিনী। সরোজিনী দেশে ফিরে আসেন ১৮৯৮ সালে। বিলেতে তিনি কেবল লেখাপড়া শেখেননি, সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তিনি পরে ইংরেজিতে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তবে কবির চেয়েও তিনি বেশি খ্যাতি লাভ করেন তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকার জন্যে। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিলো রীতিমতো উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভাগের পর তিনি রাজ্যপাল হয়েছিলেন।

কয়েক বছর পরে তাঁর ছোটো বোন মৃণালিনীও কেমব্রিজে পড়তে যান। তিনি ট্রাইপস লাভ করেন দর্শনশাস্ত্রে। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই এ বিষয়ে প্রথম ট্রাইপস। এ ছাড়া, শিক্ষকতা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলেন সরলাবালা মিত্র। বেথুন থেকে বিএ পাশ করে তিনি ইংল্যান্ডে মেরিয়া গ্রে ট্রেনিং কলেজে লেখাপড়া শেখেন। সরোজিনী দাস গিয়েছিলেন ১৯০৮ সালে। তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন কেমব্রিজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর এক দশক পরে রাজকুমারী দাস লেখাপড়া শিখতে যান লন্ডন ডে ট্রেনিং কলেজে। মুসলমান নারীদের মধ্যে কে অথবা কারা প্রথম বিলেতে লেখাপড়া শিখতে যান, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি। তবে পূর্বোক্ত নারীদের অনেক বছর পরে ১৯২৮/২৯ সালে গণিত অধ্যয়ন করতে বিলেতে গিয়েছিলেন ফজিলতুন্নেসা — এটা জানা যায়।

১৯০০ সালে — আর-একজন নারী বিলেতে গিয়েছিলেন এক অসাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে — দেশভ্রমণের জন্যে নয়, সেখানে বসবাস করার জন্যে নয়, এমন কি, লেখাপড়া শেখার জন্যেও নয়। অতুলপ্রসাদ সেন প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর বড়ো মামা আইসিএস কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের মেয়ে হেমকুসুমের সঙ্গে। তখনকার ভারতীয় আইন অনুযায়ী তিনি এঁকে বিয়ে করতে পারেননি। তাই তাঁকে বিয়ে করার জন্যে বিলেতে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করেন যে, বিলেতি আইন অনুসারেও তিনি 'কাজিন' বিয়ে করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের একটি বিশেষ গ্রামে গিয়ে সেই গ্রামের স্থানীয় নিয়ম মেনে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন মা এবং মামা-সহ অন্য সব আত্মীয়দের বিরোধিতার মুখে। সে জন্যে বিয়ের অব্যবহিত পরে তিনি দেশে ফিরে আসেননি। বিলেতেই ব্যারিস্টারি করতে থাকেন। তবে আইন ব্যবসায় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে না-পেরে ১৯০২ সালে তিনি স্ত্রী এবং এক সন্তানকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তখনো তাঁর আত্মীয়রা তাঁর বিরোধিতা করতে থাকেন।

বিলেতভ্রমণ, বিলেতদর্শন

এক সময়ে বিলেতে যাওয়া ছিলো খুবই অসাধারণ ঘটনা, দারুণ খরচের ব্যাপারও। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা শখ করে যাননি, প্রায় সবাই গিয়েছিলেন লেখাপড়া করতে। কিন্তু ১৮৭০-এর দশক থেকে আমরা কাউকে কাউকে যেতে দেখি শুধুমাত্র বিলেতভ্রমণ করার জন্যে। কেউ কেউ গিয়েছিলেন বিলেতের অভিজ্ঞতা লাভ করে সমাজ-সংস্কার করার জন্যে। এমন কি, কেউ কেউ যান সেখানে সমাজ-সংস্কারের কাজ করা অথবা ধর্ম প্রচার করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, আনন্দমোহন বসু-সহ পাঁচজন যুবককে সঙ্গে নিয়ে কেশবচন্দ্র ইংল্যান্ডে এসেছিলেন ১৮৭০ সালের মার্চ মাসে। কলকাতায় তিনি ফিরে যান সাত মাস পর ২০শে অক্টোবর। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিলেতি সমাজে তিনি রীতিমতো খ্যাতি অর্জন করেন। ম্যাক্স মূলার, জন স্টুয়ার্ট মিল, উইলিয়াম গ্লাডস্টোন, লর্ড লরেন্স, মেরী কার্পেন্টার এবং ঐতিহাসিক সীলির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গেও তিনি দেখা করেন ১৩ অগস্ট। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে মেরী কার্পেন্টার ব্রিস্টলে যে-সভায় ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন সে সভায় বিশেষ অতিথি হিশেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। তা ছাড়া, তখনকার নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ফ্রান্সিস কোব, এলিজাবেথ ম্যানিং এবং মিলিসেন্ট ফসেটের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। কেশবের বক্তৃতায় ভারতে নারীদের দুরবস্থার কথা শুনে তাঁরা বিশেষ সমবেদনা দেখিয়েছিলেন।

কেশব অসংখ্য জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি চার্চে বহু ভাষণ দিয়েছিলেন ধর্মবিষয়ে। এক দিকে, তাঁর ধারালো চেহারা যেমন অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলো, তেমনি অন্যদিকে সঠিক উচ্চারণে ও শুদ্ধ ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেও তিনি তাঁর শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিলেন। বিলেতে তিনি ছিলেন সাত-আট মাস, কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতে সম্ভবত কোনো বাঙালি এতো ব্যাপকভাবে পরিচিত হননি। ম্যাক্স মূলার তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে, ভিক্টোরীয় ব্রিটেনে কেশব সেনের নাম ঘরে ঘরে শোনা যেতো। ধারণা করি, রামমোহন রায়ও এতো ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেননি। অবশ্য তার কারণও আছে। রামমোহন যখন বিলেতে আসেন, তখন ভারত সম্পর্কে বিলেতবাসীর জ্ঞান এবং আগ্রহ খুবই সীমিত ছিলো। বেশির ভাগ লোক ভারতীয় দেখেনওনি। অপর পক্ষে, কেশব সেন আসেন তাঁর

চল্লিশ বছর পরে। ততোদিনে ভারত সম্পর্কে ইংরেজদের একটা অনুকূল ধারণা তৈরি হয়েছিলো। অনেকে ভারতীয়দের দেখেওছিলেন খানিকটা সম্মানের চোখে।

তাঁর বক্তৃতায় একজন নারী — অ্যানেট অ্যাক্রয়েড — বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্তুত এতো প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি ভারতের নারীদের অবস্থা উন্নত করার



ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট নেতা, কেশবচন্দ্র সেন

জন্যে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্যে একটি স্কুল খুলেছিলেন ১৮৭৩ সালে। এর অল্পকাল পরেই হেনরি বিভারিজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের বিখ্যাত পুত্র লর্ড বিভারিজের জন্ম রংপুরে।

কেশবচন্দ্র সেন ছাড়া ব্রাহ্ম সমাজের অন্য একাধিক নেতা বিলেতে এসেছিলেন

অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে, এমন কি, ধর্ম প্রচার করার জন্যে। এঁদের সবচেয়ে প্রধান হলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বিপিনচন্দ্র পাল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তিনবার বিলেত এবং ইউরোপভ্রমণে গিয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি বিলেত থেকে অ্যামেরিকায়ও ধর্মসম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী বিলেত গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ এবং নারী জাগরণের অন্যতম নেতা দুর্গামোহন দাসের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন পার্বতীচরণ রায়। এঁরা তিনজন মিলে রওয়ানা করেন ১৮৮৮ সালের ১৫ই এপ্রিল। ১৯শে মে লন্ডনে পৌঁছে শিবনাথ সেখানে ছ মাস ছিলেন। তিনি নভেম্বর মাসে ফিরে আসেন। তবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় পার্বতীচরণকে নিয়ে দুর্গামোহন আরও আগে দেশে ফেরেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লন্ডনে গিয়ে কেশবচন্দ্র সেন এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মদ্যপান-বিরোধী প্রচার করেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর আগেকার ভ্রমণকারীরা যেমন লন্ডন দেখে তার সৌন্দর্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের কাহিনীতে তার বর্ণনা দিয়েছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী লন্ডন নগরী দেখে তাঁর আত্মচরিতে সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। বরং মদ্যপায়ী এবং নারীদের উচ্ছৃঙ্খলার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের চরিত্রের নানা দিকের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।



বিপিনচন্দ্র পাল

বিলেতের শিক্ষা দিয়ে তিনি কতোটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই লিখেছেন তাঁর ডায়রিতে। দেশে ফেরার পথে তিনি লেখেন:

> যতই বাড়ির দিকে যাইতেছি, ততই দেশের দুর্ভিক্ষ, প্রজাদের দারিদ্র্য, অভাবের কথা মনে হইয়া প্রাণ বিষণ্ন হইতেছে। আবার গিয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি, অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল বিলেতে যান শিবনাথ শাস্ত্রীর দশ বছর পরে, ১৮৯৮ সালে। তিনি

সেখানে বছর খানেক ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। দ্বিতীয়বার তিনি বিলেতে যান ১৯০৮ সালে, ধর্ম শিক্ষা অথবা ধর্ম প্রচারের জন্যে নয়, বরং রাজনীতির বার্তা নিয়ে। তিনি বিলেতে *Swaraj* এবং *Indian Student* নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বছর তিনেক পরে দেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনার জন্যে গ্রেফতার হন। ১৯১৯ সালে তিনি তৃতীয়বার বিলেতে যান কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিশেবে।


স্বামী বিবেকানন্দ

জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একাধিকবার বিলেতে গিয়েছিলেন। প্রথমবার যান অ্যামেরিকা থেকে। ১৮৯৩ সালের ৩১শে মে তিনি জাপান হয়ে অ্যামেরিকার পথে যাত্রা করেন এবং ১৪ই জুলাই গিয়ে ক্যানাডার পশ্চিম উপকূলের শহর ভ্যাঙ্কুভারে পৌঁছান। শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম সম্মেলনের বক্তৃতায় তিনি তাঁর বাগ্মিতা এবং ধ্যানধারণা দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। এর পর তিনি অ্যামেরিকার যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই উষ্ণ সংবর্ধনা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি নিউ ইয়র্ক-সহ একাধিক জায়গায় ভারতীয় দর্শন এবং যোগ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দান করেন ১৮৯৫ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। ঐ বছরের গরমের সময়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান। সেখানেও তিনি ভক্তদের কাছে বক্তৃতা দেন এবং নিয়মিত শিক্ষা দান করেন। ডিসেম্বরে তিনি অ্যামেরিকায় ফিরে গিয়ে এপ্রিল পর্যন্ত সেখানে থাকেন। তারপর তিনি আবার ইংল্যান্ডে এসে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। এর পর তিনি ইটালি হয়ে স্বদেশে ফিরে যান।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্যে অ্যামেরিকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইংল্যান্ড হয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি সেখানে সপ্তাহ দুয়েক ছিলেন। পরের বছর জুলাই

মাসে তিনি প্যারিসের ধর্মসম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে আবার ইউরোপে ফিরে আসেন। প্রায় তিন মাস প্যারিসে থাকার পর অস্ট্রিয়া, গ্রীস, তুরস্ক এবং মিশর হয়ে ভারতে ফিরে যান। যাবার পথে তিনি যে-ডায়রি লেখেন, তাতে যেমন ইতিহাস এবং ধর্ম সম্পর্কে তাঁর অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা আছে, তেমনি আছে একজন জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের প্রশংসা এবং সমালোচনা। কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে যেমন অ্যানেট অ্যাক্রয়েড একেবারে বঙ্গদেশে চলে এসেছিলেন নারীমুক্তির আদর্শ বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন মার্গারেট নোবল্‌। তিনিও ভারতবর্ষে এসে সিস্টার নিবেদিতা নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং বিবেকানন্দের আদর্শ প্রচারে আত্মনিবেদন করেন।

আত্মপরিচয়ের সংকটে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কখনো কট্টর হিন্দু, কখনো খৃস্টান হয়েছিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে তিনিও বিলেতে এসেছিলেন ইটালি হয়ে। তিনি লন্ডনে পৌঁছান ১৯০২ সালের নভেম্বরে। তখনো তিনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক। ইটালিতে চিত্রকলা এবং স্থাপত্য দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বিলেতে এসেছিলেন ভারতীয় দর্শন প্রচার করতে। লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডে গিয়ে তিনি প্রাচ্যদর্শনের ওপর কয়েকটি বক্তৃতা করেন। এর পর লন্ডনে এবং কেমব্রিজে তিনি ভারতীয় তথা হিন্দু দর্শন সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। বিশেষ করে কেমব্রিজে তাঁর ভাষণ সমাদর লাভ করেছিলো। কয়েক মাস বিলেতে থেকে তিনি নাকি জাতিভেদ প্রথা কতো ভালো এটা উপলব্ধি করেন। এই নবলব্ধ ধারণা নিয়ে তিনি পরের বছর জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং অত্যুৎসাহের সঙ্গে হিন্দুত্ব প্রচার করতে আরম্ভ করেন।

খৃস্টধর্ম প্রচার করার জন্যেও কেউ কেউ বিলেত এবং অ্যামেরিকায়ও গিয়েছিলেন। যেমন, রেভারেন্ড গাঙ্গুলি অ্যামেরিকা হয়ে বিলেতে আসেন ১৮৬০ সালে। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির জ্ঞাতি ভাই রেভারেন্ড পিট ব্যানার্জি বিলেতে এসেছিলেন ১৯১১ সালে। এখানে তিনি ৩৫ বছর ধর্মযাজকের কাজ করেন। কিন্তু তাঁর পুত্র স্টিফেন ব্যানার্জি ধর্ম প্রচার না-করে বরং যোগদান করেন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে।

সরকারী কাজেও কেউ কেউ বিলেতে যেতে আরম্ভ করেন। এ রকমের কাজে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি কলকাতার জাদুঘরে কাজ করতেন এবং জাদুঘরের একাধিক ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি ১৮৮৬ সালের গোড়ার দিকে বিলেতে গিয়েছিলেন। এ সময়ে সরকারী উদ্যোগে লন্ডনে 'এম্পায়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়ান একজিবিশন' নামে যে-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় তাতে ভারতীয় জিনিশপত্রের একজন বিশেষজ্ঞ হিশেবে তাঁকে সরকারের তরফ থেকে পাঠানো হয়।

এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ দশ মাশ লন্ডনে ছিলেন। এখানে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, বর্ণবাদী অভিজ্ঞতাও। প্রদর্শনীর কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি স্কটল্যান্ডে বেড়াতে যান। তারপর হল্যান্ড, বেলজিয়াম, জার্মেনি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং ইটালি হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এর অল্পদিন পরে তিনি তিন সপ্তাহের জন্যে দ্বিতীয়বার বিলেতে যান সরকারী কাজে। তাঁর বিলেতভ্রমণ নিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন ১৮৮৯ সালে।



১৮৮৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার অ্যান্ড ইন্ডিয়ান একজিবিশন।

কেবল দেশভ্রমণ উপলক্ষেও তখন কেউ কেউ বিলেতে গিয়েছিলেন। যেমন চন্দ্রশেখর সেন। তিনি ছিলেন এক বর্ণাঢ্য চরিত্রের মানুষ। একে-একে তিনি শিক্ষকতা, ডাক্তারি এবং ব্যারিস্টারি করেছিলেন। কিন্তু বারবার পেশা বদল করলেও তাঁর সম্ভবত নেশা ছিলো একটাই — দেশভ্রমণ। সেই নেশা নিয়েই তিনি বিশ্বভ্রমণে বের হন ১৮৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে। লন্ডনে এসে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে আরম্ভ করেন এবং ৯১ সালের মে মাসে ব্যারিস্টার হিশেবে উত্তীর্ণ হন। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি

বিশ্বভ্রমণের পথে ফ্রান্সে যান। তারপর গ্রীস, ইটালি, নরোয়ে, সুইডেন, রাশিয়া, জার্মেনি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, সুইৎজারল্যান্ড-সহ গোটা ইউরোপ, এমন কি, অ্যামেরিকা, উত্তর আফ্রিকা, জাপান, চীন ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটি বড়ো বই আকারে। *ভূপ্রদক্ষিণ* নামে এই বইটিতে তিনি যেসব জায়গা দেখেছিলেন, তার বেশ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এমন কি, মাঝেমধ্যে রাগ-তালসহ গানও উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু এর মধ্যে নিজের কথাসহ ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে গেলে কোনো তথ্যই নেই। বলা যেতে পারে এ বইটি অনেকটা ভূগোল বইয়ের মতো।

গোষ্ঠবিহারী দত্ত ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কাজ করতেন কলকাতার বেঙ্গল থিয়েটারে। সেই একই থিয়েটারে অভিনয় করতেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী সুকুমারী। গোষ্ঠবিহারী তাঁর প্রেমে পড়েন। ঐ থিয়েটারের একজন প্রধান পরিচালক ছিলেন নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে সুকুমারীকে বিয়ে করেন গোষ্ঠবিহারী। কিন্তু গোষ্ঠবিহারী ছিলেন 'ভদ্রলোকের' ছেলে। অপর পক্ষে, সুকুমারী ছিলেন খুব সম্ভব রূপজীবিনীর কন্যা। সুতরাং এ বিয়ে রীতিমতো একটা সামাজিক কেলেঙ্কারীতে পরিণত হয়। গোষ্ঠবিহারী সেটা সহ্য করতে না-পেরে জাহাজের লস্কর হয়ে বিলেতে পালিয়ে বাঁচেন। বিলেতে এসে তিনি কোনো কাজ পেয়েছিলেন কিনা, অথবা কী কাজ পেয়েছিলেন, তার কোনো তথ্য জানা যায় না। তিনি হারিয়ে যান।

কাজের খোঁজে আর একজন বাঙালি এসেছিলেন, যিনি পরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর নাম কর্নেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি বর্ণাঢ্য চরিত্রের মানুষ ছিলেন। খুব সম্ভব জাহাজের লস্কর হিশেবেই লন্ডনে এসেছিলেন ১৮৭৮ সালে। তিনি যেভাবে বিচিত্র কাজের মধ্য দিয়ে এ দেশে টিকে থাকেন, তা অসাধারণ। মাইকেল ফিশার লিখেছেন যে, সুরেশচন্দ্র প্রথমে আসার পরে থাকার কোনো জায়গা পাননি। খোলা আকাশের নিচে ঘুমাতেন তিনি। তারপর থাকার জায়গা আর ছোট্টো একটা কাজ পান এক খবরের কাগজ বিক্রেতার কাছে। কিন্তু সে কাজও বেশি দিন করতে পারেননি। তারপরে তাঁকে যা করতে হয়, তাকে সোজা বাংলায় বলা যেতে পারে, কুলিগিরি। তবে খুব মিতব্যয়িতার মধ্য দিয়ে তিনি কিছু টাকাপয়সা সঞ্চয় করেন। এ সময়ে এক বিবাহিতা মহিলা এই তরুণের প্রেমে পড়েন। তখন সুরেশচন্দ্র বাধ্য হয়ে লন্ডন ত্যাগ করে মফস্বলে গিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করেন। তিনি ভারতীয় পুরোনো এবং দুর্লভ জিনিশপত্র বিক্রির কথা বলে আসলে সাধারণ জিনিশই বিক্রি করতেন। এ থেকে তিনি পাঁচ মাসের মধ্যে দশ পাউন্ড লাভ করেন। তখন দশ পাউন্ড অনেক টাকা। ফেরিওয়ালার কাজ করার সময়ে তিনি গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন

করতে আরম্ভ করেন। তা ছাড়া, গ্রীক এবং প্রাচীন মিশরীয় ভাষা শেখেন বিজ্ঞানের মূল বই পড়ার জন্যে। তারপর তিনি জিমন্যাস্টিক্স শিখে এক স্যর্কাসে যোগ দেন। সেখানে দু বছর তিনি সিংহ পোষ মানানোর শিক্ষা গ্রহণ করেন। এর পরে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করতে বের হন। জার্মেনিতে তিনি স্যর্কাসের দলে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। অ্যামেরিকায়ও তিনি স্যর্কাসের দলে কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থায়ীভাবে বাস করেন ব্রাজিলে। বিয়েও করেন ব্রাজিলে। সেখানে তিনি প্রথমে স্যার্জন হওয়ার প্রশিক্ষণ নেন। তারপর স্যার্জন হিশেবে যোগদান করেন সেনাবাহিনীতে। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে দ্রুত তিনি কর্নেল পদে অধিষ্ঠিত হন।

শশী সর্বাধিকারীও অ্যামেরিকা ভ্রমণে গিয়েছিলেন বিলেত হয়ে। পরে তিনি এ নিয়ে একটি ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। এ ছাড়া, তিনি সম্ভবত ইংল্যান্ড থেকে একটি ডিগ্রি করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি।

ইন্দুমাধব মল্লিক ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত পর্যটক। চীন যাওয়ার সাত বছর পরে – ১৯০৪ সালের দিকে তিনি যান বিলেতভ্রমণে। তাঁর বিলেতভ্রমণ নিয়ে তিনি দু খণ্ডে একটি বই লিখেছিলেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। এতে তিনি তাঁর যাবার পথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

মোট কথা, উনিশ শতকের শেষ দু দশকে ইংল্যান্ডে যাওয়া আর কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিলো না। উচ্চশিক্ষার জন্যে যাওয়ার মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি কেবল দেশভ্রমণের জন্যেও অনেকে যান। অবস্থাপন্ন পরিবারের অনেকে যান কেবল অভিজ্ঞতা অর্জন এবং উপভোগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বিলেতভ্রমণ ও প্রতিক্রিয়া

বিলেতফেরত ও বঙ্গসমাজ

উনিশ শতকের শেষ দিক পর্যন্ত যাঁরা বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ ছিলেন দরিদ্র লস্কর অথবা আয়া, কেউ ধনী এবং অভিজাত পরিবারের সদস্য, কেউ দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ ভ্রমণকারী। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন তলা অথবা অংশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে কতোগুলো বিষয়ে একটা প্যাটার্ন আমাদের চোখে পড়ে। মনে কতোগুলো প্রশ্নও উঁকি দেয়। যেমন, কারা গিয়েছিলেন এবং তাঁরা যেতে পারলেন কিভাবে? কারা সেখানেই থেকে গেলেন? কারা সেখানে থাকার জন্যেই গিয়েছিলেন? আর, বিলেত থেকে ফিরে এলেন যাঁরা, তাঁরা সমাজে কিভাবে এবং কতোটা গৃহীত হয়েছিলেন? বিলেত থেকে তাঁরা কী নিয়ে এসেছিলেন এবং সমাজের ওপর তার ছাপ পড়ে থাকলে কতোটুকু পড়েছিলো ইত্যাদি।

প্রথমে দেখা যাক, সমাজের শাসন অগ্রাহ্য করে কারা বিলেতে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা যখন বিলেত থেকে ফিরে আসেন, তখন সমাজে কিভাবে গৃহীত হলেন।

ইতেশামউদ্দীন এবং শেখ দীন মহাম্মদের মতো যাঁরা আঠারো শতকের শেষ দিকে গিয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। সুতরাং তাঁদের পটভূমি বিশ্লেষণ করে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবো না। এমন কি, রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। তাঁরাও ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁদের অবস্থান ছিলো রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ, এমন কি, বৃহত্তর বাঙালি সমাজ থেকে যোজন যোজন দূরে। কেবল তাই নয়, তাঁদের মতো আধুনিক মানুষ তাঁদের সমকালে অন্য কেউই ছিলেন না। পরেও খুব কম ছিলেন। রামমোহনকে ঐতিহাসিকরা আধুনিক ভারতবর্ষের মননশীলতার জনক বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। তিনি যে বাঙালিদের দৃষ্টিকে বহির্বিশ্বের দিকে প্রসারিত করেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক ইউরোপের শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং সর্বোপরি উদ্যোগের বাস্তবতাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। সে অর্থে তিনিও আধুনিক ভারতবর্ষের জনক। প্রথম জন চিন্তার জনক, দ্বিতীয় জন সেই চিন্তার রূপকার। এ দুজন যে ইউরোপে যাবেন, তাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। এমন কি, তাঁরা যে সেখানেই চিরতরে থেকে গেলেন, সেও এক রকমের কাব্যিক সুবিচার তাঁদের প্রতি।

১৮৩০-এর দশকে আরও গিয়েছিলেন আনন্দচন্দ্র মজুমদার। তিনি ছিলেন দীক্ষিত খৃস্টান। অংশত পিতা তাঁকে ত্যাগ করায় এবং অংশত ভাগ্যের অন্বেষণে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে যে-চারজন

ছাত্র গিয়েছিলেন, তাঁদেরও দুজন ছিলেন খৃস্টান। এবং অন্য দুজন কলকাতায় চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেই প্রমাণ করেছিলেন যে, তাঁরাও অ-রক্ষণশীল হিন্দু। পঞ্চাশের দশকে যে-দুজন ইউরোপ-যাত্রী লক্ষ্য করি — রাজেন্দ্র চন্দ্র এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর — তাঁরা দুজনেই ছিলেন খৃস্টান। ৬১-৬২ সালে যে-চারজন নাম-করা বাঙালি গিয়েছিলেন — রাখালদাস হালদার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত — তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন ব্রাহ্ম; আর মাইকেল ধর্মকর্ম করুন আর নাই করুন, তাঁর মতো বিখ্যাত খৃস্টান বঙ্গদেশে কমই ছিলেন। মোট কথা, ব্রাহ্ম আর খৃস্টানরাই ইউরোপে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। তার পর যেতে আরম্ভ করেন অন্যরা, সমাজ এবং ধর্মের প্রতি যাঁদের আনুগত্য ছিলো। এমন কি, যেতে আরম্ভ করেন মুসলমানরাও।

১৮৬৪ সালে গিয়েছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে পালিয়ে — পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে না-জানিয়ে। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তিনি এবং তাঁর স্ত্রী একঘরে হয়েছিলেন। তাঁদের ছোঁয়া কোনো পানীয় অথবা খাদ্য তাঁদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাও গ্রহণ করতেন না। অবশ্য তাঁদের জীবনযাত্রাও ছিলো ইংরেজদের মতো। সফল ব্যারিস্টার হিশেবে অল্পদিনের মধ্যে উমেশচন্দ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হলেও তাঁদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুরা ওঠাবসা করতেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কেবল কুলীন ছিলেন না, পিতৃকুলের দিক থেকে তিনি ছিলেন বঙ্গদেশে আসা প্রথম পাঁচ ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন — ভট্টনারায়ণের বংশধর। আর তাঁর স্ত্রীর প্রপ্রমাতামহ ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত — জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা তাঁদের একঘরে করেছিলেন।

বস্তুত, যাঁরা প্রথম দিকে বিলেতে গিয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারের সন্তান — তাঁদেরই যাওয়ার মতো টাকাপয়সা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। তা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে দেশে ফিরে সমাজের কাছে গৃহীত হওয়া সহজ হয়নি। যে-দেশে সত্যিকার ধর্মের চেয়েও প্রাণহীন শাস্ত্র এবং নিষ্করুণ লোকাচার বড়ো, সে দেশের লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই বিলেতফেরতদের দীর্ঘদিন ভালো চোখে দেখেননি। বস্তুত, অনেকে তাঁদের একঘরে করেই রেখেছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অসাধারণ প্রভাবশালী লোককেও রক্ষণশীল সমাজ একঘরে করার চেষ্টা করেছিলো — এমন কি, তাঁর জ্ঞাতিরা।

রাখালদাস হালদারকে তাঁর পিতা অথবা শ্বশুরের পরিবার কেউ-ই গ্রহণ করেনি। মনোমোহন ঘোষও বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছিলেন — দেশে ফিরে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ করতে পারেননি। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন কুলীন পরিবারের সন্তান এবং সমাজের আর-পাঁচজন তাঁদের খাতির করতেন। কিন্তু তিনি যখন আইসিএস হয়ে ফিরে আসেন, তখন তাঁর পরিচিত সমাজ তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে কার্যত একঘরে করেছিলো। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত ডাক্তার ছিলেন কৃষ্ণনগরের দেবেন্দ্রনাথ

রায়। ১৮৬৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ যখন বিলেতে যান, দেবেন্দ্রনাথও তখন বিলেত গিয়ে আইএমএস হতে চান। কিন্তু তাঁর বড়ো ভাই, রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর একঘরে হওয়ার ভয়ে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দেননি। বড়ো ডাক্তার হলেও এর ফলে দেবেন্দ্রনাথের আর বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শেখা অথবা আইএমএস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

শশিপদ ব্যানার্জি ছিলেন ব্রাহ্ম। তা সত্ত্বেও স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশ যাবার আগেই তাঁদের প্রতিবেশীরা তাঁদের ওপর ঢিল ছুঁড়েছিলেন। ফেরার পর তাঁদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ দাসকে তাঁর শিক্ষিত পিতা কলকাতা হাইকোর্টের খ্যাতিবান উকিল শ্রীনাথ দাস ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। দেশে ফেরার পর তাঁদের কন্যার সঙ্গে তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

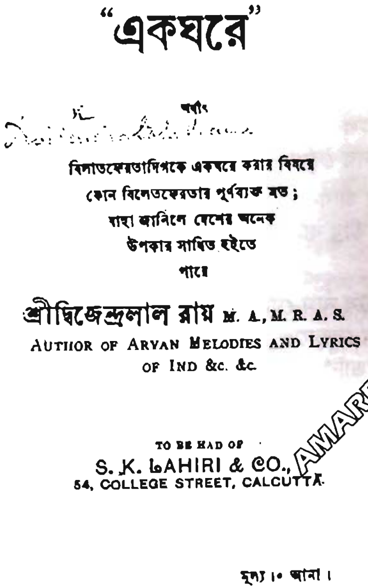
সত্য বটে, যাঁরা বিলেতে যেতেন, তাঁদের জীবনযাত্রা অনেকটাই বদলে যেতো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে* এঁদের তীব্র ব্যঙ্গ মিশিয়ে সমালোচনা করেছেন।

> মা, এবার মলে সাহেব হব —
> রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
> সাদা হাতে হাত দিয়ে, মা, বাগানে বেড়াতে যাব —
> আবার কালো বদন দেখলে পরে 'ডার্কি' বলে মুখ ফেরাব।

বিলেতফেরতরা বেশির ভাগই প্রাণপণ সাহেব হওয়ার চেষ্টা করতেন এবং দেশীয়দের দেখতেন তুচ্ছতার দৃষ্টি নিয়ে। তাঁরা যে বিলেতি বিদ্যা নিয়ে দেশে ফিরে অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করতেন, তাও তাঁদের মধ্যে একটা অহঙ্কারের মনোভাবের জন্ম দিতো। অপর পক্ষে, বিলেতফেরতদের দেশীয়রা দেখতেন বিদ্বেষের এবং তুচ্ছতার দৃষ্টিতে। কৃষ্ণভাবিনী দাস লিখেছেন, 'আজকাল ... ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষীয়েরা ফিরিয়া গিয়া কেবল স্বদেশের নিন্দা আর স্বদেশকে ঘৃণা করেন।' এঁদের দেখে দেশীয়দের মধ্যেও একটা হীনম্মন্যতার মনোভাব কাজ করতো। তাঁরা অনেকেই জানতেন যে, বিলেতফেরতরা তাঁদের তুলনায় বেশি শিক্ষিত এবং সে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা সমাজে একটা উচ্চাসনও তৈরি করেছিলেন।

বিলেতফেরতদের প্রতি রক্ষণশীল সমাজের এবং রক্ষণশীল সমাজের প্রতি বিলেতফেরতদের মনোভাব কেমন ছিলো সে বিষয়ে রঙ্গব্যঙ্গ মিশিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে কৃষ্ণনগরের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ একঘরে করেছিলো। এ সম্পর্কে তাঁর বড়ো ভাই জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন যে, কৃষ্ণনগরের একজন প্রভাবশালী নেতা দ্বিজেন্দ্রলালকে একঘরে না-করার জন্যে কৃষ্ণনগরের প্রধান ধর্মীয় নেতাকে অনুরোধ করেছিলেন। তার জবাবে এই ধর্মীয় নেতা অনেক টাকা দাবি করেন। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রলাল এ রকমের ঘুস দিতে রাজি হননি। ফলে অন্তত সাময়িকভাবে দ্বিজেন্দ্রলালকে একঘরে হতে হয়। দেশে ফেরার মাস পাঁচেক পরে তিনি যখন

কলকাতায় বিয়ে করতে যান (বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার — প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যাকে), তখন কৃষ্ণনগর থেকে তাঁর সঙ্গে যে-বরযাত্রীরা গিয়েছিলেন, সমাজ তাঁদেরও একঘরে করার ভয় দেখায়। সেই ভয়ে তাঁরা বিয়ের সব কাজ শেষ হবার আগেই কৃষ্ণনগরে ফিরে যান।


"একঘরে"

অর্থাৎ

বিলাতফেরতাদিগকে একঘরে করার বিষয়ে
কোন বিলেতফেরতার পূর্ব্বব্যক্ত মত;
যাহা জানিলে দেশের অনেক
উপকার সাধিত হইতে
পারে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় M. A., M. R. A. S.
AUTHOR OF ARYAN MELODIES AND LYRICS
OF IND &c. &c.

TO BE HAD OF
S. K. LAHIRI & CO.,
54, COLLEGE STREET, CALCUTTA.

মূল্য ।০ আনা।

পুরোপুরি একঘরে হতে না-হলেও, রক্ষণশীল সমাজের এই আঘাত দ্বিজেন্দ্রলালকে চটিয়ে দিয়েছিলো। এবং এটাকে তিনি নিতান্তই ব্যক্তিগত অপমান হিশেবে গণ্য করেছিলেন। তাই তিনি ১৮৮৯ সালের জানুয়ারি মাসে *একঘরে* নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন নিজের ব্যয়ে। কেবল তাই নয়, এ পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণও তিনি প্রকাশ করেন দু দশক পরে — অর্থাৎ তখনো এই বিতর্ক এবং তিক্ততা তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি।

একঘরে পুস্তিকাটি বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি বোঝা যায়, হিন্দু সমাজ কেন বিলেতফেরতদের একঘরে করতো। দ্বিজেন্দ্রলাল যা লিখেছেন, তা থেকে জানা যায়, রক্ষণশীল সমাজের আপত্তিটা কোথায় ছিলো। তিনি এই সমাজের সমালোচনা করে তীব্র বিদ্রূপের ভাষায় লেখেন,

> মহাশয়, আমরা দীনহীন কাঙ্গাল মূর্খ বিলেত-ফেরতা; আমাদিগকে কেন প্রাণে মারেন? আপনারা দেশের অলঙ্কার, আপনারা দেশের জ্যোতি, আপনারা বিদ্যার প্রতিনিধি, আপনারা জ্ঞানের উৎস, আপনারা সত্যের নায়ক, আপনারা সাহসের প্রতিমূর্ত্তি। আমরা আপনাদিগের নিষ্কলঙ্ক চরণে পড়িতেছি; প্রাণে মারিবেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল অতঃপর বিলেতফেরত হতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের চোখে কি কি অপরাধ করেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন: 'জাহাজে চড়িলাম, প্যান্ট পরিলাম, কটলেট খাইলাম, তাহার পর দেখুন এই বিপদ। ... বিলাতে যাইলাম, বিলেতের বানরগণের সহিত মিশিলাম, রোষ্টচপ খাইলাম। এখন পস্তাচ্ছি।'

যে-কটা বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো হলোঃ জাহাজে চড়া (কালাপানি পার হওয়া), ইংরেজি পোশাক পরা, নিষিদ্ধ মাংস ও পানীয় খাওয়া এবং ম্লেচ্ছদের সঙ্গে মেলামেশা করা। যে-সমাজে অন্য জাতের সঙ্গে পানি খাওয়াও নিষিদ্ধ

ছিলো, সে সমাজে এসব অপরাধ গুরুতর বলে বিবেচিত হতে পারে বই কি! এ ছাড়া, রক্ষণশীল সমাজের একটি প্রধান আপত্তির কারণ ছিলো দেশে ফিরে আসার পরেও বিলেতফেরতদের জীবনযাত্রায় যে-বিলেতি প্রভাব থেকে যেতো, সেই প্রভাব অর্থাৎ ইংরেজিয়ানা। দ্বিজেন্দ্রলাল তার কথাও বিদ্রূপ করে বলেছেন: 'আমাদের বাটীতে খোলা জানালাতে লিবারটাইন হাওয়ার অবাধ গতি অবশ্য শোচনীয়; চেয়ার ও টেবিলের আবর্জ্জনা ঘৃণ্য; কটলেট ঘোরতর বিস্বাদু, শ্বেতবসন রাঁধুনীর দাড়ি ভীষণ; ছুড়িকাঁটার শব্দ কর্কশ; ও প্রেয়সীর অবাধে বাহিরে আগমন শকিং।' শ্বেতবসন রাঁধুনীর দাড়ি বলে তিনি আসলে বোঝাতে চেয়েছেন মুসলমান বাবুর্চি।

বিলেতফেরতরা অবশ্য রক্ষণশীল সমাজের এই বিদ্বেষকে বেশির ভাগ সময়েই তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, 'মহাশয় এ আর সহ্য হয় না। এবারে মাথায় ঘোল ঢালিয়া গোবর দ্বারা পেটকে ডিসইনফেক্ট করিয়া; টেবিল ভাঙ্গিয়া, বাড়ী ফিরিয়া, রুদ্ধা প্রেয়সীর মুখ চুম্বন করিয়া – তবে আর কাজ।' এই রচনার সঙ্গে একটি হাসির কবিতা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সমস্যাটা আর-একটু বিস্তারিতভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

হায় হায়!
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়,
ছেড়ে দিলেন মুরগী গরু জাতের দায়;
মুড়িয়ে মাথা, ঢেলে ঘোল,
ধল্লেন আবার মাছের ঝোল,
কুমড়োসিদ্ধ, বেগুণপোড়া, আলুভাতে তায়,
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়,
দলে মিশি ভণ্ড ঋষি হতে যদি চায়
পেটের মধ্যে থেকে থেকে
মুরগীগুলো উঠে ডেকে,
গরুগুলো হাম্বা করে - এ কি হলো দায়
বিলেত থেকে ফিরে এসে হরিদাস রায়।

বিলেতফেরতরা অনেকে প্রায়শ্চিত্ত করে এবং রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে আপোশের নামে যেসব ভণ্ডামি করেন, কবি সে সম্পর্কে আরও লিখেছেন:

হিন্দুর মেয়ে বিয়ে করে, হিন্দুর ঘরে যায়*, (এ প্রেজেন্ট আনট্রুথ)
চেলি পরে হলুদ মেখে, নারায়ণকে সাক্ষী রেখে;
ঐ সময়টায়ই উঠে ডেকে মুরগীগুলো হায়; ...
প্যান্ট ছেড়ে পরেন বেড়ে কালাপেঁড়ে হায়;
করুন যা তাঁর আসে মনে,
হারাধন সান্নাল ভনে

বুদ্ধিমানে রোষ্টচপ টপাটপ খায়
... চুরুট ফুঁকে হোটেলখানায়।

রক্ষণশীল হিন্দুদের রীতিনীতি এবং ভণ্ডামির তীব্র ব্যঙ্গ করলেও তিনি রক্ষণশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, বিলেতফেরতদের নীচে নামিয়ে নয়, বরং তাঁরা নিজেরা উপরে উঠে যেন বিলেতফেরতদের সমান হওয়ার চেষ্টা করেন। তা হলে নতুন ভেদ ঘুচে সমাজের উন্নতি হবে। সত্যি বলতে কি, কেবল রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনা করেননি, বিলেতফেরতদের আচার-আচরণেরও তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন তিনি। বিলেতফেরত ব্যক্তিদের দোষগুলো এবং বাড়াবাড়ির কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি হাসির গানই যথেষ্ট — 'আমরা বিলেতফেরত ক'ভাই।'

আমরা বিলেতফের্তা ক ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি;...
আমরা সাহেব নামে পটি
আমরা মিস্টার নামে রটি
যদি সাহেব না বলে বাবু কেহ বলে
মনে মনে ভারী চটি
আমরা বিলিতি ধরনে হাসি
আমরা ফরাসি ধরনে কাশি
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালোবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই
আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাঁটা ধরাই;
আমরা মেয়েদের জুতোমোজা, দিদিমাকে
জ্যাকেট কামিজ পরাই।...

ওদিকে, ১৮৭০-এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিলেতফেরত লোকেদের সংখ্যা যখন খুব কম ছিলো, তখন রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে তাঁদের একঘরে করা সহজ ছিলো। কিন্তু এঁদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন আর তাঁদের সমাজচ্যুত করা সহজ থাকলো না। কারণ, এর সঙ্গে তখন অনেক পরিবারই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়লো। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: বিলেতফেরত ব্যক্তিরা হয় তাঁদের উচ্চশিক্ষার কারণে, নয়তো উঁচু সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। ফলে তাঁদের সমাজচ্যুত করা দূরে থাক, তাঁদের খাতির করা ছাড়া উপায় থাকলো না।

এই পরিবেশে সমাজপতিরা ভাবতে আরম্ভ করেন যে, একই সঙ্গে কিভাবে এঁদের গ্রহণ করা যায় আবার জাতও রক্ষা করা যায়। তার পরিপ্রেক্ষিতে উর্বরমস্তিষ্ক ধর্মব্যবসায়ীরা পথও আবিষ্কার করে ফেলেন। তাঁরা বললেন, গোবরসহ পঞ্চগব্য খেলে এবং প্রায়শ্চিত্ত হিশেবে বামুনদের টাকাপয়সা দিলে আবার জাতে ওঠা যাবে। যেহেতু বিলেতফেরত অনেকেই সমাজের বন্ধন কাটিয়ে উঠতে পারেননি, অথবা সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে চেয়েছিলেন, সুতরাং তাঁরাও ধর্মীয় নেতাদের ফতোয়া অনুযায়ী গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে সম্মত হন। সৌভাগ্যক্রমে গোবরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা ছিলো না বলে ধীরে ধীরে তা প্রতীকেই পরিণত হয়। আর টাকাপয়সা দেওয়া তো কোনো সমস্যাই ছিলো না। এভাবে ১৮৭০-এর দশক থেকে বিলেতফেরত লোকেদের সমাজে গ্রহণ করার দাবি ওঠে এবং সেই সঙ্গে কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে স্থানও করে নেন। একবার গৃহীত হওয়ার পর তাঁরা পরবর্তী সময়ে কী খেতেন, কিভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনা করতেন, সমাজপতিরা তা আর খতিয়ে দেখতে আসতেন না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা ষষ্ঠ বাঙালি আইসিএস ব্রজেন্দ্রনাথ দের কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি আইসিএস হয়ে ফিরে আসেন ১৮৭৫ সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর। যাতে তিনি সমাজে গৃহীত হন, তার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসেন সেকালের বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকার। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের মায়ের মামা। তিনি তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন কলকাতার কিছু গণ্যমান্য লোককে। খাওয়ার সময় ব্রজেন্দ্রনাথকে তিনি তাঁদের সঙ্গে বসান। এভাবে তাঁর সঙ্গে একত্রে খাওয়ার মধ্য দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ সমাজে গৃহীত হন। কিন্তু তার পরও তিনি গোমাংস খাওয়া-সহ তাঁর সাহেবী ছাড়েননি।

তবে ১৮৭০-এর দশকের পর থেকে বিলেতফেরতরা সবাই সমাজে পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হলেন, তা ঠিক নয়। তাই দেখতে পাই, ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মনেতা, দুর্গামোহন দাস (দুই বিলেতফেরত – প্রসন্নকুমার রায় এবং জগদীশচন্দ্র বসুর শ্বশুর) বিলেতফেরতদের সমাজে গ্রহণ করার জন্যে পত্রিকায় চিঠি লেখেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। এর কোনো প্রভাব, এমন কি, সীমিত আকারে সমাজের ওপর পড়েছিলো কিনা, তা যাচিয়ে দেখার এখন আর উপায় নেই। কিন্তু বিলেতফেরতদের নিয়ে সামাজিক সমস্যা এর পরও বহু বছর থেকে গিয়েছিলো। এর প্রমাণ পাই ১৮৮১ সালে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা থেকে। এতে বলা হয়েছে যে, বিলেতফেরতদের নিয়ে যে-সমস্যা রয়েছে, তার দুটি দিক আছে। একদিকে বিলেতফেরতরা সমাজের সাধারণ মানুষদের পরোয়া না-করার মনোভাব দেখান, এমন কি, কখনো কখনো সমাজকে তাঁরা ঘৃণা করেন। অন্যদিকে, বিলেতফেরতরা প্রায়শ্চিত্ত না-করা পর্যন্ত রক্ষণশীল সমাজ তাঁদের সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এই রচনা প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পরে এই পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি রচনায় রক্ষণশীল সমাজকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে,

বিলেতফেরতরা সমাজেরই অংশ এবং 'বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা শাস্ত্রসম্মত ...।'

কিন্তু *সোমপ্রকাশ পত্রিকার* এই উদ্যোগ গ্রহণ সত্ত্বেও পরের দশকেও এ বিতর্কের মীমাংসা হয়নি। বরং এই বিতর্কের একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান খোঁজার জন্যে ১৮৯৪ সালে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। তারই উদ্যোগে কালাপানি পার হওয়া শাস্ত্রসম্মত কিনা, তার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার আগেই মারা যান। কিন্তু তাঁর মতামত আমরা জানি। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং ক্ষেত্রমোহন দত্তকে বিলেত যেতে রীতিমতো উৎসাহ এবং সহায়তা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিলেত থেকে ফিরে এলে তাঁদের প্রকাশ্যে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন।

অপর পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখনো জীবিত ছিলেন। তিনি এই কমিটির প্রশ্নের উত্তরে বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরকে লেখা ২৭শে জুলাই ১৮৯৪ তারিখের একটি দীর্ঘ পত্রে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছিলেন। কালাপানি পার হওয়া শাস্ত্রসম্মত কিনা, তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন যে, শাস্ত্র দিয়ে নয়, বঙ্গীয় সমাজ বরং পরিচালিত হয় লোকাচার দিয়ে। যখন শাস্ত্রের সঙ্গে লোকাচারের বিবাদ হয়, তখন লোকাচারই জয়ী হয়। সুতরাং কালাপানি পার হওয়া শাস্ত্রসম্মত কিনা, তা অপ্রাসঙ্গিক। তিনি আরও লিখেছিলেন যে, শাস্ত্র যদি ধর্মের বিরুদ্ধে যায়, তা হলে সেই শাস্ত্র অমান্য করা যায়। যেহেতু বিলেত যাওয়ার ফলে সাধারণভাবে সমাজের উপকার হচ্ছে, সুতরাং শাস্ত্রে কী বলা হচ্ছে, সেটা বড়ো কথা নয়, বরং বলা যেতে পারে যে, বিলেত যাওয়া ধর্মসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র আরও লেখেন যে, যতোদিন সমাজের আরও উন্নতি না-হচ্ছে, ততোদিন বিলেত যাওয়ার ব্যাপারে একটা বিরোধিতার মনোভাব থেকেই যাবে। তাকে শাস্ত্র বিচার করে দূর করা যাবে না। শাস্ত্র দিয়ে তিনি সমাজ সংস্কার করতে চান না, এও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এ রকম যুক্তিবাদী মনোভাব প্রকাশ করলেও রক্ষণশীল সমাজের সদস্যরা বিলেত যাওয়া যে শাস্ত্রবিরোধী এবং সে কারণে অনুমতি লাভের অযোগ্য, এ রকমের প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেননি। এ রকমের একজন রক্ষণশীল পণ্ডিত ছিলেন সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত জানতে চেয়েছিলেন 'কালাপানি' কমিটির সদস্যরা। সারদাপ্রসাদের মতামত তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু আগ বাড়িয়ে ১৮৯৪ সালেই তিনি *বিলাতযাত্রা-প্রতিষেধ* নামে ২৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, কালাপানি পার হয়ে বিদেশে যাওয়া হিন্দুধর্ম-বিরোধী।

শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কে সংস্কারপন্থী এবং শাস্ত্রপন্থী কোনো দলই জয়ী হননি। বিলেত যাওয়ার উপযোগিতার মুখে বিলেতগামী লোকেদের সংখ্যা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পায়,

তখন এমনিতেই লোকাচার দুর্বল হয়ে পরিণামে পুরোপুরি লোপ পায়। তবে তার জন্যে আরও সময় লাগে। এর পর যাঁদের অর্থসঙ্গতি এবং ভ্রমণ করার সঙ্গতি ছিলো অথবা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তাঁরা অনেকেই বিলেত যান।

বিলেত দেখার প্রতিক্রিয়া

ইতেশাম উদ্দীন থেকে আরম্ভ করে একেবারে অতিসাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে-বাঙালিরা বিলেতে এসেছেন, তাঁদের স্বপ্নে-দেখা বিলেত আর বাস্তবে যে-বিলেতকে তাঁরা দেখতে পান, তার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিলো। সে জন্যে তাঁরা যেসব ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন, তার প্রধান সুরই হলো বিস্ময়ের। ইতেশাম উদ্দীন প্রথমেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন লন্ডনের বিশালত্ব দেখে। ইতেশাম উদ্দীনের এক শো বিশ বছর পরে এসেছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। তিনিও লন্ডনের বিশালত্ব দেখে সমান বিস্মিত হয়েছিলেন। বস্তুত, বিলেতের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, উদ্যান, মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ — কোনো কিছুই তাঁদের কম মুগ্ধ করেনি। ইতেশামের ভ্রমণকাহিনীতে কার্যত বিলেতের কোনো সমালোচনা নেই। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়, তিনি মেয়েদের পোশাক এবং চলাফেরা খুব একটা অনুমোদন করতে পারেননি, কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর কোনো কড়া সমালোচনাও ছিলো না। এটা একটা ভিন্ন সংস্কৃতির দেশ, সুতরাং এঁদের জীবনযাত্রা ভিন্ন ধরনের হবে — এটা তিনি ধরেই নিয়েছিলেন।

অপর পক্ষে, আবু তালিব ছিলেন ইতেশাম উদ্দীনের তুলনায় অনেক শিক্ষিত এবং ধনী। তিনি নিজে ইংরেজিও জানতেন। তাঁর চারদিকে কী ঘটছে — সে সম্পর্কে ইতেশাম উদ্দীনের চেয়ে তিনি বেশি অবহিত ছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁর ছিলো একটি বিশ্লেষণী মন। সে জন্যে তিনি বিলেতের প্রশংসায় যেমন পঞ্চমুখ হয়েছেন, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। তিনিও লন্ডনের বিশালত্ব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, কেইপ টাউনে পৌঁছে তাঁর মনে হয়, সে নগরী কলকাতার চেয়ে সুন্দর। তারপর ডাবলিনে পৌঁছে তাঁর মনে হলো, সে নগরী কেইপের চেয়েও সুন্দর। সবশেষে তিনি যখন লন্ডনে আসেন, তখন মনে হয়, এর কোনো তুলনাই নেই। আমরা আগের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, তিনি বিলেতের শিক্ষাব্যবস্থা, শিল্প-বিপ্লব, স্থাপত্য, মানুষের জীবনযাত্রা, আইনের প্রতি তাঁদের সম্মান ইত্যাদি দেখে তিনি শতমুখে তার প্রশংসা করেছিলেন।

নারীদের প্রতি তাঁর সম্ভবত একটু বেশি দুর্বলতা ছিলো, অথবা অন্যদের মতোই ছিলো, কিন্তু তিনি অকপটে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের নারীদের সৌন্দর্যের, তাঁদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার এবং সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু সম্পত্তিতে তাঁদের যে কোনো আইনী অধিকার

নেই, বরং সে তুলনায় তাঁর নিজের দেশের নারীদের বেশি অধিকার আছে — এ কথা বলতেও পিছপা হননি। ইংরেজদের দেখে তিনি যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তা তাঁর লেখার সর্বত্রই প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষে থাকার সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো প্রবল প্রতাপশালী গভর্নর জেনারেলের ছায়া মাড়ানোও সম্ভব হতো না তাঁর পক্ষে, কিন্তু বিলেতে আসার পর তাঁরই আন্তরিক আতিথ্য লাভ করছেন তিনি — এতে তাঁর মুগ্ধ হবারই কথা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যার বিশাল আয়োজন দেখে, বিশেষ করে অ্যানাটমির উন্নতি দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। গ্রীনিচে গিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি দেখে।

তবে, আগেই বলেছি যে, তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো। তিনি প্রশংসার সঙ্গে সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। যেমন, তিনি একই সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রশংসা করে একটা গোটা অধ্যায় লিখে ফেলেছেন, আবার তাঁদের চরিত্রের যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁর ভালো লাগেনি, সেগুলোর সমালোচনা করেছেন এক অধ্যায় জুড়ে।

রামমোহন রায়ও বিলেত দেখে এবং সেখানকার মনীষীদের সঙ্গে মিশে মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁর নিজের জবানিতে আমরা কিছুই জানতে পাইনে। অপর পক্ষে, তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ভ্রমণকাহিনী না-লিখলেও দেশে চিঠিপত্র লিখেছিলেন এবং এর কোনো কোনোটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। তা ছাড়া, তিনি ডায়রি না-লিখলেও বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মন্তব্য লিখেছিলেন। এসব মন্তব্য থেকে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিলেতের অভিজাত সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় তাঁর মধ্যে কোনো হীনম্মন্যতা কাজ করেনি। বরং সামনাসামনি তিনি ইংরেজদের সমালোচনাও করেছেন। ভারতবর্ষকে ইংরেজরা শাসন করছেন তাকে উদ্ধার করার জন্যে নয়, বরং তাকে শোষণ করার জন্যে — প্রকাশ্য সভায় এ কথা বলে তিনি উপর মহলের অনেকের রোষে পড়েছিলেন। বস্তুত, তিনি যে কোনো নাইটহুড পাননি, তার একমাত্র কারণ সেটাই। কিন্তু তিনি বিলেতকে ভালোবেসেছিলেন — বিলেতের জীবনযাত্রা, শিক্ষা, বিনোদন, সমাজ, নারী, গুণীজনের সঙ্গ, এমন কি আবহাওয়া — সবকিছুই তাঁর দৃষ্টিতে স্বদেশের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছিলো। তিনি লিখেছেন,

> বিশ বছর ধরে যা আমার ধ্যানের বিষয় ছিল আমি শেষ পর্যন্ত আমার সেই বহুঈপ্সিত জায়গায় এসে পৌঁছেছি। ... কন্টিনেন্টের সবকিছু দেখার পর আমি আশাই করিনি এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি আমায় এত গভীরভাবে অভিভূত করবে, কিন্তু বাস্তবিকই এই লন্ডন হল এক আশ্চর্য শহর। নগরজীবনের প্রাণচাঞ্চল্য, যানবাহন, বিপণি এবং বিশেষ করে শহরের মানুষগুলো আমায় একেবারে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। ...এখানে পা-দেবার দু-দিন পরেই মহামান্যা মহারাণী সদয় অভ্যর্থনায় আমায় আপ্যায়ন করেছিলেন। রাজপরিবার এবং অভিজাতবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেছেন, প্রাক্তন ও বর্তমান

মন্ত্রীরা সকলেই সর্বপ্রকারে খাতির যত্ন করেছেন। ...অপেরা এবং থিয়েটর দেখে আমি যে প্রচুর আনন্দলাভ করেছি, সেকথা বলাই বাহুল্য। ইংলন্ডের রমণীদের সৌন্দর্য দেখে আমার রূপকথার গল্প মনে পড়ে যায়। ছেলেবেলায় পারসিক গল্পে যে-সব কথা পড়েছিলাম এখানে সে-সব যেন প্রত্যক্ষ দেখতে শুরু করেছি। যদি কারো ঐশ্বর্য থাকে তা উপভোগ করার স্থান হল এই।
(কৃষ্ণ কৃপালনীর *দ্বারকানাথ ঠাকুর: বিস্মৃত পথিকৃৎ* গ্রন্থ থেকে)

তিনি যে বিলেতের প্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন এবং তা-ই বাকি জীবন ধরে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, তা বোঝা যায় তিনি যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সব সমস্যার সমাধান না-করে তাদের পাশ কাটিয়ে দ্বিতীয়বার বিলেতে আসেন, তা থেকে। এ ছাড়া, এটা বোঝা যায় আর-একটা ঘটনা থেকে — প্রথমবার তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ভৃত্য আর সঙ্গীদের। কিন্তু দ্বিতীয়বার কনিষ্ঠ পুত্রসহ যাঁদের নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের এনেছিলেন বিলেতের জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। স্বদেশের আবহাওয়া এবং পরিবেশের তুলনায় বিলেতে বসবাস যে অনেক শ্রেয় — এও বোঝা যায় তাঁর লেখা থেকে। তিনি বলেছেন, কলকাতার আবহাওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্য একদম টিকছিলো না। তাই তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি করে যেভাবে বিলেতযাত্রা করেন, তা থেকে মনে হয় একদিকে বিলেত তাঁকে ডাকছিলো, অন্যদিকে তিনি বিলেতে পালিয়ে বাস্তবতা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। মনে হয় না, তিনি বেঁচে থাকলেও সহজে কলকাতায় ফিরে যেতেন।

সত্যি সত্যি বিলেতে আসার সুযোগ হওয়ার অনেক আগে থেকেই রামমোহন এবং দ্বারকানাথ বিলেতে আসার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন — নিজেরাই তা বলেছেন। তেমনি আর-একজন বিলেতে যাওয়ার স্বপ্নে বুঁদ হয়েছিলেন — তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তাঁর প্রথম যৌবন থেকে। কিন্তু আসার সুযোগ পান সে তুলনায় অনেক দেরিতে — প্রায় প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে। বিলেত দেখে প্রথম দৃষ্টিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায় তাঁর দু-একটি চিঠি থেকে। মনে হয় ভূমধ্যসাগরে জাহাজে থাকার সময় থেকেই তার সূচনা। গ্রীস এবং ইটালির উপকূলের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন চলে যায় ধ্রুপদী সাহিত্যের হারানো জগতে। সবকিছুকেই তাঁর ভালো লাগছিলো। এমন কি, সিলোন নামে যে-জাহাজে তিনি যাচ্ছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়েও তিনি তাকে প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যদিও তাঁর পরবর্তী আর-একজন ভ্রমণকারীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জাহাজটি আদৌ বিলাসবহুল অথবা বিশাল ছিলো না।

লন্ডন এবং তার শহরতলী দেখে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন ঘোষের কাছে মাইকেল বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, বিশেষ করে হ্যাম্পটন কোর্ট দেখে। সত্যেন্দ্রনাথ এবং মনোমোহন যে এসব না-দেখে কেবল বই মুখস্থ করছেন, তিনি সেটাকে অনুমোদন করতে পারেননি। কিন্তু বেশি দিন লন্ডন সম্পর্কে তাঁর এই মোহ থাকেনি।

বিশেষ করে লন্ডনের আবহাওয়া তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি। তাই তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করার পর এক সপ্তাহও থাকেননি লন্ডনে। বরং ফ্রান্সের ভার্সাইতে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। ভার্সাইতে তিনি অতি দারিদ্র্যের মধ্য দুটি বছর কাটিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও সেই ছোট্টো শহরটি তাঁর কাছে লন্ডনের তুলনায় বেশি বাসযোগ্য মনে হয়েছিলো। লন্ডনে বাস করার সময়ে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, গোটা দেশ জুড়ে সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ অথবা বায়রনরা ঘুরে বেড়ান না। তদুপরি, সমাজের বর্ণবাদী মনোভাবও তাঁকে বিদ্বিষ্ট করেছিলো। সেখানে বাস-রত বাঙালিদের আচরণও আহত করেছিলো তাঁকে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেতে গিয়েছিলেন মাইকেলের ষোলো বছর পরে। তিনিও তাঁর স্বপ্নের বিলেতকে সেখানে খুঁজে পাননি। বিলেতের সর্বত্র সাহিত্যের হাওয়া বইছে না, সর্বত্র মননশীলতার বাণী শোনা যাচ্ছে না — এই বাস্তবতা দেখে তিনি বরং হতাশ হয়ে থাকবেন। নয়তো সে কথা তাঁর চিঠিতে তিনি লিখতেন না। তবে এই হতাশা সত্ত্বেও বিলেতের সাংস্কৃতিক জীবন তিনি উপভোগ করেছিলেন এবং তা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি অপেরা-নাটক দেখেছিলেন। গান শিখেছিলেন। আর-একজন যিনি সেখানে নাটক দেখে এবং গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তিনি হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। বিলেতে থাকার সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চাও করেছিলেন। তাঁর একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিলো সেখানে। কিন্তু মনে হয়, যাকে বলা হয় মুগ্ধ হওয়া, তা তিনি হননি। বহু বছর পরে একটি গানে তিনি খুব সংক্ষেপে তাঁর সেই মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন — "বিলেত দেশটা মাটির"।

সাহিত্যিকদের মধ্যে আর-একজন বিলেতে গিয়েছিলেন — রমেশচন্দ্র দত্ত। কিন্তু তাঁর দুটি ভ্রমণকাহিনী থেকে মনে হয় না, সেখানকার সমসাময়িক সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো আদান-প্রদান হয়েছিলো। প্রথমবার লেখাপড়ার চাপে এবং দ্বিতীয়বার পরিবারের চাপে তিনি চারদিকটা ভালো করে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা, সেটাই পরিষ্কার নয় তাঁর রচনা থেকে। বরং তিনি ইউরোপ ঘোরার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা থেকে তাঁর একটা মুগ্ধতার মনোভাবই চোখে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলেতে গিয়েছিলেন উপনিবেশ ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি প্রদর্শনীর কর্মকর্তা হিশেবে (১৮৮৬)। তাঁর রচনা থেকে মনে হয়, বিলেতের কীর্তি এবং পুরাকীর্তি দেখে তিনি মুগ্ধ হলেও তাঁর প্রতি সেখানকার সাধারণ মানুষের ব্যবহারে খুশি হতে পারেননি। আর, তাঁর দু বছর পরে শিবনাথ শাস্ত্রী বিলেতে গিয়ে ছ মাস থাকলেও দেশটার আদৌ প্রশংসা করতে পারেননি। বরং সেখানে মদ্যপায়ীদের উৎপাতে বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিলেন। মদ্যপায়ীদের তীব্র নিন্দা কৃষ্ণভাবিনী দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশবচন্দ্র সেনও করেছিলেন। বস্তুত, শশিপদ এবং কেশবচন্দ্র এবং শিবনাথ শাস্ত্রী রীতিমতো মদ্যপান নিবারণের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন।

অমৃতলাল রায় ১৮৮২ সালে এডিনবরা থেকে ডাক্তারি পাশ করে অ্যামেরিকায়

গিয়েছিলেন — আগেই উল্লেখ করেছি। বিলেতের অনেক বিষয়ের সমালোচনা করলেও তিনি লন্ডনের প্রশংসা করেছেন পঞ্চমুখে। তিনি লিখেছেন যে, লন্ডন হলো বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য এবং আশ্চর্যজনক সভ্যতার কেন্দ্র, সম্পদ এবং শক্তির ভাণ্ডার; তিনি লন্ডনের আরও প্রশংসা করেছেন মননশীলতার গভীর সমুদ্র বলে। ত্রৈলোক্যনাথও এ রকমের মন্তব্য করে লিখেছেন যে, গোটা বিশ্বের ব্যবসাবাণিজ্যে যে-রক্তধারা প্রবাহিত হয়, তার হৃৎপিণ্ড হলো লন্ডন।

চন্দ্রশেখর সেন বিলেত সম্পর্কে অনেকগুলো ইতিবাচক ধারণা লাভ করেছিলেন। প্রথমেই তাঁর মনে হয়েছিলো যে, বিলেতের সমাজে যে অসাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, বঙ্গীয় সমাজে তা নেই। সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতা দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, এই শিক্ষা পাশ্চাত্য থেকে বাঙালিদের নেওয়া উচিত। এমন কি, বিলেতে পাত্রপাত্রীর পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ করার যে-রীতি আছে, তিনি লিখেছেন, বাঙালিদের তা অনুকরণ করা উচিত।

চন্দ্রশেখর সেনের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিল লক্ষ্য করা যায় দুজন বঙ্গ-মহিলার। এঁরা হলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস আর জগৎমোহিনী চৌধুরী। তাঁরা বিলেত এবং সেখানকার জীবনযাত্রা ও সমাজ দেখে প্রশংসায় শতমুখ হয়েছিলেন। কৃষ্ণভাবিনীর আগে বেশ কয়েকজন বাঙালি ভদ্রমহিলা বিলেতে গেলেও তাঁরা ভ্রমণকাহিনী লেখেননি। কৃষ্ণভাবিনী লিখেছিলেন। তিনি লন্ডন নগরী দেখে যতোটা মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার থেকে ঢের বেশি ভালোবেসেছিলেন ইংরেজদের সমাজ। সে সমাজে যে-ব্যক্তিস্বাধীনতা রয়েছে, তিনি তার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। কারণ, তাঁর নিজের দেশে তিনি সমাজ এবং ধর্মের চাপে এই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকাশ দেখতে পাননি। তিনি লেখেন যে, কথায় আছে, বিলেতে গেলে ক্রীতদাসও স্বাধীন হয়ে যায়। তিনি নিজেও সেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছিলেন বিলেতে গিয়ে।

এই স্বাধীনতার পরিবেশে যে-নারীরা জন্মগ্রহণ করেন এবং বড়ো হয়ে ওঠেন, তাঁদেরও তিনি বিশেষ প্রশংসা করেন। কারণ এঁরা বাঙালি নারীদের মতো চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী নন এবং সমাজ-সংসারে এঁরা রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন — এটা দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর আগের ভ্রমণকারীরা কেউ কেউ ইংরেজ নারীদের সতীত্ব সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন। অন্তত তাঁরা তা অনুমোদন করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনী এ কথা বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে, বাঙালি নারীরা ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে তাঁদের সতীত্ব বজায় রাখেন, অপর পক্ষে ইংরেজ রমণীরা স্বাধীনভাবে বাইরে ঘুরে বেড়িয়েও তাঁদের সতীত্ব এবং সম্ভ্রম বজায় রাখেন। সুতরাং, তাঁর মতে, তাঁদের চরিত্রেরই বেশি প্রশংসা করতে হয়। তবে তিনি বিলেতি সমাজের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। মেয়েদের বিলাসিতা, পুরুষদের অমিতব্যয়িতা এবং পুব লন্ডনের 'ইতর' সমাজের তিনি খুবই নিন্দা করেছিলেন। তখন পুব লন্ডনে বাস করতেন শ্রমিক শ্রেণীর এবং গরিব মানুষরা। তিনি যে-ভাষায় তাঁদের নিন্দা করেছেন, তা পাঠককে বিস্মিত না-করে পারে না।

জগৎমোহনী চৌধুরী বিলেতে গিয়েছিলেন ১৮৯৪ সালে এবং সেখানে গিয়ে সাত মাস ছিলেন। লন্ডন নগরী দেখে তিনি অবাক বিস্ময়ে লিখেছিলেন, 'ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনকে একটি ছোটখাট জগৎ বলিলেও কোনক্রমে অত্যুক্তি হয় না। তাহার সীমা পরিসীমার ইয়ত্তা করা যায় না। ... বিনা সাহায্যে আমি কখনই রাস্তা পার হইতে পারি নাই। সময়ে ২ প্রাণ হাতে লইয়া দৌড়িতাম।' জগৎমোহিনীর চোখে বিলেতি জগতের সবকিছুই স্বদেশের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এমন কি, স্বদেশের ধর্মের চেয়ে খৃষ্টধর্মও শ্রেষ্ঠ। 'ইংলণ্ডের উন্নতির মূল খৃষ্টধর্ম্ম।' কেবল তাই নয়, 'খৃষ্ট ধর্ম্ম ও বাইবেল শাস্ত্র এ দেশে [বঙ্গদেশে] প্রচারিত হওয়া অবধি অনেক চিন্তাশীল বঙ্গবাসী তাহা গ্রহণ করিয়া চিত্তের বিশ্রাম ও শান্তি লাভ করিয়াছেন।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে যাঁরা 'চিত্তের বিশ্রাম ও শান্তি লাভ' করেছিলেন, তিনিও তাঁদের একজন। বিলেতের নারীরা সমাজ-সংসারে যে-অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করেন, তিনি তারও খুব প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে তাঁরা যে স্বাবলম্বী – এটা তাঁর কাছে একটা অনুকরণীয় আদর্শ বলে মনে হয়েছিলো।

খৃস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মুগ্ধতার কথা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। আসলে, তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে খৃস্টধর্মের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছিলেন। সে জন্যে পশ্চিমা সভ্যতার তাবৎ ভালো জিনিশগুলোকে তাঁরা খৃস্টধর্মের বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচনা করেছিলেন।

এক নবাবের দূত হিশেবে লুৎফুল্লাহ বিলেতে গিয়েছিলেন জগৎমোহিনীর ঠিক অর্ধ-শতাব্দী আগে – ১৮৪৪ সালে। সেখানে গিয়ে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা হয়, তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর প্রতি ইংরেজদের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে তিনি দেখেছিলেন ইংরেজদের উদ্ধত আচরণ, কিন্তু বিলেতে যে-ইংরেজদের দেখতে পান, তাঁরা একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির – ভদ্র এবং বিনয়ী। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে অন্যরাও বারবার বর্ণনা করেছেন – একজন অন্য জনের কথা না-জেনেই। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, তিনি যখন কলকাতা থেকে জাহাজে ওঠেন, তখন জাহাজের ইংরেজ যাত্রীরা তাঁর প্রতি এমন আচরণ করেন যে, তিনি যেন একঘরে। কিন্তু ইংল্যান্ডে এসে তিনি যে-ইংরেজদের সঙ্গে মিশেছেন, তাঁরা তাঁর প্রতি বন্ধুত্ব এবং আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেবল ইংরেজরা নন, যে-ফিরিঙ্গিরা কলকাতায় নিজেদের উচ্চশ্রেণীর জীব গণ্য করে বাঙালিদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন, সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরাও বিলেতে কতো ভদ্র হতে পারেন, সে কথা লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। চন্দ্রশেখর সেনও লিখেছিলেন যে, ভারতের ইংরেজ এবং বিলেতের ইংরেজের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

প্রথমবার বিলেতে এসে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতা ছাড়া খুব বেশি জিনিশের প্রশংসা করতে পারেননি। প্যারিস দেখে লিখেছিলেন যে, এতো ছোটো মানুষের জন্যে অতো বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মাণের অর্থ তিনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু লন্ডন দেখে সে রকম

কোনো মন্তব্য করেননি। তবে লন্ডনের লোকেদের কর্মব্যস্ততা এবং যানবাহন, বিশেষ করে রেলওয়ে ব্যবস্থা দেখে, তিনি অবাক হয়েছিলেন। যে-ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিলো, তাঁরা যে সজ্জন এবং বিদ্বেষপূর্ণ নন, এটাও তাঁর লেখা থেকে পষ্ট বোঝা যায়। কেবল তাঁরা যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অজ্ঞ, সেটা তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর মনে হয়েছে যে, ইংরেজরা তাঁদের ক্ষুদ্র দ্বীপটিকেই বিশ্ব বলে গণ্য করেন। আমার ধারণা, রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা অন্যায্য। কারণ, তিনি স্বদেশের দিকে তাকালে দেখতেন যে, সেখানকার লোকের দৃষ্টি নিজের গ্রাম এবং অঞ্চলের বাইরে বড়ো একটা ধাবিত হয় না। ইংরেজদের তুলনায় তখনকার বাঙালিরা ছিলেন নিতান্তই কূপমণ্ডূক। ইংরেজরা সেকালেই বিশ্বের নানা প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন জ্ঞান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে, বাঙালিরা নন। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের তুলনায় ঢের বেশি নিন্দা করেছেন, বিলেতে বসবাস-রত বাঙালিদের। তাঁর মতে, ইংরেজিয়ানায় তাঁরা ইংরেজদের দাদাঠাকুর।

বিলেতের শাদা চোখে কৃষ্ণাঙ্গ বাঙালি

সেকালে যাঁরা বিলেত যেতেন, তাঁরা যে কেবল দেশ থেকে যাওয়ার সময়ে রক্ষণশীল সমাজের তরফ থেকে বাধার মুখোমুখি হতেন অথবা দেশে ফিরে আসার পর একঘরে হওয়ার বিপদে পড়তেন, তাই নয়, খোদ বিলেতেও তাঁদের বর্ণবিদ্বেষের শিকার হতে হতো। সাধারণভাবে বললে বলতে হয় যে, ইতেশাম উদ্দীন থেকে শুরু করে সেকালে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো মিশ্র প্রকৃতির। বিলেত সম্পর্কে নির্ভেজাল প্রশংসা করতে পারেননি তাঁরা।

১৭৬০-এর দশকে ইতেশাম উদ্দীন যখন যান, তখন সেখানে আয়া আর লস্কর ছাড়া কোনো বাঙালি ছিলেন না। বাঙালি কেন সম্ভবত কোনো ভারতীয়ও ছিলেন না। কাজেই তাঁর চেহারা, পোশাক এবং আচার-আচরণ দেখে তাঁর চারদিকের লোকেরা নিতান্ত কৌতূহল অনুভব করেছিলেন, বিদ্বেষ অনুভব করেননি। প্রকৃত পক্ষে, তিনি পরিণত হয়েছিলেন দর্শনীয় বস্তুতে। মানুষ যেমন কোনো আজব জন্তু দেখে তার দিকে তাকায়, সাধারণ লোকেরা তেমন দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখতেন। তাঁর প্রায় সওয়া শো বছর পরে যখন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলেতে যান, তখন তাঁরও একই কথা মনে হয়েছিলো, যদিও ততোদিনে বিলেতের লোকেরা ভারতীয়দের দেখতে

খানিকটা অভ্যস্ত হয়েছিলেন। ইতেশাম উদ্দীন যেভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন, তা খুব নির্ভরশীল না-ও হতে পারে। কারণ, তিনি ইংরেজি জানতেন না। তাঁকে দেখে অন্যরা কী মন্তব্য করছিলেন, তিনি তা জানতে পারেননি। সুতরাং তিনি তাঁর 'দর্শকদের' প্রতি অবিচার করে থাকতে পারেন। অপর পক্ষে, ত্রৈলোক্যনাথ ইংরেজি জানতেন বলে সেটা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর 'দর্শকরা' যদি জানতেন যে, তিনি ইংরেজি জানেন, তা হলে এ রকমের মন্তব্য করতেন না।

কিন্তু এই দুই ভিন দেশী ভিন চেহারার লোকেদের অভিজ্ঞতা কিছু অভিনব ছিলো না। ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় বাঙালি নারীদের সেবা করার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন অ্যানেট অ্যাক্রয়েড। তার অল্প দিন পরেই তিনি কেশব সেনের এক সভায় উপস্থিত হলে সেখানে তাঁর যে-অভিজ্ঞতা হয়, তিনি তাতে খুব আহত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তাঁর দিকে পুরুষরা যদি কামের দৃষ্টিতে তাকাতেন, তা হলে তিনি দুঃখ পেতেন না। কারণ সেটা সব দেশেই আছে। কিন্তু তাঁরা তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলেন এমনভাবে যেন তিনি মানুষ নন, বরং একটি অদ্ভুত জন্তু।

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেও এই অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। তবে তিনি সে কথা ক্ষোভের সঙ্গে লেখেননি। বরং লিখেছেন কৌতুকের সঙ্গে। বিশেষ করে তাঁর দুটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি যখন সবেমাত্র সেখানে গেছেন, তখন তাঁকে দেখে ছোটো ছেলেমেয়েরা বিস্ময়ের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'দেখো, দেখো, এই ব্ল্যাকিকে দেখো!' রবীন্দ্রনাথ নিজেকে 'কালুয়া' বলে মনে করতেন না, বরং নিজের চেহারা সম্পর্কে তাঁর মনে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিলো বলেই মনে হয়। সম্ভবত সে জন্যে এ কথা তিনি কৌতুকের সঙ্গে লিখেছিলেন। তেমনি, তিনি যখন ডক্টর স্কটের বাড়িতে অতিথি হিশেবে থাকতে আসেন, তখন কিম্ভূতকিমাকার একটা জন্তুর মতো মানুষ আসবে, এই ভয়ে বাড়ির দুই মেয়ে — ফ্যানি আর লুসি (বয়স বিশের কোঠায়) বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তারপর রবীন্দ্রনাথকে দেখে বাড়ির অন্যরা যখন তাঁদের খবর পাঠান যে, জন্তুটি অতো কুৎসিত নয়, তখন সেই মেয়েরা বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে দুই মেয়েই রবীন্দ্রনাথের প্রেমে পড়েছিলেন। বিশেষ করে ছোটো মেয়ে লুসি।

মোট কথা, সেকালে যাঁরা বিলেতে গিয়েছিলেন, এমন কি, একালেও যাঁরা যান, তাঁরা সবাই বর্ণবাদী সমস্যার মুখোমুখি হন — কম অথবা বেশি। মনে হয়, আবু তালিব বর্ণবাদী মনোভাবের তেমন শিকার হননি। অন্তত তাঁর রচনা থেকে এ কথা জানা যায় না। বরং বহু ইংরেজ নারীই যে তাঁকে দেখে পছন্দ করতেন এবং তাঁর সঙ্গে একটু মেলামেশা করতে চাইতেন — এই ধারণাই হয় তাঁর লেখা থেকে। হতে পারে, ইংরেজি অতো ভালো জানতেন না বলে তাঁর চারদিকের মনোভাব তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু রামমোহনের মতো সুদর্শন এবং অভিজাত ব্যক্তিকেও

বর্ণবাদী মন্তব্য শুনতে হয়েছিলো। শুনতে হয়েছিলো দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিকেও।

রামমোহন রায় অথবা দ্বারকানাথ অবশ্য সমাজের ওপর তলার লোকেদের কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার, এমন কি, যথেষ্ট সম্মানও লাভ করেছিলেন। আগেই উল্লেখ করেছি, এঁদের দুজনের মাঝখানে আর-একজন বাঙালি বিলেতে গিয়েছিলেন নিজের ভাগ্য গড়ার জন্যে — আনন্দচন্দ্র মজুমদার। কিন্তু তিনি ভাগ্যের উন্নতি করা দূরে থাক, চারদিকের বর্ণবাদী মনোভাবের কারণে দারুণ দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করেন। এমন কি, তাঁর খৃস্টান পরিচয়ও তাঁকে সাহায্য করতে পারেনি। তা ছাড়া, তিনি যে বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে, তাও তাঁকে বর্ণবাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি নিজের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে ঈস্ট ইন্ডিয়া কম্পেনির পরিচালকদের কাছে একটি আকুল আবেদন করেছিলেন, তাঁকে কিছু আর্থিক সাহায্য করার জন্যে এবং সম্ভব হলে একটি চাকরি দেওয়ার জন্যে। স্ত্রীর সম্পত্তি দিয়ে একটি ব্যবসা খোলারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তাতেও সফল হননি। নানা রকমের বিজ্ঞাপনে দেখে তিনি চাকরির জন্যেও খুব চেষ্টা করেছিলেন। তাও জোটেনি তাঁর ভাগ্যে। পূর্বোক্ত চিঠিতে তিনি লিখেছেন যে, তিনি যে বিদেশী সেটাই তাঁর একমাত্র অপরাধ।

> ... I came into this country, but for a considerable time I have not been able to obtain any situation, though I have lost no pains either to enquire after a situation or in answering the vast number of advertisement that have appeared in the public journals, but hitherto I have been unsuccessful. Honourable Sirs, I need not say that there is a strong apathy towards a stranger and a foreigner which I attribute to be the cause of not having obtained any employment. The little money we had through my wife, is by the misguidance of others lost in speculation in business, being a stranger in a strange country, I am obliged with deep regret and inexpressible shame to place before your Honourable Court, the lamentable and painful situation into which I am placed with my wife the few articles we had, we have been obliged to part with them in order to procure bread to sustain nature, but now we are placed in the most deplorable condition for want of means as much as that we are acutely deprived of the common necessities of life. Honoured Sirs, though these trials are great, yet, I think that I could endure them a little longer but I appeal to you, Honoured Sirs, is it not heart rendering to witness a poor female suffer, the feelings of a hindoo is as tender towards his wife, as that of any nation upon earth ...?

আনন্দচন্দ্র বাস করতেন ব্রিস্টলে। ব্রিস্টল তখন ছোটো শহর ছিলো। সুতরাং সেখানে বর্ণবাদ বেশি থাকাই সম্ভব। তা ছাড়া, ১৮৩০ থেকে ৫০-এর দশক পর্যন্ত খুব কম ভারতীয়ই দেখেছিলেন ইংল্যান্ডের লোকেরা। কিন্তু এর দু দশক পরেও অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি।

এটা বোঝা যায় দুই দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে — মাইকেল মধুসূদন এবং ক্ষেত্রমোহন। মাইকেল ফ্রান্স থেকে গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন যে, কালো রঙ দেখে ফ্রান্সে কেউ তোমাকে নিগার বলে গাল দেবে না। এ থেকে মনে হয় যে, এই গাল তাঁর মাঝেমধ্যে শুনতে হয়েছিলো ইংল্যান্ডে। এ ঘটনা ১৮৬২-৬৩ সালের। অপর পক্ষে, ক্ষেত্রমোহন দত্ত এর কয়েক বছর পরে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে এমডি পাশ করে ডাক্তার হন। তিনি যে ডাক্তারি শাস্ত্র ভালো করে শিখেছিলেন, তার একটা প্রমাণ তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি ডাক্তারিতে ভালো করতে পারেননি। সারা জীবনই তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করেছেন — এর আভাস পাওয়া যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এবং উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির কন্যা জানকী মজুমদারের লেখা থেকে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, তিনি ১৮৬৬ সালে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার জন্যে তাঁকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিলো। কিন্তু এমডি ডিগ্রি এবং শ্বেতাঙ্গিনী খৃস্টান স্ত্রী সত্ত্বেও তিনি ডাক্তারিতে বিশেষ জুত করতে পারেননি।

পরের দশকে ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তকেও একই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো। তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। ডাক্তার হয়ে তিনি ঠিক করেন যে, বিলেতেই কাজ করবেন। কাজ তিনি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু অনেক লড়াই করে তাঁকে টিকে থাকতে হয়েছিলো। তিনি সহজে চাকরি জোটাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত চাকরি পান লন্ডন থেকে দেড় শো কিলোমিটার দূরে লেস্টার শহরে। সেখানে কিছু টাকাকড়ি সঞ্চয় করে তিনি কেমব্রিজে এসে নিজে স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রবল বাধার মুখোমুখি হন উচ্চশ্রেণীর কাছ থেকে। তবে তিনি খুব কম পয়সায় চিকিৎসা করতেন বলে রোগী হিশেবে পেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের। তাঁদের মধ্যে তিনি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

কেবল এ রকমের ডাক্তার অথবা শিক্ষিত লোকেদেরই বর্ণবাদের শিকার হতে হয়নি, সাধারণ মানুষরাও একই সমস্যার মুখোমুখি হতেন। জানা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন ভারতীয় পেডলার অর্থাৎ ফেরিওয়ালারা স্কটল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে যান, তখন সেখানে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হন। লন্ডনের রাস্তায় যেসব ভারতীয় লস্কর ভিক্ষে করতেন অথবা কায়ক্লেশে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন, তাঁরাও অনেক সময়ে সাধারণ মানুষ এবং পুলিসের হাতে লাঞ্ছিত হতেন। এর একটি করুণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মাইকেল ফিশার, *A South Asian History of Britain* গ্রন্থে। মোহাম্মদ ইবরাহিম কলকাতা থেকে লস্করের কাজ নিয়ে লন্ডনে আসেন ১৮৪৪ সালে। পথে কোনো দুর্ঘটনায় তিনি অন্ধ হয়ে

যান। তাঁর জাহাজের ক্যাপ্টেন নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে লন্ডনে ফেলে চলে যান। আট বছর ইবরাহিম বেঁচে থাকেন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে। তাঁর সঙ্গে থাকতো তাঁর একটি কুকুর, খুব সম্ভব পথ চলায় সাহায্য করার জন্যে। ১৮৫২ সালে একদিন রাতের বেলায় এই কুকুরের খাবার জোটাতে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় ২৩ বছর বয়সী এলিজাবেথ অ্যালেনের সঙ্গে।

এই মহিলা ছিলেন ভদ্রঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে ফেলে লাপাত্তা হয়ে যান। এলিজাবেথের পিতামাতা তাঁদের কন্যাকে খুঁজে পান দরিদ্র-আশ্রমে। এর পর এলিজাবেথ কাজ করতে আরম্ভ করেন একটি দোকানে। কিন্তু সে দোকান উঠে গেলে তিনি রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে যা পেতেন, তাই দিয়ে জীবন ধারণ করতেন। ইবরাহিমের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এলিজাবেথ তাঁর সঙ্গেই বাস করতে আরম্ভ করেন। সকাল বেলায় বুকের সঙ্গে ভিক্ষা চাওয়ার একটি ফলক এঁটে দিয়ে ইবরাহিমকে এক রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসতেন এলিজাবেথ। ভালোই চলছিলো তাঁদের। কিন্তু একটি 'কুচকুচে কালো' ভারতীয় ভিখারির সঙ্গে ভদ্রঘরের এক ইংরেজ মহিলা বাস করবেন, এটা *টাইমস* পত্রিকার সহ্য হয়নি। এ দিকে মেয়রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মেয়র অথবা ভিক্ষুক সমিতির কর্মকর্তাদেরও এটা বরদাস্ত হয়নি। তাই মেয়রের হুকুমে বাধ্য হয়ে পুওরহাউসে যেতে হয় ইবরাহিমকে। আর এলিজাবেথের পিতামাতা তাঁকে জোর করে হয় ক্যালিফোর্নিয়া নয়তো অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেন দেশত্যাগীদের সঙ্গে।

এই বর্ণবাদী মনোভাব যে কেবল গরিব ভারতীয়দের প্রতি দেখানো হতো, তা নয়। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি তাঁর বড়ো দুই ছেলেমেয়েকে ১৮৭৫ সালে লন্ডনে রেখে যান লেখাপড়া শেখানোর জন্যে। এরা থাকতো কর্নেল উড নামে উমেশচন্দ্রের এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে টাকা-দেওয়া অতিথি হিশেবে। বড়ো মেয়ে নেলি পরে বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে বাড়িওয়ালি তাঁদের মারধর করতেন এবং কালুয়া বলে গাল দিতেন। কর্নেল উড এবং তাঁর স্ত্রী ভারতে বাস করেছিলেন অনেক বছর। কিন্তু তবু কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

তখন যে-ভারতীয় ছাত্ররা অক্সফোর্ড অথবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চেষ্টা করতেন, তাঁদের পক্ষে সেখানে ভর্তি হওয়াও সহজ ছিলো না। এ সমস্যা দেখা দেয় উনিশ শতকের শেষ দিকে — যখন ছাত্রদের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় বেশি কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রকে ভর্তি করতে আগ্রহী ছিলো না। কারণ তা হলে অভিজাত ইংরেজরা অস্বস্তি বোধ করবেন। এক-একটা কলেজে পাঁচ-ছজন ভারতীয় ছাত্র থাকবে — শিক্ষকরা এটা ভাবলেও আঁতকে উঠতেন। শতাব্দীর শেষ দিকে এডিনবরায় ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা বেশি বৃদ্ধি পায় (১৯০০ সাল নাগাদ ২০০)। তা সত্ত্বেও এডিনবরার বহু ছাত্রাবাসে তাঁদের থাকতে দেওয়া হতো না। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজেও বাড়ি ভাড়া পেতে অসুবিধে হতো। এর সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত জওহরলাল নেহরুর। তিনিও কেমব্রিজে পড়ার সময়ে সহজে বাড়ি ভাড়া করতে পারেননি।

বর্ণবাদের আর-একটা প্রকাশ ঘটতো বিবাহকে কেন্দ্র করে। অভিজাত বাঙালিদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরই সবার আগে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে ব্যারিস্টার এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বাংলা ও হিন্দু আইনের অধ্যাপক। বাস করতেন সাউথ কেনসিংটনের অভিজাত পাড়ায়। কিন্তু তাঁর দুই কন্যার কারো বিয়ে হয়নি। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। অপর পক্ষে, ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ। তাঁর পাঁচ কন্যারই বিবাহ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত লোকেন পালিতের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁদের বড়ো মেয়ে ম্যাবেলের। আইডার বিয়ে হয়নি। ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি বোর্ডিং হাউস চালাতেন তিনি। তার পরের মেয়ে লেইলা মানসিক রোগে অনেকবার মানসিক হাসপাতালে সময় কাটান। তারপরের মেয়ে রেনার বিয়ে হয় ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের একজন ডাক্তার, মিস্টার খানের সঙ্গে। আর ছোটো মেয়ে মুরিয়েল মা যতোদিন জীবিত ছিলেন, ততোদিন তাঁর দেখাশোনা করেন এবং তারপর আইডার সঙ্গে যোগ দিয়ে বোর্ডিং হাউস চালান। এঁদের একমাত্র ভাই নিউটনেরও বিয়ে হয়নি। ইংল্যান্ডে ভালো চাকরি না-পেয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি পিতার দেশ ভারতবর্ষে যান। সেখানে তিনি বরোদার মহারাজার লাইব্রেরির প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। আর ক্ষেত্রমোহন দত্ত মারা যান সমস্ত পরিবারকে দারিদ্র্যের মধ্যে রেখে।

উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সন্তানদের অবস্থা আর-একটু ভালো ছিলো। তাঁদের বড়ো মেয়ে এবং বড়ো ছেলে বিয়ে করেছিলেন ইংরেজ পরিবারে এবং ভদ্রঘরে। কিন্তু মেজ মেয়ে কেমব্রিজ থেকে পাশ করা ডাক্তার হলেও বিয়ে করতে পারেননি। অন্য সন্তানদের বিয়ে হয় ভারতীয়দের সঙ্গে।

যতোদিন বিলেতের মাটিতে ভারতীয়দের সংখ্যা খুব কম ছিলো, ততোদিন স্থানীয় লোকেরা ভারতীয়দের পছন্দ না-করলেও গ্রাহ্য করেননি। উৎপাত বলে গণ্য করেননি। কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে শিক্ষিত ভারতীয়দের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষেত্রমোহন দত্ত, অরুণচন্দ্র দত্ত এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের মতো ডাক্তার স্থানীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন, তখন স্বভাবতই স্থানীয় লোকেরা তাঁদের বিদ্বেষের চোখে দেখতে আরম্ভ করেন। এ সময়কার আর-একটা ঘটনাও অনেককে বিদ্বিষ্ট করেছিলো। এ ঘটনা হলো: সিপাহী বিপ্লব। ভারতবর্ষে বহু ব্রিটন নিহত এবং নিগৃহীত হয়েছিলেন — এ খবর ব্যাপকভাবেই বিলেতে প্রচারিত হয়েছিলো। অনেকের আত্মীয়স্বজন নিহতও হয়েছিলেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিলেতের বহু লোকের আক্রোশ গিয়ে পড়ে ব্রিটেনে যে-ভারতীয়রা বাস করছিলেন, তাঁদের ওপর। বস্তুত, তখন ভারতীয়দের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর আহ্বানও জানিয়েছিলেন অনেকে।

কিছু কালের মধ্যে সিপাহী-বিপ্লব পরবর্তী আক্রোশ কেটে গেলেও যতো দিন যেতে থাকে, ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবাদ ততোই প্রবল হতে থাকে। যেহেতু ব্রিটেনে বিরাট সংখ্যক ভারতীয় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে, সে জন্যে ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবাদী মনোভাবও তখন থেকে সমস্যা হিশেবে দেখা

দেয়। এ রকমের একটি বড়ো [illegible] দেয় ১৯১৯ সালে যখন ইংল্যান্ডে রীতিমতো বর্ণবাদী দাঙ্গা হয়। [illegible]াতেই বিষয়টা শেষ হয়ে যায়নি। ভারতীয়দের স্বদেশে ফেরত পাঠানো[illegible]ওঠে। সরকারও ভারতীয়দের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্যে সক্রিয় পদ[illegible]। বিশ শতকের বর্ণবাদী সমস্যা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা [illegible]

বাঙালি বসতির গোড়াপত্তন

পটভূমি

উনিশ শতকের প্রথম দিকে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরোধী এবং সৃষ্টি-ছাড়া ব্যাপার বলে গণ্য হলেও শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমাজের চোখে তা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অতি-রক্ষণশীল ছাড়া তখন কেউই তাকে আর একেবারে ধর্মবিনাশী বলে বিবেচনা করতেন না। বিলেতফেরত লোকেরাও সমাজের চোখে আর পুরোপুরি অসাধারণ থাকলেন না। এক কলকাতাতেই তখন খুঁজলে শ খানেক বাঙালি ব্যারিস্টার পাওয়া যেতো। বস্তুত, যাঁদের সঙ্গতি ছিলো তাঁরা ডাক্তারি, ব্যারিস্টারি এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখার জন্যে বিলেত যেতে মোটেই কুণ্ঠিত বোধ করতেন না। এর চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো: শুধু লেখাপড়া শেখার জন্যে নয়, বরং অনেকে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ভূস্বর্গে যেতে আরম্ভ করেন একবার তা দেখার জন্যে অথবা সেখানে গিয়ে জীবনটা উপভোগ করার জন্যে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বিলেতেই থেকে যান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছু লস্কর শ্রেণীর লোক ছাড়া প্রথম দিকের বসতি-স্থাপনকারীরা প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত লোক — ডাক্তার, ব্যারিস্টার আইনজীবী ইত্যাদি। শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে তাঁরা ইংরেজ রমণী বিয়ে করে সেখানেই থেকে যান। যেমন, জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, অরুণ দত্ত প্রমুখ। অথবা শিক্ষা গ্রহণের পর দেশে ফিরে গেলেও শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সূত্রেই যাঁরা বিলেতে বসতি স্থাপন করেন। যেমন, রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র এবং সৈয়দ আমীর আলি।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ঠিক এই শ্রেণীতে পড়েন না। নিজের চিকিৎসা করার প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে গিয়ে তিনি সেখানেই থেকে যান। ১৮৬৫ সালের শেষে বছর পাঁচেকের জন্যে তিনি দেশে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি করেছিলেন। তবে তিনি দেশে ফিরেছিলেন পৈতৃক সম্পত্তি লাভের উদ্দেশে, নাকি সত্যি সত্যি দেশে বাস করার জন্যে, বলা শক্ত। ১৮৬৯ সালে প্রথমে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এবং তারপর স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি দুই কন্যাকে নিয়ে স্থায়ীভাবেই বিলেতে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ করতেন কিনা, আমার জানা নেই। তবে তিনি আর সেখান থেকে কখনো কলকাতায় ফিরে যাননি। বিলেতেই তিনি মারা যান ১৮৯০ সালে।

এ রকম বিলেতে থেকে যাওয়ার ইচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও ছিলো। তাই বন্ধু

বিদ্যাসাগরের নিষেধ সত্ত্বেও ১৮৬৭ সালে তিনি ফ্রান্সে নিজের পরিবার রেখে এসেছিলেন। গৌরদাস বসাককে তিনি লিখেছিলেন যে, ইউরোপই হলো ধরাধামে বাস করার সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা, যদি মাঝেমধ্যে ইউরোপ থেকে দেশে গিয়ে ঘুরে আসার মতো টাকা থাকে। সে টাকা তাঁর ছিলো না। তাই টাকা আয় করার জন্যে তিনি অগত্যা দেশে ফিরে আসেন। তাঁর পরিবার যে বছর আড়াই পরে কলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়, তার কারণ তিনি তাঁদের যথেষ্ট টাকা পাঠাতে পারছিলেন না।

জ্ঞানেন্দ্রমোহনের মতো স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করে সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, এমন আর-একজন ছিলেন ক্ষেত্রমোহন দত্ত। ১৮৬৬ সালের জুন মাসে তিনি উত্তর লন্ডনের যে-বাড়িতে টাকাপয়সা দিয়ে অতিথি হিশেবে বাস করতেন, সেই বাড়ির কন্যাকে বিয়ে করেন। অতঃপর তাঁর পাঁচটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মে ছিলো। একে তিনি কালাপানি পার হয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন, তার ওপর তিনি সেখানে খৃস্টান হয়ে অভিভাবকদের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করেছিলেন। সুতরাং তিনি দেশে ফিরে আসার কথা ভেবে থাকলেও ফিরে আসার ভারসা পাননি।

সন্তানদের ইউরোপীয় শিক্ষা দান করে ইউরোপীয় করে তোলার উদ্দেশে ১৮৭৪ সালের গোড়ার দিকে স্ত্রী এবং সন্তানদের বিলেতে পাঠিয়েছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বলতে গেলে তিনি ছিলেন দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এক দিকে তিনি ছিলেন প্রবল জাতীয়তাবাদী। ভারতবর্ষের জন্যে বর্ধিত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে যাঁরা একেবারে প্রথম দিকে রাজনীতি শুরু করেছিলেন, তিনি তাঁদের একজন। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলে, ন্যায়তই তাঁকে তার প্রথম সভাপতি করা হয়। অন্য দিকে, ইংরেজি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিশেষ করে সে দেশের উদারতা ও যুক্তিবাদ এবং উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো। আর আকৃষ্ট করেছিলো নারীদের উন্নত অবস্থা। নিজের পরিবারেও তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন সেই সভ্যতার আলোক।

তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী লেখাপড়া জানতেন না। ওদিকে, উমেশচন্দ্র বিলেতে শিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর যে-সম্পর্ক দেখে এসেছিলেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, একজন অশিক্ষিতা স্ত্রীর সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই দেশে ফিরেই তিনি প্রথমে স্ত্রীকে লেখাপড়া শোখানোর জন্যে উঠে-পড়ে লাগেন। তাঁকে তিনি কেবল শিক্ষিত করে তোলেননি, বরং পোশাকে-আশাকেও ইংরেজ করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। পেটিকোট এবং ব্লাউজ ছাড়া তখন বাঙালি মহিলারা যেভাবে শাড়ি পরতেন, উমেশচন্দ্র তা আদৌ মেনে নিতে পারেননি। বিলাতফেরত অন্য পুরুষরাও পারেননি। সে জন্যে তিনি স্ত্রীকে ইংরেজি পোশাক পরতে বাধ্য করেন। তাঁর স্ত্রী যখন শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখন পথে গাড়িতে বসে গাউন ছেড়ে শাড়ি পরতেন। আবার বাড়িতে ফেরার পথে শাড়ি ছেড়ে গাউন পরতেন। তাঁদের বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি রান্না করতেন। লোকাচার তো দূরের কথা উমেশচন্দ্র হিন্দু ধর্মেও বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি মুসলমান বাবুর্চির রান্না-করা গোরুর

মাংস পরমানন্দে উপভোগ করতেন। কিন্তু তাঁর কন্যা জানকীর মতে, হেমাঙ্গিনী প্রথম দিকে খুবই অস্বস্তি বোধ করতেন, যদিও ধীরে ধীরে তিনি তাঁর মানসিক বাধা কাটিয়ে ওঠেন। হিন্দু ধর্ম থেকেও দূরে সরে যান তিনি। এমন কি, বহু বছর পরে (১৮৮৮ সালে) খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেন। অপর পক্ষে, উমেশচন্দ্র আনুষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন বলে মারা যাওয়ার আগে নির্দেশ দিয়ে যান যে, তাঁর শেষকৃত্যের সময়ে যেন কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা না-হয়।

যখন স্ত্রী এবং সন্তানদের ইউরোপে পাঠান, তখন আইন ব্যবসা নিয়ে উমেশচন্দ্র দারুণ ব্যস্ত ছিলেন। তাই নিজে তাঁদের সঙ্গে যেতে পারেননি। হেমাঙ্গিনীর আগে কোনো বাঙালি নারী স্বামী ছাড়া কেবল সন্তানদের নিয়ে বিলেতে যাননি। তাঁর সঙ্গে একই জাহাজে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সূর্য গুডিব চক্রবর্তী। উমেশচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন এঁদের দেখাশোনা করতে। কিন্তু তিনি নাকি তাঁদের কোনো খোঁজখবর নেননি। সে যাই হোক, হেমাঙ্গিনী যে-তিন সন্তান নিয়ে বিলেত যান, তাঁরা হলেন কমলকৃষ্ণ (জন্ম ১৮৭০), নলিনী (জন্ম ১৮৭১) এবং সুশীলা (জন্ম ১৮৭২)। তখন হেমাঙ্গিনী ছিলেন গর্ভবতী। কয়েক মাস পরে — ১৮৭৪ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর চতুর্থ সন্তান — কালীকৃষ্ণ উডের জন্ম হয় দক্ষিণ লন্ডনের যে-বাড়িতে হেমাঙ্গিনী তাঁর সন্তানদের নিয়ে বাস করতেন, সেখানে। এ বাড়ি ছিলো কলকাতা প্রত্যাগত কর্নেল ও মিসেস উডের। তাঁদের নাম হেমাঙ্গিনী পুত্রের নামের সঙ্গেও জুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মিসেস উড এই কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানগুলোকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন না। বেশ ক বছর উমেশচন্দ্রের বড়ো দুই সন্তান এই বর্ণবাদী পরিবারেই নানা রকমের নির্যাতনের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হন।

১৮৭৫ সালের পুজোর ছুটিতে উমেশচন্দ্র বিলেতে যান এবং কনিষ্ঠ সন্তান সুশীলা, শিশু পুত্র কালীকৃষ্ণ ও স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। এর পর তাঁরা কলকাতা এবং লন্ডনের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকেন। ১৮৭৮ সালে যেমন তাঁরা লন্ডনে গিয়ে লেখাপড়ার জন্যে সুশীলা এবং ১৮৮২ সালে পুত্র কালীকৃষ্ণকে রেখে আসেন। অন্য সন্তানদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা হয়েছিলো। ১৮৮৮ সালে স্থায়ীভাবে লন্ডনে বাস করতে আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত হেমাঙ্গিনী বেশির ভাগ সময় কলকাতাতেই থাকতেন। ঐ বছর তাঁদের সবার ছোটো সন্তান জানকীর জন্মের পর তিনি পরিবার নিয়ে স্থায়ীভাবে লন্ডনে চলে যান, যদিও তারপরও তাঁরা বঙ্গদেশ আর বিলেতের মধ্যে আসা-যাওয়া করতেন। ধীরে ধীরে হেমাঙ্গিনী মেম সাহেবই হয়ে ওঠেননি; আগেই বলেছি, খৃস্টধর্মও গ্রহণ করেন, যদিও তিনি যে খুব ধার্মিক হয়েছিলেন, তা নয়।

তাঁদের সন্তানরা সবাই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। নিজেদের তাঁরা খৃস্টান বলেই চিহ্নিত করতেন। বড়ো মেয়ে — নলিনী প্রথমে কেমব্রিজের গ্যর্টন কলেজ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস লাভ করেন। তাঁর আগে কোনো বাঙালি মেয়ে ট্রাইপস ডিগ্রি পাননি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মেয়েদের জন্যে গ্যর্টন কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৮৭ এবং ১৮৯০ সালে এই কলেজ থেকে দুজন নারী

প্রথম ট্রাইপস করেন। তবে সেকালে মেয়েরা ট্রাইপস করলেও তাঁদের ডিগ্রি দেওয়ার পরিবর্তে দেওয়া হতো স্যার্টিফিকেট। (তাঁদের প্রথমে ডিগ্রি দেওয়া হয় ১৯২১ সালে।) নলিনী এর পর লন্ডন থেকে এমবি পাস করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি এক স্কটিশ ব্যারিস্টারকে বিয়ে করে লিভারপুলে ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করেন। ১৯২২ সালে বঙ্গদেশে ফিরে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে সেবামূলক কাজকর্ম করেন।

নলিনীর পরের বোন সুশীলাও কেমব্রিজের নিয়েনহ্যাম কলেজ থেকে ট্রাইপস লাভ করে লন্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করেন, যদিও এমবি হতে পারেননি। তৃতীয় বোন মিলি নিউয়েনহ্যাম কলেজ থেকে ক্ল্যাসিকসে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন ১৯০৩ সালে। কনিষ্ঠ কন্যা জানকীও নিয়েনহ্যাম কলেজ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস করেছিলেন



গার্টন কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে নলিনী ব্যানার্জি। সামনের সারিতে একেবারে বাঁয়ে।

১৯০৭ সালে। কেবল মেয়েরা নন, উমেশচন্দ্রের পুত্ররাও উচ্চশিক্ষিত হয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র কমলকৃষ্ণ শেলি অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি এবং লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন ১৮৯৩ সালে। তারপর ইংরেজ স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় এসে ব্যারিস্টার হিশেবে কাজ করেন। তাঁর অন্য দু ভাইও অক্সফোর্ডে ডিগ্রি নিয়ে এবং ব্যারিস্টার হয়ে একজন মাদ্রাস এবং একজন রেঙ্গুনে প্র্যাক্টিস করেন।

দক্ষিণ লন্ডনের ক্রয়ডনে একটি বিরাট বাড়ি কিনে উমেশচন্দ্র সেই বাড়ির নাম দিয়েছিলেন খিদিরপুর — কারণ তাঁর নিজের জন্ম হয়েছিলো খিদিরপুরে। অবসর নেওয়ার পর তিনি নিজেও স্থায়ীভাবে লন্ডনে চলে যান। ১৯০২ সাল থেকে তিনি

প্রিভি কাউন্সিলে কাজ করতেন। এই বাড়িতেই ভারতীয় ছাত্রদের মিলন হতো প্রতি সপ্তাহে — বিশেষ করে রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের। নিজেও তিনি বিলেতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৯৮ সালের নির্বাচনে লিবারেল দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রধানত বর্ণবাদী কারণে নির্বাচিত হতে পারেননি। শখ করে বাড়ির নাম খিদিরপুর দিলেও শেষ পর্যন্ত খিদিরপুরে নয়, ১৯০৬ সালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ক্রয়ডনে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, কট্টর জাতীয়তাবাদী রাজনারায়ণ বসুর জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষ স্কটল্যান্ড থেকে লেখাপড়া শিখে প্রথমে ভাগলপুরে, তার পর রংপুর এবং সবশেষে খুলনায় ডাক্তারি করেন — প্রথমে সহকারী স্যর্জন এবং পরে সিভিল স্যর্জন হিশেবে। পেশা যা-ই হোক, তাঁর নেশা ছিলো জনসেবা করার। খুলনায় তিনি বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং এখানেই অপরিণত বয়সে আকস্মিকভাবে মারা যান। তাঁর চরিত্রেও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একটা স্ববিরোধ লক্ষ্য করি এখানটায় যে, তিনি স্বদেশবাসীর সেবা করলেও নিজের সন্তানদের বিলেতে লেখাপড়া শিখিয়ে তাঁদের পুরোপুরি ইউরোপীয়ান করে তোলার ইচ্ছা করেছিলেন। এই উদ্দেশে তিনি তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী স্বর্ণলতা, তিন পুত্র — বিনয়ভূষণ, মনোমোহন আর অরবিন্দ এবং কন্যা সরোজিনীকে নিয়ে বিলেতে যান ১৮৭৯ সালের প্রথম ভাগে। তখন বিনয়ের বয়স সম্ভবত বারো, মনোমোহনের দশ আর অরবিন্দের সাত বছরের চেয়ে কয়েক মাস কম। বারীন্দ্রের তখনো জন্মই হয়নি। দক্ষিণ লন্ডনের একটি পরিবারের সঙ্গে স্ত্রী এবং সন্তানদের রেখে কৃষ্ণধন অগস্ট মাসে ফিরে আসেন। পরের মার্চ মাসে তাঁর স্ত্রী তিন মাসের বারীন্দ্র এবং সরোজিনীকে নিয়ে দেশে ফেরেন।



আলিপুর মামলার ঠিক আগে–
১৯০৮ সালে, অরবিন্দ

বিনয়, মনোমোহন এবং অরবিন্দ প্রথম পাঁচ বছর স্কুলের লেখাপড়া শেখেন ম্যানচেস্টারের এক গ্র্যামার স্কুলে, তারপর লন্ডনের সেন্ট পলস স্কুলে। অরবিন্দ এবং মনোমোহন — দুজনই প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। বৃত্তি পেয়ে মনোমোহন পড়তে যান অক্সফোর্ডে আর অরবিন্দ কেমব্রিজে। বিনয় অতো ভালো ছাত্র ছিলেন না। তাঁদের বছরে ৩৬০ পাউন্ড করে পাঠানোর কথা থাকলেও, কৃষ্ণধন নিয়মিত টাকা পাঠাতেন

না। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত তাঁর বেতন ছিলো চার শো টাকার কম। সেটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, নিয়মিত টাকা না-পাঠানোর ফলে তিন পুত্রই অভাবের মধ্যে সময় কাটাতেন, বিশেষ করে শেষ পাঁচ বছর। নিয়মিত টাকাপয়সা পাঠানোর জন্যে মনোমোহনের টিউটরও অক্সফোর্ড থেকে একাধিক বার কৃষ্ণধনকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। এই টানাটানির জন্যে মনোমোহন অক্সফোর্ডে তাঁর লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। অপর পক্ষে, অরবিন্দ খুব কৃতিত্বের সঙ্গে ১৮৯৩ সালে ট্রাইপস লাভ করেছিলেন। তিনি ল্যাটিন ও গ্রীক-সহ অনেকগুলো ইউরোপীয় ভাষা শেখেন। তা ছাড়া, ১৮৯২ সালে তিনি আইসিএস প্রতিযোগিতায় ভালোভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

কেমব্রিজে ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ভারতীয়দের জন্যে যে 'মজলিশ' স্থাপন করেছিলেন, সেখানে অরবিন্দ গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতেন। বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন যে, এসব বক্তৃতার জন্যেই অরবিন্দের ওপর সরকারের 'সুনজর' পড়েছিলো এবং তাঁকে আইসিএস প্রতিযোগতায় অযোগ্য ঘোষণার আসল কারণ এটাই। সে যাই হোক, স্বাদেশিকতায় অরবিন্দের হাতে-খড়ি হয়েছিলো সেখানেই। দেশে ফিরে এসে সরকারী চাকরি করেননি তিনি। বিনয়ও নন। তাঁরা ১৮৯৩ সালে দেশে ফিরে টাকা পাঠিয়ে মনোমোহনকে ঋণমুক্ত করার পর তিনি তার পরের বছর দেশে ফিরে আসেন।

ভাগ্যের পরিহাস, কৃষ্ণধন পুত্রদের ইউরোপীয় করে তোলার অভিপ্রায় পোষণ করলেও এবং তাঁরা বিলেতে মানুষ হলেও, বিশেষ করে অরবিন্দ এবং বারীন্দ্র, স্বাদেশিকতা দিয়ে আপাদমস্তক প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা বিলেতে বাস করে সাহেব হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, আর পুত্ররা বিলেতে বাস করে কট্টর স্বদেশীতে পরিণত হন। পুত্র একদিন সাহেব হয়ে উঠবে — এই আশায় পিতা অরবিন্দের নাম রেখেছিলেন অরবিন্দ অ্যাক্রয়েড। কিন্তু অরবিন্দ খৃস্টানি থেকে যোজন যোজন দূরে গিয়ে প্রাচীন ভারতে আশ্রয় নেন। বস্তুত, তাঁরা তিন ভাই স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন।

বিলেতে বাস করে তাঁদের পিতা কৃষ্ণধনের মতো মনের দিক থেকে বিলেতি হওয়ার বাসনা অনেকেরই ছিলো। যেমন, আমরা আগেই ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন এবং ডাক্তার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করেছি। উপেন্দ্রকৃষ্ণের জ্ঞাতি অরুণচন্দ্র দত্তও ফিরে আসেননি। ফিরলে বিলেতফেরত অন্য ডাক্তারদের মতো তাঁরাও সাফল্য অর্জন করতেন বলে ধরে নিচ্ছি। কিন্তু তা না-করে শত প্রতিকূলতা এবং বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েও বিলেতের মাটিতেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। একটু বেশি বয়সে উপেন্দ্রকৃষ্ণ এক বিদেশিনীকে বিয়ে করেন এবং আধাদেশী আধাবিদেশী দুই সন্তানের — ক্লেমেন্স এবং রজনী পামের — জনক হন। অরুণচন্দ্রও বিদেশিনী বিয়ে করেছিলেন। এই তিনজনের মতো, ডাক্তারদের মধ্যে রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রও শেষ পর্যন্ত বিলেত বাস করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার ধারণা, আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও রমেশচন্দ্র দত্তের মধ্যেও এই বিলেত-প্রীতি ছিলো। ১৮৮৪ সালে তিনি সপরিবারে বিলেতে গিয়েছিলেন ফার্লো কাটাতে। ১৮৯৩ সালেও বিলেত এবং ইউরোপ সফর করেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী থেকে বিলেতের প্রতি তাঁর মুগ্ধতার ভাব বেশ ধরা পড়ে। হয়তো এই বিলেতিয়ানার জন্যেই ১৮৯৭ সালে তিনি তাঁর অতো বড়ো আইসিএসের পদ ফেলে বিলেতে গিয়ে বাস করতে শুরু করেছিলেন। তাঁর আশা ছিলো তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপনার পদ জোটাতে পারবেন। কিন্তু সেখানে বছর তিনেকের জন্যে প্রভাষক হলেও কাজের ধরন অথবা বেতন কোনোটা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। জুত করতে না-পারায় তিনি তাই কয়েক বছর পরে আবার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্তের মতো আপাদমস্তক বিলেতপ্রেমী। প্রবীণ আইসিএস কর্মকর্তা হিশেবে ১৯০৪ সালে অবসর নেওয়ার বছর তিনেক পরে তিনিও পরিবার নিয়ে বিলেতে চলে গিয়েছিলেন। তবে স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন কিনা, সে তথ্য জোগাড় করতে পারিনি।

জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলীও ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। আর মুসলিম জাতীয়তাবাদী বললে তো কথাই নেই। সেই আমীর আলীও বারবার বিলেতের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন। তিনি দ্বিতীয়বার বিলেতে যান ১৮৭৯ সালে। তারপর ১৮৯৫ সালে। ১৯০৪ সালে হাইকোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি স্থায়ীভাবে লন্ডনে গিয়ে বসবাস করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বিয়েও করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে — ইজাবেল কন্‌স্ট্যামকে। রোজিনা বিশ্রামের মতে, তিনি বিয়ে করেন ১৮৮৪ সালে। কিন্তু আমি এ তথ্য যাচাই করে দেখিনি। তাঁর আত্মজীবনী থেকে তাঁর বিলেতপ্রীতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

তাঁর পুত্র তারিক আমীর আলি পিতার সঙ্গে বিলেতে এসে স্কুল-কলেজের শিক্ষা গ্রহণ করার পর ব্যারিস্টার হন। লন্ডনে তিনি আইন ব্যবসায় করেছিলেন কিনা, জানিনে। কিন্তু কলকাতায় করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি হন ১৯৩১ সালে। এই পদে তিনি ১৯৪৪ সাল অবধি অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর ইংরেজ স্ত্রীকে নিয়ে বিলেতে ফিরে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন তিনি।

মোট কথা, উনিশ শতকের শেষ পঁচিশ বছরে নতুন একটা মনোভাব দেখা দেয় — কেবল বিলেত গিয়ে শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে আসার মনোভাব নয় — অর্থাৎ বিলেতফেরত হওয়ার বাসনা নয়, বরং বিলেতবাসী হওয়ার মনোভাব। এভাবেই অত্যন্ত ধীর গতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিলেতে বাঙালিদের বসতি গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। এবং বিংশ শতাব্দী শেষ হবার আগেই মূল বঙ্গভূমি, ত্রিপুরা এবং অসমের পরে সবচেয়ে বড়ো বাঙালি বসতি গড়ে ওঠে সুদূর বিলেতের শীতল মাটিতে, যাকে মাইকেল মধুসূদন একদিন বলেছিলেন, *"Far away – far away ... the land ... beneath the colder ray."* কিন্তু কী করে ঘটলো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এই পরিবর্তন?

বসতি স্থাপনের সূত্রপাত

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কারা ব্রিটেনে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের তথ্য এখন খুব সামান্যই জানা যায়। ঢালাওভাবে জানা যায় ভারতীয়দের কথা, আলাদা করে বাঙালিদের কথা নয়। ঢালাওভাবে আর যা জানা যায়, তা হলো: প্রথম দিকে যে-বাঙালিরা আসতেন, তাঁদের জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন, তাঁরা আসতেন কলকাতা থেকে। কারণ সেখানেই ছিলো শিক্ষার কেন্দ্র এবং জাহাজের ঘাঁটি। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন ধনী অথবা মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আর ধর্মীয় পরিচয়ে প্রায় সবাই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। শিক্ষাদীক্ষায় তাঁরাই তখন এগিয়ে ছিলেন। সাধারণত চিকিৎসাবিদ্যা, আইন, মানবিক বিদ্যা অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এঁরা সাগর পাড়ি দিতেন। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা আরও বড়োলোক এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হতেন। কিন্তু বিশ শতকে কেউ কেউ আসতে আরম্ভ করেন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে নয়, বরং বিলেতের মাটিতেই স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে।

যে-বাঙালিরা কখনো প্রবাসকে শ্রেয় বলে গণ্য করেননি, সেই বাঙালিরাই প্রবাসে স্থায়ীভাবে বাস করার যে-মনোভাব দেখাতে আরম্ভ করেন, তাকে অবশ্যই অসাধারণ বলে বিবেচনা করতে হয়। এ মনোভাব স্পষ্টভাবে দেখা দেয় প্রথম মহাযুদ্ধের পর। তখন যাঁরা স্থায়ীভাবে বিলেতে থেকে যান, তাঁরা ছিলেন কেউ ডাক্তার, কেউ আইনজীবী। তা ছাড়া, অনেকে ছোটোখাটো কাজও করতেন। তারই মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে অনেকের জন্যে নতুন পথ খুলে যায়। তখন কয়েকজন ছাত্র অন্যদের অবাক করে দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে।

এ রকমের একজন ছিলেন ইন্দ্রলাল রায়। তাঁর পিতা প্যারীলাল রায় বরিশালের অদূরে লাখুটিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও বাল্যকালেই আধুনিকতায় দীক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁদের পরিবারের অনেকেই ছিলেন ব্রাহ্ম। ১৮৬০-এর দশক থেকে এই পরিবারের মহিলারা পর্দা ভেঙেছিলেন। সাহেবদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে ভোজ দিয়েছিলেন পরিবারের কর্তারা। মহিলারা বরিশাল শহরে প্রকাশ্যে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে খবরে পরিণত হয়েছিলেন। ১৮৭০-এর দশকে প্যারীলাল লন্ডনে এসেছিলেন ব্যারিস্টার হতে। ব্যারিস্টার তিনি হয়েওছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি — পাশ্চাত্যের প্রীতিতে তিনি আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি বিয়েও করেছিলেন বিলেতফেরত প্রথম ডাক্তারদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিবান সূর্য গুডিব চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কন্যা অ্যানিকে। অ্যানির মা ছিলেন এক মালয়ী খৃস্টান। এ রকমের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে পুরোপুরি ইউরোপীয় শিক্ষায় মানুষ করতে চাইবেন, তাতে অবাক হওয়ার কারণ নেই। তাই পুত্রের বয়স যখন মাত্র দশ, তখন — ১৯০৮ সালে — প্যারীলাল

তাঁকে নিয়ে সপরিবারে বিলেতে আসেন। ইন্দ্রলাল কোথায় কোথায় লেখাপড়া শিখেছিলেন, আমার তা জানা নেই। তবে স্যান্ডহ্যর্স্টে সামরিক শিক্ষা নিয়ে তিনি কমিশন লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ততো দিনে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিলো।

বাঙালিরা সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন না — এই অপবাদ সত্ত্বেও তিনি বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন। সম্ভবত বর্ণবাদী কারণেই, তাঁকে জঙ্গীবিমান চালাতে না-দিয়ে প্রকৌশলী হিশেবে রাখার চেষ্টা করা হয়। এমন কি, একবার তাঁকে অযোগ্যও



ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ, লন্ডন, ১৯০৯ সাল। পেছনে পার্লামেন্ট ভবন এবং বিগ বেন

ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তিনি বৈমানিক হওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেননি। শেষ পর্যন্ত ১৯১৭ সালে বৈমানিক হয়ে তিনি ফ্রান্সে লড়াই করতে গিয়ে প্রথম দু সপ্তাহের মধ্যে দশটি শত্রু-বিমান ভূপাতিত করেন। অতঃপর বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিজেই নিহত হন — মাত্র উনিশ বছর বয়সে। তাঁর এই অসাধারণ কীর্তির জন্যে তিনি বিমান বাহিনীর সর্বোচ্চ ডিএফসি খেতাব লাভ করেন। অন্য আর-একজন মাত্র বৈমানিক দশটিরও বেশি বিমান ভূপাতিত করার রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা করেছিলেন অনেক দিন ধরে লড়াই করার পর।

আর-একজন বাঙালি প্রথম মহাযুদ্ধে বিমানবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন — উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির পৌত্র কিউ ব্যানার্জি। তিনিও পিতামাতার সঙ্গে বিলেতে এসেছিলেন সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্যে। তাঁর মা ছিলেন ইংরেজ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে,

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও একজন বাঙালি ডিএফসি খেতাব পেয়েছিলেন। তাঁর নাম করুণকৃষ্ণ মজুমদার। তিনি ছিলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির ছোটো মেয়ে জানকী মজুমদারের পুত্র। তবে করুণকৃষ্ণ ইংল্যান্ডে বিমান চালানোর শিক্ষা নিলেও, যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন বর্মায়।

এ ছাড়া জানা যায় ডাক্তারদের কথা। যেমন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির ভাগ্নে কল্যাণ মুখার্জি বিলেতে চিকিৎসাবিদ্যা শিখে লিভারপুল-সহ কয়েক জায়গায় কাজ করেছিলেন। তারপর ১৯১৪ সালে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে ডাক্তার হিশেবে যোগ দেন। তাঁকে পাঠানো হয় মেসোপটেমিয়ায়। সেখানে তুর্কীদের হাতে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত তুর্কীদের কারাগারেই অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারান তিনি।

সৈন্যবাহিনীতে এ রকম দুচারজন যোগ দিলেও, স্থায়ীভাবে যে-ডাক্তাররা বিলেতে বসতি স্থাপন করেন, তাঁরা পেশাদারি কাজই করতেন। বলতে গেলে এঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা থেকে আসা হিন্দু ডাক্তার। তখন বাঙালি মুসলমান ডাক্তার এতো কম ছিলেন যে, তাঁদের মধ্য থেকে বিলেতে আসার সম্ভাবনা ছিলো খুবই কম। এই ডাক্তারদের বেশির ভাগের নাম এবং পরিচয় এখন হারিয়ে গেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে-বাঙালি ডাক্তাররা বিলেতে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে খুব পরিচিতি লাভ করেছিলেন সুখসাগর দত্ত। তাঁর বড়ো ভাই কানাইলাল দত্ত ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী। ১৯০৮ সালে আলিপুর জেলে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর দায়ে যে-তিনজনের ফাঁসি হয়েছিলো, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তাঁর পরিবার তাই ছোটো ভাইকে কম বয়সেই বিলেতে পাঠিয়ে দেয়, যদিও তারপরও তাঁর ওপর পুলিশের নজরদারি ছিলো। এখানে লেখাপড়া শিখে তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন ব্রিস্টলে। ভালো ডাক্তার হিশেবে তিনি যেমন সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তেমনি সুপরিচিত হয়েছিলেন লেবার দলের স্থানীয় নেতা হিশেবে। ১৯৬৭ সালে মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি লেবার দলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনেও তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিলো। তা ছাড়া, ১৯৪৭ সালে ব্রিস্টলে তিনি একটি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি সিভিল ডিফেন্সের কর্মী হিশেবেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯২০-এর দশকে এ রকমের আর-একজন ডাক্তার ছিলেন সতীশচন্দ্র সেন। তিনি বসতি স্থাপন করেন পুব লন্ডনের ক্যানিং টাউনে। ডি এন দত্ত ছিলেন আর-একজন ডাক্তার। তিনি কাজ করতেন উত্তর-পশ্চিম লন্ডনে। তাঁর স্ত্রী সমাজসেবিকা হিশেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

তাঁদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য না-থাকলেও এ কথা জানা যায় যে, তখন আরও অনেক ডাক্তার এসেছিলেন বঙ্গদেশ থেকে। বস্তুত, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় ডাক্তারদের সংখ্যা ধীরে ধীরে এতোটাই বৃদ্ধি পায় যে, তিরিশের দশকে তাঁরা একটি ভারতীয় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করেন। ১৯৪৫ সাল নাগাদ এই ডাক্তারদের সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে লন্ডনেই ছিলেন শ দুয়েক। এঁদের ভেতর বাঙালিদের অনুপাত কী ছিলো, তার অবশ্য কোনো পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু কিরণচন্দ্র

ভট্টাচার্য এবং হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের মতো ডাক্তারের কথা এখনো অনেকের মনে আছে। বাঙালি ডাক্তারদের সংখ্যা অন্য প্রদেশগুলোর থেকে বেশি ছিলো বলেই ধারণা করি। কারণ ইংরেজি শিক্ষার মতো চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাও কলকাতাতেই সবার আগে শুরু হয়েছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গত অর্ধ-শতাব্দীতে উপমহাদেশ থেকে এতো ডাক্তার এসেছেন যে, ব্রিটেনের বর্তমান জাতীয় স্বাস্থ্য সার্ভিসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ডাক্তারই ভারতীয় উপমহাদেশের। নার্সদের মধ্যেও একটা বড়ো অংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তবে সুনির্দিষ্ট করে বলা শক্ত, এই ডাক্তারদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা কতো।

ব্রিটেনে বাংলাদেশের ডাক্তারদের যে-সমিতি আছে, তার বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ শো। পূর্ব বাংলার এই ডাক্তাররা আসতে আরম্ভ করেন ১৯৬০-এর দশক থেকে। অনুমান করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। কারণ চিকিৎসাবিদ্যাতে তাঁরা মুসলমানদের তুলনায় কেবল যোজন যোজন এগিয়ে ছিলেন না, তাঁরা বিলেতে আসতেও আরম্ভ করেন অনেক আগে থেকে।

পেশাদারদের মধ্যে দুজন বাঙালি সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করেছেন রোজিনা বিশ্রাম। এঁরা হলেন কেমব্রিজ থেকে গণিতে ডিগ্রি-প্রাপ্ত পুলিনবিহারী শীল এবং বি বি রায়চৌধুরী। গণিতে ডিগ্রি করেও পুলিনবিহারী সাংবাদিকতায় নামেন — এ থেকে বোঝা যায় যে, বিলেতে থাকার জন্যেই তিনি নিজের বিদ্যাকে কাজে না-লাগিয়ে অন্য পেশায় ঢুকেছিলেন। এ রকমেরই আর-একজন — তারাপদ বসু পিএইচডি করেছিলেন ইতিহাসে। কিন্তু লন্ডনেই থেকে যান *আনন্দবাজার পত্রিকার* সাংবাদিক হিশেবে। কমল বসুও লন্ডনে বাস করতে আরম্ভ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। তারপর বিবিসির বাংলা বিভাগে যোগদান করেন ১৯৪২ সালে।

এ ছাড়া অন্য আরও কয়েকজন পেশাদার ব্যক্তির কথা জানা যায়। যেমন এন সেন, এস এ হক এবং নীরেন্দ্রনাথ দত্ত মজুমদার। ডক্টর সেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই পিএইচডি করেছিলেন জার্মেনি থেকে। তারপর একজন জার্মান মহিলাকে বিয়ে করে লন্ডনে চলে আসেন। এখানে কোনো চাকরি পাননি তিনি। সে জন্যে উত্তর লন্ডনের টেফনাল পার্কে পাশাপাশি দুটি বাড়ি কিনে তিনি পেশাদার বাড়িওয়ালা বনে যান। তাঁর বাড়িতে পঞ্চাশের দশকে প্রায় বিশ জন বাঙালি থাকতেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভাড়া নিতেন পাঁচ পাউন্ড। তার বিনিময়ে থাকতে দিতেন এবং সকাল আর রাতের বেলায় খেতে দিতেন। তাঁর স্ত্রীই রান্নাবান্না করতেন। তাঁর এই বাড়িতে তখনকার অনেক ভারতীয় ছাত্রই বাস করেছিলেন। তা ছাড়া, যাঁরা ছোটোখাটো চাকরি করতেন, তেমন কয়েকজনও বাস করতেন তাঁর মেসে।

এস এ হক এবং নীরেন্দ্র দত্ত মজুমদার ১৯২০-এর দশকে হাইড পার্কে বক্তৃতায় অংশ নিতেন বলে জানা যায়, কিন্তু তাঁরা কী করতেন, তা জানা যায় না। কোরেশী নিসার আলি এবং আবদুল হামিদ নামে দুজন ব্যারিস্টারের কথাও জানা যায়, যাঁরা ১৯৪০-এর দশকে লন্ডনে কাজ করতেন। আরও বাঙালি আইনজীবী থাকা সম্ভব।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও পেশাদারদের সংখ্যা ছিলো মুষ্টিমেয়। সে তুলনায় বরং হাজার হাজার ভারতীয় বিলেতে এসেছিলেন জাহাজের লস্কর হিশেবে। এঁদের মধ্যে বাঙালিও ছিলেন অনেক। লস্কররা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যোগ দিয়েছিলেন মার্চেন্ট নেভিতে। যুদ্ধের পর এঁদের কেউ কেউ বিলেতে থেকে গিয়েছিলেন।

লিখিত সূত্রের অভাবে লস্করদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবশ্য বেশি জানা যায় না। যে-কয়েকজন বাঙালি লস্করের কথা *Across Seven Seas and Thirteen Rivers* গ্রন্থ থেকে আমরা নিশ্চিত করে জানতে পাই, তাঁরা হলেন আইয়ুব আলি মাস্টার, মুনশি, নানা, মারুফা খান, নাইম উল্লাহ প্রমুখ। মুনশি এবং নানা — এই দুটি নাম থেকে আমরা দেখতে পাই, আমরা তাঁদের সম্পর্কে কতো কম জানি। এঁদের মধ্যে তখন সবচেয়ে পরিচিত ছিলেন আইয়ুব আলি মাস্টার। লস্করের কাজ নিয়ে তিনি অ্যামেরিকায় গিয়েছিলেন ১৯১৯ সালে। জাহাজ থেকে পালিয়ে সেখানেই থেকে যান। সম্ভবত পরের বছর আসেন লন্ডনে। আরও একজন ১৯২৩ সালে জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ নিয়ে অ্যামেরিকা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পূর্ব পরিকল্পনা মতো তিনি জাহাজ থেকে পালিয়ে সেখানেই থেকে যান। দু-তিন বছর পর লন্ডনে আসেন। ইনি পরে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিশেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন — আফতাব আলি। মোটামুটি একই সময়ে বিয়ানীবাজার থেকে আর-একজন অ্যামেরিকায় গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র এখন মিশিগানের কংগ্রেসম্যান।

তিরিশের দশকে বাঙালি লস্করদের সংখ্যা বেশ বাড়তে থাকে। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, এই দশকের শেষে এক লন্ডনেই এঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় দেড় শোতে। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের সাক্ষাৎকার সংগৃহীত হয়েছে উপরের গ্রন্থে। এঁদের মধ্যে ময়না মিয়া আসেন ১৯৩৬ সালের গোড়ায়, ইসরাইল মিয়া ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে আর নওয়াব আলি ১৯৩৯ সালের অগস্ট মাসে। এ ছাড়া, সাক্ষাৎকার নেই এমন একজন হলেন আশকের মিয়া আখনজি। তাঁর পুত্রের মতে, তিনি আসেন ১৯৩৩ সালে। তারপর এখানে থাকার অনুমতি পান পরের বছর। তবে অন্য তিন জনের মতো ইনি তখনই স্থায়ীভাবে বিলেতে থেকে যাননি।

পেশাদারদের সঙ্গে এই অপেশাদার লস্করদের ছিলো নানা ধরনের পার্থক্য। যেমন, ধর্মীয় পরিচয়ে এঁরা প্রায় সবাই ছিলেন পূর্ব বাংলার মুসলমান। তথাকথিত ভদ্র কাজকর্ম না-করে, তাঁরা করতেন জাহাজের বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ। একটা জায়গায় পেশাদারদের সঙ্গে লস্করদের অবশ্য মিল ছিলো — তাঁরাও আসতেন কলকাতা থেকে, আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে — কলকাতার ডক থেকে।

আগের পেশাদার অভিবাসীদের সঙ্গে নতুনদের সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য হলো: আগের

অভিবাসীরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত; কিন্তু নতুন অভিবাসীরা বেশির ভাগই ছিলেন সামান্য শিক্ষিত অথবা পুরোপুরি অশিক্ষিত। আগের অভিবাসীরা ব্রিটেনে বিয়ে করে সংসার গড়ে তোলেন। কিন্তু নতুন অভিবাসীরা আসেন অর্থনৈতিক অভিবাসী হিশেবে — টাকা উপার্জন করতে। টাকা উপার্জন করে দেশে ফিরে যেতে।

প্রথম দিকের শ্রমিকরা খুব কমই বিলেতে স্থায়ীভাবে ঘরসংসার করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রিটেনের অভিবাসন আইনে একের পর এক পরিবর্তন আসে। তা ছাড়া, শ্রমিকরা উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি করেন। তখন তাঁদের অনেকে



লন্ডনের রাস্তায় বাঙালি লস্কর, ১৯২০-এর দশক

ব্রিটেনে পরিবার নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। এভাবে বিলেতে এখন তিন লাখ অথবা তার চেয়েও বেশি বাঙালির একটি বড়ো সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। সেই সম্প্রদায়ের ইতিহাস, তাঁদের আঞ্চলিক পরিচয়, তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের সংস্কৃতি, স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের আদান-প্রদান ইত্যাদি খুবই কৌতূহলের বিষয়।

লস্কররাই যেহেতু ব্রিটেনে বাঙালি বসতি স্থাপন করেছেন, সে জন্যে তাঁরা কোথা থেকে এবং কেন আসেন, তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সেই সঙ্গে দেখা যেতে পারে তাঁরা কিভাবে এ দেশে ধীরে ধীরে বসতি স্থাপন করেন এবং বাঙালি বসতিকে একটা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দান করেন।

লস্করেরা এতো সাধারণ মানুষ যে, তাঁদের নাম-ধাম কেউ লিখে রাখেনি। তাঁদের সম্পর্কে সে জন্যে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইতেশাম উদ্দীন ১৭৮০-এর দশকে লেখা তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এমন একটি মন্তব্য করেছেন যে, তা থেকে এই লস্কররা সাধারণত বঙ্গদেশের কোন এলাকা থেকে আসতেন, সে বিষয়ে একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে, তিনি বিলেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিলেতের লোকেরা ভারতীয় বললে বুঝতেন চট্টগ্রাম আর জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে আগত লস্করদের। কিন্তু তিনি যাওয়াতে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, অন্য রকম ভারতীয়ও আছেন। ইতেশাম উদ্দীনের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, লস্কররা সবাই না-হলেও বেশির ভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। ইতেশাম নিজে ছিলেন, নদিয়ার মানুষ। তাই ধরে নিতে পারি যে, তিনি পূর্ববঙ্গ-প্রীতি থেকে এ কথা বলেননি।

পরবর্তী কালে, বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, লস্কররা কেবল ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে আসেননি। তাঁরা অন্যান্য এলাকা থেকেও কমবেশি এসেছেন। এমন কি, এসেছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকেও। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে, এঁদের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ২০০১ সালের ব্রিটেনের লোকগণনার হিশেব থেকে দেখা যায় যে, ব্রিটেনে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসা লোকেদের সংখ্যা হলো বিশ লাখ দশ হাজার পাঁচ শো একচল্লিশ জন। এঁদের মধ্যে বাঙালিদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ।

এই যে ভারতীয় উপমহাদেশের বিশ লাখ লোক এ দেশে বাস করছেন, তাঁদের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাঁরা আসেন উপমহাদেশের প্রধানত চারটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে। এগুলো হলো: পশ্চিম পাঞ্জাবের মীরপুর অঞ্চল, পূর্ব পাঞ্জাবের জলন্ধর, পশ্চিম ভারতের গুজরাট আর বঙ্গদেশের সিলেট। কিন্তু অভিবাসীরা বিশেষ করে এই চারটি অঞ্চল থেকে এলেন কেন, তার কোনো বস্তুনিষ্ঠ উত্তর নেই। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই চারটি অঞ্চলের সঙ্গেই সমুদ্রের যোগাযোগ রয়েছে। বলা বাহুল্য, তা ঠিক নয়। কারণ পাঞ্জাব থেকে সমুদ্র অনেক দূরে। অথচ ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবীদের সংখ্যা মোট ভারতীয় অভিবাসীদের শতকরা পঞ্চাশের থেকে কিঞ্চিৎ বেশি (৫১%)। তা ছাড়া, আরও মনে রাখা যেতে পারে যে, পাঞ্জাবীদের পরে গুজরাটীদের সংখ্যাই বেশি হলেও, তাঁদের অধিকাংশ খোদ গুজরাট থেকে আসেননি, তাঁরা এসেছিলেন পূর্ব আফ্রিকা থেকে। যাঁরা সমুদ্র উপকূলবর্তী গুজরাট থেকে এসেছিলেন, তাঁরা আসতে আরম্ভ করেন পাঞ্জাবীদের পরে।

পাঞ্জাবীদের তুলনায় সমুদ্রতীরবর্তী বাঙালিদের সংখ্যাও অনেক কম, যদিও তাঁরা আসতে আরম্ভ করেন পাঞ্জাবীদের অনেক আগে থেকে। যে-বাঙালি লস্কররা প্রথম দিকে বিলেতে এসেছিলেন, তাঁরা আবার সিলেট থেকে নয়, তাঁরা আসতেন সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থিত চট্টগ্রাম আর ঢাকা থেকে। এখনো বাংলাদেশের জাহাজ এবং লঞ্চের সারেং ও খালাসিদের বেশির ভাগই নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের।

তুলনামূলকভাবে সাগর থেকে সিলেট অনেকটা দূরে। অথচ ব্রিটেনে সিলেটী অভিবাসীদের সংখ্যা চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালির লোকেদের চেয়ে বহু গুণ বেশি। এরও ব্যাখ্যা সহজে মেলে না।

একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, ১৮৫৬ সালে সিলেটের বনজঙ্গলে চায়ের গাছ আবিষ্কারের পর কয়েক বছরের মধ্যেই সেখানে চায়ের বাগান গড়ে ওঠে। সিলেট এবং আসামের বাগান থেকে চা রপ্তানি করার জন্যে এঞ্জিন-চালিত জাহাজ যেতে আরম্ভ করলো সিলেটে। এই জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ, এঞ্জিন রুম এবং ডেকের কাজ ইত্যাদির জন্যে জাহাজের কম্পেনিগুলো চাকরি দিতো সিলেটের সাধারণ লোকদের। এই খালাসি এবং লস্কররা প্রথমে জাহাজে করে আসতেন কলকাতায়। তারপর সেখান থেকে কেউ কেউ আসতেন বিলেত পর্যন্ত। চায়ের জাহাজে সিলেট থেকে কতো লোক কাজ নিয়েছিলেন, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। থাকলে এই মন্তব্য কতোটা গুরুত্বপূর্ণ, তা যাচাই করে দেখা যেতো। তবে সংখ্যায় যতোই হন না কেন, সিলেটী লস্কররা কলকাতা এবং বিলেতে এসে তাঁদের বর্ধিত আয় দিয়ে ভাগ্যোন্নতি করেছিলেন। এবং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখে অন্যরাও আগ্রহী হয়েছিলেন এ কাজ করার জন্যে।

জাহাজের এই নাবিকদের মধ্যে বিশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে যাঁরা স্থায়ীভাবে বিলেতে বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে লিখেছেন ক্যারোলাইন অ্যাডামস (*Across Seven Seas and Thirteen Rivers,* ১৯৮৭) এবং ইউসুফ চৌধুরী (*Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers in Britain,* ১৯৯৩)। *Tales of Three Generations of Bengalis in Britain* (২০০৬) গ্রন্থেও এ রকম বসতি স্থাপনকারীদের কয়েকটি সাক্ষাৎকার আছে। তা ছাড়া, রোজিনা বিশ্রাম ইন্ডিয়া অফিসের কাগজপত্র ঘেঁটেও অনেক মূল্যবান তথ্য জোগাড় করেছেন (*Asians in Britain: 400 Years of History,* ২০০২)। কেটি গার্ডনারও খোদ সিলেটে গিয়ে লস্করদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছেন। তা ছাড়া, সাম্প্রতিক কালে অনেকেই লস্করদের নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এসব তথ্য থেকে সিলেটী লস্করদের আসার কারণ এবং তাঁদের পটভূমি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়।

জাহাজের কাজ ছিলো দারুণ কঠিন। বিশেষ করে ভয়াবহ গরমের মধ্যে বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ। এ কাজ শ্বেতাঙ্গরা করতে চাইতেন না। তা ছাড়া, শ্বেতাঙ্গদের বেতনও দিতে হতো অনেক বেশি। অপর পক্ষে, অনেক কম টাকার বিনিময়ে লস্কররা এই হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের কাজ গ্রহণ করতেন। ক্যারোলাইন অ্যাডামসের গ্রন্থে সংগৃহীত তিনটি সাক্ষাৎকার আছে ইসরাইল মিয়া, নওয়াব আলি আর ময়না মিয়া ওরফে শাহ আবদুল মজিদ কোরেশীর। এঁদের মধ্যে ময়না মিয়া বলেছেন কী কঠোর শ্রম তাঁদের করতে হতো কয়লা দিতে। কিন্তু ইসরাইল মিয়া বলেছেন যে, পরিশ্রম

তিনি ভয় করতেন না এবং ভালো টাকা পাওয়া যেতো বলে তিনি সাগ্রহেই এ কাজ বেছে নিয়েছিলেন একাধিকবার, এমন কি যুদ্ধের সময়ে। নিজের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ফেলে রেখে তিনি যুদ্ধের সময়ে জাহাজের কাজ নিয়েছিলেন, কারণ তখন এ থেকে অনেক টাকা পাওয়া যেতো — মাসে দশ-বারো পাউন্ড পেতেন তিনি। এমনিতে, বিশ শতকের প্রথম দিকে এই লস্করদের বেতন দেওয়া হতো শ্বেতাঙ্গদের চার ভাগের এক ভাগ, অথবা তার চেয়েও কম। ১৯১৫ সালের দিকে এঁদের বেতন ছিলো দশ থেকে বিশ টাকা। কিন্তু তখন একই কাজের জন্যে শ্বেতাঙ্গদের বেতন ছিলো পাঁচ পাউন্ড। ১৯৩৫ সালেও ময়না মিয়া পেতেন ১৮ টাকা। জাহাজের মালিকরা লস্করদের সঙ্গে ব্যবহারও করতে পারতেন দাসদের সঙ্গে যেমন অমানুষিক ব্যবহার করা যেতো, তেমনি। এমন ঘটনাও জানা যায় যে, লস্করদের মেরে তাঁদের মৃতদেহ সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কারণেই লস্করদের সমাদর করতেন জাহাজের মালিকরা।

তবে এ থেকে লস্কর নিয়োগের কারণ বোঝা গেলেও লস্কর হওয়ার কারণ বোঝা যায় না। আগে যে-চারটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি, তা থেকে জানা যায় যে, অনেক ছোটোখাটো জোৎদার এবং জমিদার থাকলেও সিলেটের লোকেরা ছিলেন সাধারণভাবে গরিব। অনেকেরই কোনো জমিজমা অথবা কাজ ছিলো না। এ জন্যেই তাঁরা জাহাজের চাকরি নিতে আগ্রহ দেখাতেন। নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের লোকেরাও কমবেশি একই কারণে চাকরি করতেন লস্করের। অতএব এরও প্রশ্ন ওঠে: সিলেট থেকে অতো বেশি সংখ্যক লস্কর এলেন কেন? এবং নোয়াখালি অথবা চট্টগ্রামের উপনিবেশ গড়ে না-উঠে বিলেতে সিলেটীদের বসতি গড়ে উঠলো কেন? বিশ্লেষণ করলে এ প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়।

সিলেটের লস্কররা গিয়ে উনিশ শতক থেকেই আস্তানা গেড়েছিলেন কলকাতার ডক এলাকায়, অর্থাৎ খিদিরপুর অঞ্চলে। এই ডকেই জাহাজ এসে ভিড়তো আবার এখান থেকেই যাত্রী, মালামাল এবং লস্কর নিয়ে জাহাজগুলো সাগর পাড়ি দিতো। জাহাজের চাকরি ছিলো অস্থায়ী। তা ছাড়া, সব সময়ে সে কাজ জুটতোও না। অধিকাংশ লস্করই বেশির ভাগ সময় বেকার থাকতেন। একটি হিশেব অনুযায়ী বেকার থাকতেন দুই তৃতীয়াংশ লোক। জাহাজের কম্পেনিগুলো প্রতিদিন ঘাট সারেংদের জানাতো, তাদের কতোজন লস্করের প্রয়োজন হবে। চাকরির জন্যে অপেক্ষমাণ লস্করদের কাজ ভাগ করে দিতেন এই সারেংরা। তার বিনিময়ে লস্করদের আয়ের একটা অংশ দাবি করতেন তাঁরা। আর, একটা বড়ো অংশ দাবি করতেন বাড়িওয়ালারা। কাজের জন্যে যে-লস্কররা অপেক্ষা করে থাকতেন, তাঁরা বাস করতেন এবং খেতেন বাড়িওয়ালাদের আশ্রয়ে। তার বিনিময়ে বাড়িওয়ালারা লস্করদের বেতনের চার ভাগের এক ভাগ কেটে নিতেন।

ওদিকে, লস্কররা চাকরি নিয়ে যখন জাহাজে যেতেন, তখনই তাঁরা বেতন পেতেন না। জাহাজের মালিকরা বেতন দিতেন লস্কররা অন্য বন্দর থেকে কলকাতায় ফিরে

আসার পর। লস্কররা যাতে পালিয়ে না-যান, এভাবে তাঁরা তা নিশ্চিত করতে পারতেন। কলকাতায় ফিরে এসে বেতন পেয়ে তাঁরা বাড়িওয়ালা আর ঘাট সারেং-এর পাওনা শোধ করে বাকি টাকা নিয়ে আবার খেপ ধরার জন্যে অপেক্ষা করে থাকতেন অথবা গ্রামে গিয়ে বেড়িয়ে আসতেন। তেমন টাকাপয়সা হাতে থাকলে জমিও কিনতেন ভবিষ্যতের জন্যে। জমির মালিক হওয়ার সঙ্গে একটা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিলো।



১৮৬০-এর দশকের লস্কর। চেহারা এবং পোশাকে ডান দিকের চারজনকে বাঙালি বলেই মনে হয়।

যাঁরা নগদ টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরতেন, তাঁদের দেখে অথবা যাঁরা বিদেশ থেকে মানি অর্ডার করে বড়ো অঙ্কের টাকা পাঠাতেন, তা দেখে ঈর্ষান্বিত এবং প্রলুব্ধ হতেন তাঁদের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা। ময়না মিয়া লিখেছেন যে, তিনি অ্যামেরিকা থেকে অন্যদের টাকা পাঠাতে দেখে নিজেও অ্যামেরিকা যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। তিনি এই প্রলোভন থেকেই লস্করের কাজ পাওয়ার জন্যে খিদিরপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এভাবে খিদিরপুরে ছুটে গিয়েছিলেন শত শত, হাজার হাজার সিলেটের লোক।

এখানে সিলেটের লোকেদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা এবং স্বজনের বন্ধন — যাকে ইংরেজিতে বলে কিনশিপ — তা খুবই জোরালো। তাঁরা আত্মীয়স্বজনের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে সব সময়ে প্রস্তুত। এমন কি, যাঁরা সরাসরি আত্মীয় নন, গ্রাম সুবাদে যাঁরা আত্মীয় অথবা পরিচিত, তাঁদের উপকার করার জন্যেও তাঁরা পিছপা হন না। গোটা সিলেটের লোকেরা একটা বড়ো পরিবারের মতো। তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা এবং আঞ্চলিকতা খুবই প্রবল এবং আন্তরিক। এমন কি, তাঁরা যতোই শিক্ষিত হন না কেন, নিজেদের মধ্যে কথাও বলেন সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়। এই কিনশিপ বন্ড এবং ভাষিক পরিচয় চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালির লোকেদের মধ্যেও বেশ লক্ষ্য করা যায়।

খিদিরপুরের বাড়িওয়ালারা অনেকেই ছিলেন সিলেটের। তাঁরা লস্করদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন অথবা নিজেদের অঞ্চলের লোকেদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে সাহায্য করতেও চেষ্টা করতেন। অন্য অঞ্চলের লোকেদের তাঁরা তাঁদের "বাড়িতে" আশ্রয় দিতেন না। সারেংদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন সিলেটের। তাঁরাও অন্য অঞ্চলের লোকেদের কাজ দেওয়ার আগে নিজেদের অঞ্চলের লোকেদের কাজ দেওয়ার কথা ভাবতেন। এভাবেই খিদিরপুরের সিলেটী বাড়িওয়ালা এবং সারেংদের দৌলতে ধীরে ধীরে সিলেটীদের মধ্যে লস্করের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

একই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি বিলেতে বসতি স্থাপন করার ব্যাপারে। যে-লস্কররা জাহাজ থেকে পালিয়ে এসে লন্ডন-সহ বিলেতের বন্দর এবং শিল্পনগরীগুলোতে বাস করতে আরম্ভ করতেন, তাঁরাও নবাগতদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতেন। কাজ জুটিয়ে দিতেন। এভাবে ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিলেতে গড়ে উঠেছিলো সিলেটী বাঙালিদের বসতি।

ইসরাইল মিয়া জাহাজের কাজ পেয়েছিলেন তাঁর এলাকার একজন সারেং-এর সূত্রে। তিনি যখন জাহাজ থেকে পালিয়ে লন্ডনে আসেন, তখন কাউকে চিনতেন না। কিন্তু এক অপরিচিত লোক তাঁকে আশ্রয় দেন। তাঁর কাছে কদিন থেকে তিনি আসেন অল্ডগেইটে। তিন বছর পরে তিনি আবার নিজের ভাইকে নিয়ে আসেন। ময়না মিয়াও লন্ডনে কাউকে চিনতেন না। রাত দেড়টার সময়ে তিনি যখন রাস্তায় অসহায়ভাবে ঘুরছিলেন, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয় সিলেটেরই একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে। অতঃপর সেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে যান মুনশির মেসে, যেখানে তিনি নিজে থাকতেন। সে মেসে তখন থাকতেন পনেরো/ষোলোজন লস্কর। মুনশির স্ত্রী সেই রাতে রান্না করে খাওয়ান ক্ষুধার্ত ময়না মিয়াকে। ইসলাম, মারুফা খান, আইয়ুব আলি মাস্টার, আলি প্রমুখ ব্যক্তির মেস ছিলো, যেখানে তাঁরা লস্করদের খুব কম খরচে থাকতে দিতেন।

নওয়াব আলিও কার্ডিফ বন্দরে জাহাজ থেকে পালিয়ে তাঁর পরিচিত এক লস্করের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সেখান থেকে অল্ডগেইটে আসেন। দারুণ সংকটের মধ্যে ছিলেন তিনি। একটা বাড়ির দরজার সামনে ঘুমাতেন। তারপর দৈবক্রমে দেখা হয় তাঁর গ্রামের এক বন্ধুর ভাই, রাজ্জাক মিয়ার সঙ্গে। রাজ্জাক মিয়া তখনই তাঁকে নিয়ে যান তাঁর ডেরায়। সেখানে রাজ্জাক মিয়ার নিজের অবস্থাও ভালো ছিলো না। তিনি ছোটো একটি চৌকিতে থাকতেন আর-একজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। দুজনই একটু মোটা ছিলেন। ফলে নওয়াব আলিকে শুতে হয় ছোট্টো একটি সোফায়। তাঁদের কথাবার্তা শুনে বাড়িওয়ালা তাঁর ইংরেজ স্ত্রীকে নিয়ে নিচে নামেন এবং তাঁদের সমস্যার সমাধান করেন। পরে এঁদের সহানুভূতি নিয়ে নওয়াব আলি টিকে থাকেন এবং চাকরিও পান।

কোনা মিয়া কলকাতায় আসেন তাঁর পাশের গ্রামের এক সারেং-এর সঙ্গে। কলকাতায়

ছিলেনওগ্রামের এক বাড়িওয়ালার আশ্রয়ে। এমন কি, কাজও পান পরিচিত এক সারেং-এর অনুগ্রহে। লিভারপুল থেকে তিনি যখন পালিয়ে লন্ডনে আসেন তখন প্রথম রাতের জন্যে আশ্রয় দেন আইয়ুব আলি মাস্টার। তারপর তিনি চলে যান পাশের গ্রামের একজন লোকের কাছে। তিনিই তাঁকে একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি জুটিয়ে দেন। এ রকমের পারস্পরিক সাহায্য নিয়েই প্রথম দিকের লস্কররা বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে ইসরাইল মিয়া লিখেছেন যে, সেকালে ইংরেজ এবং সিলেটী সবার কাছ থেকেই খুব সাহায্য পাওয়া যেতো। ময়না মিয়া লিখেছেন, টিলবেরি থেকে তিনি যখন ভুল ট্রেনে চেপে লন্ডনে আসছিলেন, তখন একজন ইংরেজ তাঁকে বাসের টিকিট কিনে দেন। একজন পুলিশ তাঁকে রাতের জন্যে থানায় আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও একে অন্যকে সাহায্য করতেন সিলেটের অভিবাসীরা।

আমরা *Tales of Three Generations of Bengalis in Britian* গ্রন্থ থেকে এ রকম সাহায্য লাভ করে বসতি স্থাপনের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আবদুস সামি বিলেতে কবে আসেন, তার উল্লেখ করেননি। তিনি লস্কর হিশেবে নয়, এসেছিলেন জাহাজের যাত্রী হয়ে। তার অর্থ ১৯৬০-এর দশকের আগে। তিনি বলেন যে, তিনি এসে কাজ করেছিলেন তাঁর এক আত্মীয়ের রেস্টুরেন্টে। সেখানে বেতন ছিলো সাড়ে সাত পাউন্ড। খাওয়া এবং থাকার জন্যে মালিককে দিতে হতো সাড়ে চার পাউন্ড। ওদিকে, তিনি ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার করে সেই টাকা দিয়েই বিলেতে এসেছিলেন। সুতরাং সেই ধার শোধ দেওয়ার জন্যে তাঁর দরকার ছিলো বাড়তি আয়ের। তিনি তাই আর-একটি রেস্টুরেন্টে চলে যান, যেখানে আগে থেকেই কাজ করতেন তাঁর ভাইপো। সেই রেস্টুরেন্টে বেতন ছিলো কিছু বেশি। তা ছাড়া, থাকার জন্যে ভাড়াও দিতে হতো কম — সাড়ে তিন পাউন্ড। তার ওপর, বাড়তি আয়ের জন্যে তিনি তাঁর রুমে আর-একজন ভাড়াটে রাখেন। এর পর তিনি এক বন্ধুর বুদ্ধিতে দর্জির দোকানে কাজ নেন। কারণ সেখানে বেতন ছিলো রেস্টুরেন্টের তুলনায় বেশি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তখন দরকার হলে প্রতি পনেরো মিনিটে একটা চাকরি জোটানো যেতো।

এ রকমের আরও একটি দৃষ্টান্ত সাজ্জাদ খানের। তিনি আসেন ১৯৬২ সালে এবং আসেন ভাইয়ের সাহায্য নিয়ে। মোট কথা, তখন যাঁরা আসতেন, তাঁরা আত্মীয় অথবা পরিচিতদের সহায়তায় আসতেন এবং তাঁদের সহায়তা নিয়েই এ দেশে বসবাস শুরু করতেন।

আবদুল গাফফার নাসির মিয়া আসেন ১৯৬৩ সালে। তিনি এসেছিলেন এক আত্মীয়ের ভরসায়, জব ভাউচার নিয়ে। জাহাজে নয়, ২৪ ঘণ্টায় তিনি বিমানে করে করাচি থেকে আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো ২৪/২৫ বছর। লন্ডনে এসে তিনি প্রথম তিন মাস কাজ করেন একটি নাম-করা হোটেল, মেফেয়ারে। তারপর মামাতো ভাইয়ের আমন্ত্রণে তিনি যান উত্তর ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে। সেখানে গিয়ে কাজ

করেন এক কটন মিলে। দশ বছর তিনি এই মিলে কাজ করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে, সে মিলে আরও ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা কাজ করতেন। সবাই কঠোর পরিশ্রম করতেন বলে মিলের ব্যবস্থাপনা এই শ্রমিকদের পছন্দ করতো। এর পর তিনি আবার লন্ডনে ফিরে আসেন এবং এক বেইকারিতে কাজ করেন পাঁচ বছর।

আবদুস সামি অথবা নাসির মিয়ার প্রায় চল্লিশ বছর আগে এসেছিলেন আইয়ুব আলি মাস্টার। লেখাপড়া জানতেন বলে তাঁর পরিচিতরা তাঁকে সম্মান দেখিয়ে বলতেন, মাস্টার। আইয়ুব আলি ১৯১৯ সালে জাহাজ থেকে পালিয়ে অ্যামেরিকায় থেকে যান। পরের বছর সেখান থেকে আসেন লন্ডনে। লন্ডন থেকে তিনি সম্ভবত আবার অ্যামেরিকায় ফিরে গিয়েছিলেন ১৯৩০-এর দশকে। *Roots and Tales of the Bangladesh Settlers in Britain* গ্রন্থ অনুযায়ী, তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন ১৯৩৮ সালে। ১৯২০-এর দশকে লন্ডনে হাতে গোনার মতো মাত্র কয়েকজন বাঙালি ছিলেন। কাজেই আগে থেকে লন্ডনে আইয়ুব আলির পরিচিত কেউ ছিলেন কিনা, বলা মুশকিল। হয়তো তার প্রয়োজনও ছিলো না। কারণ তিনি শিক্ষিত ছিলেন। অ্যামেরিকায় কাজ করে তিনি সেখান থেকে কিছু টাকাকড়িও নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এসে বসতি স্থাপন করেন অল্ডগেইট অঞ্চলে। ৭৬ নম্বর কমার্শিয়াল স্ট্রীটে একটি কফি হাউস খোলেন তিনি। এ ছাড়া, ১৩ নম্বর স্যান্ডি রো-তে তিনি একটি আস্তানা গড়ে তোলেন যেখানে আশ্রয় দিতেন যে-কোনো সিলেটী লস্করকে।



আইয়ুব আলি মাস্টার

মোহাম্মদ আশকের আকনজি আসেন ১৯৩৩ সালে। তখন তাঁর বয়স, তাঁর পুত্রের

মতে, পনেরো-ষোলো বছর। কিন্তু ধরে নিচ্ছি যে, তাঁর বয়স ছিলো অন্তত বিশ বছর। কারণ পনেরো-ষোলো বছরের এক বালককে জাহাজের কম্পেনি লস্করের কঠোর পরিশ্রমের কাজ দিয়ে ভরসা করতে পারবে না। সে যাই হোক, তিনি জাহাজ থেকে পালিয়ে এ দেশে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁকে থাকতে সাহায্য করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলা। এক বছর এ দেশে থাকার পর পুলিশের কাছ থেকে থাকার অনুমতিপত্র লাভ করেন তিনি। তবে তখনই স্থায়ীভাবে বিলেতে বসবাস করতে আরম্ভ করেননি। বরং জাহাজে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। জাহাজে তাঁর কাজের খতিয়ান পাওয়া যায় ১৯৪০ সালে তিনি যে-নলি লাভ করেন, তা থেকে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে তিনি লন্ডনে স্থায়ীভাবে বাস করেন। প্রথমে এক আইসক্রীম ফ্যাক্টরিতে ৩৫ বছর কাজ করেন তিনি। তারপর কয়েক বছর কাজ করেন এক বেইকারিতে।

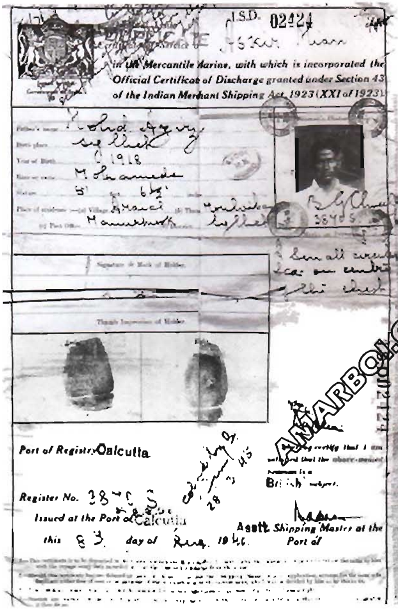


আশকের আখনজি

নওয়াব আলির বর্ণাঢ্য জীবনের কাহিনী আছে ক্যারোলাইন অ্যাডামসের – *Across Seven Seans and Thriteen Rivers* – গ্রন্থে। তাঁর জন্ম কখন, তা পরিষ্কার নয়। কিন্তু তিনি কাজের খোঁজে কলকাতায় আসেন ১৯৩০-এর দশকে। সারেং-এর কাজ শিখে তাতে পাশ করলেও তিনি স্যার্টিফিকেট জোগাড় করতে না-পারায় ১৯৩৭ সালে কলকাতায় ডক এলাকায় একটি রেস্টুরেন্ট খোলেন। তার দু বছর পরে – বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ নিয়ে তিনি কার্ডিফে এসে পৌঁছান। পুব লন্ডনে আসার পর অন্য সব লস্করদের মতো রেস্টুরেন্টে, কারখানায়, জাহাজে – নানা রকমের কাজ করেন। তারপর খোলেন হালাল মাংসের দোকান। তিনি দাবি করেছেন যে, তিনিই এ দেশে প্রথম হালাল মাংসের দোকান করেন। ইংল্যান্ডের একাধিক শহরে বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্টও খুলেছিলেন তিনি। এমন কি, কালোবাজারিও করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, সেকালে লন্ডনেও সমুদ্রগামী জাহাজ আসতো এবং সেগুলো ভিড়তো পুব লন্ডনের ডকে। অল্ডগেইট, লাইম হাউস, ক্যানিং টাউন ইত্যাদি এলাকা সেই ডকল্যান্ডেরই কাছাকাছি। জাহাজ থেকে পালিয়ে লস্কররা তাই বাসা

বেঁধেছিলেন অল্ডগেইট এলাকায়। তাঁদের ভরসায় অনেক দূরে লিভারপুল অথবা কার্ডিফে কেউ জাহাজ থেকে পালিয়ে ডাঙায় নামলে, তাঁরাও এসে ভিড় করতেন অল্ডগেইটে। উপরের তিনটি গ্রন্থে যেসব দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, সবার কথা থেকেই এটা বেশ বোঝা যায়। আর বোঝা যায়, পুরোনো বসতি স্থাপনকারীরা আশ্রয় দিয়ে নবাগতদের কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এ দেশে থাকতে।


I.S.D. 02424

in the Mercantile Marine, with which is incorporated the Official Certificate of Discharge granted under Section 43 of the Indian Merchant Shipping Act, 1923 (XXI of 1923)

1918

Port of Registry Calcutta

Register No. 38__5

Issued at the Port of Calcutta

this 23 day of Aug. 194_

Asstt. Shipping Master at the Port of

British subject.

আশকের আখনজির নলি

পাঞ্জাবের শিখদের সঙ্গে এর তুলনা চলে। পার্থক্য এই যে, শিখ এবং পাঞ্জাবী মুসলমানরা বিলেতে আসতে আরম্ভ করেন সিলেটী লস্করদের যথেষ্ট পরে। কিন্তু ব্যাপক হারে শিখদের বিলেতে আসার ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিলেই সিলেটীদের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিখদের দেশ পাঞ্জাব সাগরের কাছে নয়। লস্কর হিশেবেও তাঁরা আসেননি, এমন কি উনিশ শতকেও নয়। তাঁরা আসেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এই যুদ্ধে এক লাখ আটত্রিশ হাজার ভারতীয় সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন। এঁদের একটা বড়ো অংশ ছিলো শিখ এবং গুর্খা সৈন্যদের। যে-শিখ সৈন্যরা ফ্রান্সে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ স্বদেশে ফিরে না-গিয়ে ব্রিটেনে আসেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আহত হয়েছিলেন, চিকিৎসার জন্যে তাঁদেরও নিয়ে আসা হয়েছিলো ইংল্যান্ডের ব্রাইটন শহরে। যুদ্ধের পরে এঁরা অনেকে এ দেশেই থেকে যান এবং চেষ্টা করেন এখানে ভাগ্য গড়ে তুলতে। বর্ণবিদ্বেষের কারণে তাঁদের পক্ষে টিকে থাকা অবশ্য সহজ ছিলো না। টিকেছিলেন আত্মীয়তা, ধর্মীয় স্বরূপ এবং ভাষার নিবিড় বন্ধনের কারণে। কেবল তাই নয়, নিজেরা একবার এদেশে বসতি স্থাপন করার পর পাঞ্জাব থেকে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে এসে তাঁরা তাঁদেরও উপকার করতে চেষ্টা করেন।

১৯৪৭ সালের পর শিখ এবং পাঞ্জাবী মুসলমানরা আসেন আরও একটা কারণে। দেশবিভাগের পর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে তখন লাখ লাখ পাঞ্জাবী গৃহহীন

হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে শিখ এবং হিন্দুরা ব্যাপক হারে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে চলে যেতে বাধ্য হন ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে। আর পূর্ব পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবে চলে যান মুসলমানরা। এই বাস্তহারা লোকেদের অনেকে নতুন করে ভাগ্য গড়ে তোলার উদ্দেশে পূর্ব-পরিচিতদের সাহায্য নিয়ে বিলেতে আসেন। নতুন স্বাধীনতা-পাওয়া পূর্ব আফ্রিকা থেকেও বিরাট সংখ্যক শিখ ব্রিটেনে আগমন করেছিলেন ১৯৬০ সালের পর।



ব্রাইটসে আহত শিখ সৈন্যরা

পাঞ্জাবী মুসলমান এবং শিখদের মধ্যে যে-আত্মীয়তা, ধর্মীয় এবং ভাষিক বন্ধন রয়েছে, সেই একই রকমের বন্ধন রয়েছে সিলেটের লোকেদের মধ্যে। এই তিন সম্প্রদায়ের ভাগ্যান্বেষী লোকেরা যাঁরা প্রথম দিকে ব্রিটেনে এসে সাফল্য অর্জন করেন, তাঁরা নিজেদের সৌভাগ্য নিয়ে তৃপ্ত থাকেননি, বরং তাঁরা তাঁদের আত্মীয়দেরও নিয়ে এসেছেন। এমন কি, যাঁরা তাঁদের আত্মীয় নন, তাঁদেরও আসতে তাঁরা সাহায্য করেছেন। এভাবে একটা ইমিগ্রেশন চেইন তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে পাঞ্জাবী শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান এবং সিলেটী মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং তিনটি বড়ো ভাষিক-ধর্মীয় সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ব্রিটেনে।

প্রসঙ্গত গুজরাটী হিন্দুদের কথাও বলা যায়। তাঁরা অবশ্য ব্যাপক সংখ্যায় আসেন অন্য তিন সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পরে এবং তাঁরা অনেকেই আসেন পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়া এবং উগান্ডা থেকে। কেনিয়া থেকে তাঁরা আসতে শুরু করেন ১৯৬০-এর দশকে। আর ফৌজী একনায়ক ইদি আমীন যখন ১৯৭২ সালে মাত্র নব্বুই দিনের মধ্যে দেশ ছেড়ে যাওয়ার আদেশ দেন, তখন উগান্ডার ভারতীয়রা বেশির ভাগই ইংল্যান্ডে চলে আসেন। অন্য তিন সম্প্রদায়ের অভিবাসীদের সঙ্গে গুজরাটীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, তাঁদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিক এবং ব্যবসায়ী ছিলেন অনেক বেশি। তা ছাড়া, তাঁদের একটা বড়ো অংশই কিছু টাকাপয়সা নিয়ে এ দেশে এসেছিলেন। ফলে তাঁরা সেই টাকাপয়সা দিয়ে তুলনামূলকভাবে সহজে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, দেশ-বিভাগের আগেকার লস্কররা যাঁরা অর্থনৈতিক অভিবাসী হিশেবে আসতেন, তাঁদের পক্ষে এ দেশে টিকে থাকা সহজ কাজ ছিলো না। কারণ, জাহাজ থেকে পালিয়ে ডাঙায় নামলেই দুটো মস্ত বড়ো সমস্যা দেখা দিতো তাঁদের সামনে — থাকার আর খাওয়ার। তারপরই সমস্যা দেখা দিতো একটা চাকরি জোটানো এবং পুলিশের কাছ থেকে থাকার পরিচয়পত্র। তা ছাড়া, ইন্ডিয়া অফিসে নিজেদের নাম নিবন্ধন করাও ছিলো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। পূর্বোক্ত নওয়াব আলির কাহিনী থেকে এসবের একটা চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। ইন্ডিয়া অফিস থেকে কাগজপত্র জোটানোর জন্যে তাঁকে হাতাহাতিও করতে হয়েছিলো। তবে এ কাজে আইয়ুব আলি মাস্টারের মতো কয়েক ব্যক্তি নবাগতদের সাহায্য করতেন। যতো দিন এঁরা কাজ না-পেতেন, ততোদিন তাঁদের কাছ থেকে টাকাপয়সাও নিতেন না আইয়ুব আলি, সুরত আলি, সৈয়দ তফাস্বিল আলি, আবদুল মান্নান প্রমুখ পুরোনো অভিবাসীরা। অন্যদের সাহায্য করার ব্যাপারে বিশেষ করে আইয়ুব আলির খুব সুনাম ছিলো। তাঁর এই ভূমিকার জন্যে তিনি পরে — ১৯৪০-এর দশকে — লন্ডনে মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন। ময়না মিয়াও অন্যদের সাহায্য করতেন। তিনিও নানা রকমের সাংগঠনিক কাজে অংশ নিয়েছিলেন। দেশ-বিভাগের সময়ে দেশে গিয়েও তিনি রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন।

বিলেতে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে অভিবাসীদের আরও দুটো গুরুতর সমস্যা ছিলো। একটা সরকারের তরফ থেকে, অন্যটা স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর অভিবাসীদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন বলে তাঁরা অনেকেই ছোটোখাটো ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করেন অনেকে। ওদিকে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ব্রিটেনে বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক মন্দা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছিলো। এই পরিবেশে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে অভিবাসীদের সম্পর্ক এতোই তিক্ত হয়ে ওঠে যে, ১৯১৯ সালে অভিবাসীদের ওপর বর্ণবাদী হামলা হয় এবং তাঁদের দেশে ফেরত পাঠানোর জোর দাবি ওঠে।

এই দাবি এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ১৯২১ সালে সরকার ভারতবর্ষীয়দের

স্বদেশে ফেরত পাঠানোর জন্যে জাহাজের ভাড়া-সহ আর্থিক সুযোগসুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে এই সুবিধা নিয়ে অল্প সংখ্যক অভিবাসীই দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, বাকিরা থেকে যান এ দেশে। তাই সমস্যার সমাধান না-হয়ে বরং ১৯২০-এর দশকে অর্থনৈতিক মন্দার পটভূমিতে এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

ভারতীয় অভিবাসীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে ১৯৩০ সালে ব্রিটিশ সরকার আরও একবার পদক্ষেপ নেয়। নতুন অভিবাসীদের আগমন ঠেকিয়ে রাখার জন্যে ভারত-সরকারকে ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ দেয় অল্পশিক্ষিত, অদক্ষ শ্রমিক এবং নিম্নশ্রেণীর ভারতীয়দের যেন পাসপোর্ট না-দেওয়া হয়। তখনকার আইন অনুসারে ভারতের লোকেরা ব্রিটিশ নাগরিক বলে গণ্য হতেন। সুতরাং ব্রিটেনে প্রবেশের ব্যাপারে তাঁদের ওপর কোনো বিধিনিষেধ ছিলো না। কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া এ দেশে এলে তাঁরা যে-ভারতীয় তা প্রমাণ করা সম্ভব হতো না, অথবা প্রমাণ করা খুব কঠিন হতো। ফলে তাঁরা ব্রিটেনে ঢুকতে পারতেন না অথবা ঢুকলেও স্থায়ীভাবে থাকতে পারতেন না। সে জন্যেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। এভাবে পাসপোর্ট নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় অভিবাসীদের আগমন বন্ধ করার চেষ্টা হলেও ১৯৩০ এবং ৪০-এর দশকে তাঁদের সংখ্যা বরং বৃদ্ধি পায়।

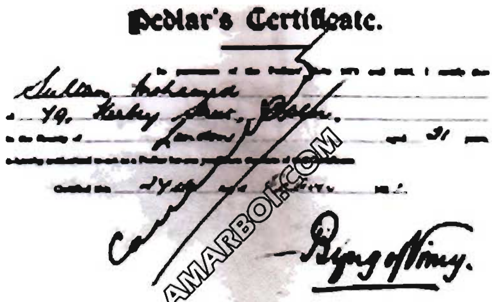


পেডলার

নিচের তথ্য থেকে দেখা যাবে, এই সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে নানা পেশার লোক থাকলেও প্রধান ভূমিকাই ছিলো লস্করদের। প্রথম মহাযুদ্ধে একমাত্র মার্চেন্ট নেভিতে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁদের শতকরা ২০ ভাগই ছিলেন ভারতীয়। ১৯৩৮ সাল নাগাদ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ২৬-এ। লস্করদের সংখ্যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ হাজারে পৌঁছে। তবে এঁদের মধ্যে কতোজন বিলেতে থেকে যান, তা জানা যায় না। এক পরিসংখ্যান থেকে যা জানা যায়, তা হলো: ১৯৩২ সালে ব্রিটেনে ভারতীয়দের মোট সংখ্যা ছিলো ৭২১৮ জন। এঁদের মধ্যে অনেক বাঙালি ছিলেন, একাধিক সূত্র থেকে

তা জানা যায়। যেমন, ১৯৪৩ সালে লন্ডনে ইন্ডিয়ান সীম্যানস অ্যাসোসিয়েশন নামে লস্করদের যে-সমিতি স্থাপিত হয়, তাঁর প্রায় তাবৎ সদস্যই ছিলেন সিলেটী লস্কর। ১৯৪২ সাল নাগাদ একমাত্র লন্ডনেই ভারতীয়দের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজারে।

উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত যে-লস্কররা এসেছিলেন তাঁরা এতো কম শিক্ষিত ছিলেন যে, তাঁদের পক্ষে সরকারী চাকরি জোটানো সম্ভব ছিলো না। এমন কি, বর্ণবাদী কারণে কলকারখানাতেও চাকরি পেতেন না তাঁরা। টিকে থাকার জন্যে তাঁরা প্রধানত ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। যেসব এলাকায় দোকানপাট থাকতো না, তাঁরা সেসব এলাকায় কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য পণ্য বাড়ির দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতেন। আমরা সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আগেই



পেডলার্স লাইসেন্স

লক্ষ্য করেছি। তিনি ভারতীয় অ্যান্টিক নাম দিয়ে সাধারণ জিনিশই বিক্রি করতেন। তাঁর আগে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা গাছ-গাছড়ার ওষুধও বিক্রি করতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অথবা তার পরে যে-পাঞ্জাবীরা আসেন, তাঁরা অনেকে ব্যবসা করতেন কাপড়চোপড়ের। পরে বাঙালি লস্কররাও এ ব্যবসা করেছেন অনেকে। রেশমের কাপড়ের ব্যবসায় এঁদের কেউ কেউ বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ফেরিওয়ালার কাজ ছাড়া, ভারতীয়দের অনেকেই কাজ করতেন ডকের শ্রমিক হিশেবে।

কেউ কেউ কাজ করতেন বিভিন্ন জায়গায় বার্তা এবং জিনিশপত্র পৌঁছে দেওয়ার। সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কুলিগিরিও করেছিলেন। কয়েক বছর কাজ করে কিছু টাকাপয়সা জমানোর পর এঁরা অনেকেই দেশে ফিরে যেতেন। কেউ আবার শ্বেতাঙ্গ নারী বিয়ে করে এ দেশেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতেন। পুলিশের কাছ থেকে এই ফেরিওয়ালাদের একটি পেডলার্স লাইসেন্স নিতে হতো, যাতে তাঁরা ক্রেতাদের সহজে ঠকাতে না-পারেন। তা ছাড়া, লাইসেন্সের মাধ্যমে ফেরিওয়ালাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করারও চেষ্টা হয়েছে। পাঞ্জাবীদের সম্পর্কে এই মন্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য

বঙ্গদেশ থেকে আসা প্রথম দিকের স্বল্পশিক্ষিত লোকেদের সম্পর্কেও। এঁদের দুজন আবদুল মালিক এবং নওয়াব আলি *(Across Seven Seas and Thriteen Rivers)* নানা ধরনের কাজের মধ্যে ফেরিওয়ালার কাজও করেছিলেন।

আর-একটা কাজ তাঁরা করতেন লন্ডনের পানশালায় — ফেরি করে চকলেট বিক্রির কাজ। ময়না মিয়া লিখেছেন, তিনি কিভাবে চকলেট বিক্রি করতেন এবং তা থেকে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করেছিলেন। কিন্তু যে-কাজই লস্কররা করেন না কেন, তাঁরা



লন্ডন ডকে কর্মরত ভারতীয়রা

আসতেন কয়েক বছর এখানে কাজ করে আয়-উপার্জন করে সেই টাকাপয়সা নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে সচ্ছলতার মধ্যে বাকি জীবন কাটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এই অভিবাসীদের এক কথায় বলা যায় অর্থনৈতিক অভিবাসী। কিন্তু কার্যকারণে তাঁরা অনেকে এখানেই বসতি স্থাপন করে থেকে যান, অথবা থেকে যেতে বাধ্য হন। কেউ কেউ কয়েকবার করে এখানকার বাড়িঘর এবং ব্যবসা বিক্রি করে দেশে ফিরেও গেছেন। তার পর আবার ফিরে এসেছেন সেখানে সুবিধে করতে না-পেরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানায় শ্রমিকের

প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন বাঙালি শ্রমিকরা শুধু লন্ডন নয় মফস্বল শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েন। এঁরা ইংরেজি না-জানলেও এঁদের স্বাগত জানানো হতো। কারণ এঁরা কম বেতনে কাজ করতে তৈরি থাকতেন। কঠোর পরিশ্রম করতেও রাজি হতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্যর্মিংহ্যাম এবং কভেন্ট্রির কলকারখানায় প্রায় দু হাজার ভারতীয় শ্রমিক ছিলেন। ব্রিটেনের বিভিন্ন শিল্প- ও বন্দর-নগরীতে — যেমন, বেডফোর্ড, ম্যানচেস্টার, নটিংহ্যাম, এডিনবরা, লিভারপুল এবং গ্লাসগোতেও বহু ভারতীয় শ্রমিক কাজ করতেন।

মোট কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা লক্ষযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে ব্রিটেনে ব্যাপক হারে অভিবাসী আসতে আরম্ভ করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটেনের যে-ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো তার চেয়ে অনেক বেশি। ফলে ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙে পড়েছিলো। এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন তাদের উপনিবেশ থেকে শ্রমিক আনার ঘোষণা দেয় তখন অভিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

অবশ্য তখন বেশি সুবিধে পান ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে আসা অভিবাসীরা। এর কারণ, ১৯৪৯ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং অন্যান্য কলোনিগুলোর নাগরিকরা ব্রিটিশ প্রজা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। অপর পক্ষে, সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত ভারত-পাকিস্তানের লোকেরা ব্রিটিশ প্রজার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। সুতরাং ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে অভিবাসী হিশেবে আসা যতোটা সহজ ছিলো, ভারত-পাকিস্তান থেকে আসা অতোটা সহজ ছিলো না। তা ছাড়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে আগত কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকদের অধিকাংশই ইংরেজি যতোটা জানতেন, ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রমিকরা ততোটা ইংরেজি জানতেন না। প্রকৃত পক্ষে, বেশির ভাগ কোনো ইংরেজিই জানতেন না। এটাও তাঁদের আসায় সহায়তা করেনি। ১৯৪৯ সাল থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী দু দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ভারতীয় উপমহাদেশ — এই দুই অঞ্চল থেকে যে-অভিবাসীরা আসেন, তাঁদের সংখ্যা তুলনা করলেই অভিবাসীর অনুপাতে বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে।

ব্রিটেনে কৃষ্ণাঙ্গ এবং পাকিস্তানী অভিবাসীদের সংখ্যা

বছর	১৯৫১	১৯৬১
কৃষ্ণাঙ্গ	২০,৯০০	১৬১,৪৫০
পাকিস্তানী	৫০০০	২৪,৯০০

১৯৪৯ সালের আইন অনুসারে 'কমনওয়েলথ-নাগরিক' হিশেবে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে বিলেতে আসার জন্যে হয় ভারত, নয়তো পাকিস্তানের পাসপোর্ট লাগতো। পাকিস্তান সরকার এই পাসপোর্টকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে পশ্চিম এবং পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলো। তা ছাড়া, স্টেট ব্যাংকের অনুমতি

দেওয়ার ব্যাপারেও বৈষম্য করা হতো। এর ফলে বাঙালি অভিবাসীদের পক্ষে ব্রিটেনে আসা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও সিলেটী অভিবাসীদের আগমন খানিকটা বৃদ্ধি পায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর। তিনি ব্রিটেন সফরে এলে বাঙালি সম্প্রদায় তাঁর কাছে পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানী কর্মচারীরা যে-বৈষম্য দেখান, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সোহরাওয়ার্দি তখন এই বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লন্ডনে তিনি বাঙালি অভিবাসীদের কাছে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তিনি হাজার দুয়েক পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে সে কারণে সিলেট থেকে অনেক শ্রমিক আসতে পেরেছিলেন।



পুব লন্ডনের আলতাফ আলি পার্ক

কিন্তু ১৯৫৮ সালে ফৌজী একনায়ক আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার পর পূর্ব পাকিস্তানী শ্রমিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে আবার কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

সিলেটের লস্কর এবং সাধারণ শ্রমিকরা যাতে ব্রিটেনে আসতে পারেন, তার জন্যে ১৯৫০-এর দশকে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন আফতাব আলি। তিনি নিজে যখন লস্কর হিশেবে অ্যামেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন লস্করদের খাওয়া-দাওয়া, থাকার জায়গা, বেতন এবং তাঁদের প্রতি জাহাজের কর্মকর্তাদের আচরণ ভালো করে লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯২৫ সালে কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি লস্করদের অবস্থার উন্নতি

এবং চাকরিক্ষেত্রে তাঁদের আরও অধিকার রক্ষার জন্যে রীতিমতো আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি কেবল লস্করদের সমিতি গঠন করেননি, বরং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হিশেবে প্রসিদ্ধ হন। ১৯২৯ সালে সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মকর্তা মনোনীত হন। পরে তিনি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (আইএলও) কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। এই সংগঠনের কর্মকর্তা হিশেবে তিনি জিনিভা, লন্ডন এবং অ্যামেরিকায় বেশ কয়েকবার সম্মেলনে যোগদান করেন এবং ভারতীয় লস্করদের অধিকার রক্ষার জন্যে জোরালো দাবি উপস্থাপন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার।

পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তিনি শ্রমিকদের পাসপোর্ট দেওয়া এবং ব্রিটেনে যাওয়ার ব্যাপারে দেন-দরবার করেন। তিনি শ্রমিকদের আসার সুবিধে করে দেওয়ার উদ্দেশে সিলেট এবং ঢাকায় একটি ট্র্যাভেল এজেন্সিও খুলেছিলেন। তা ছাড়া, লন্ডনে ট্র্যাভেল এজেন্সি খুলেছিলেন আইয়ুব আলি মাস্টার। সেকালে সিলেট থেকে লন্ডনে আসা সহজ ছিলো না। জাহাজে আসতে অনেক দিন লাগতো। এই অসুবিধে দূর করার জন্যে ইসরাইল মিয়ার ভাই জরিফ মিয়া ভাড়া-করা বিমানে শ্রমিকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আফতাব আলি লস্কর এবং শ্রমিকদের কল্যাণ এবং ব্রিটেনে আসার ব্যাপারে আজীবন যে-সংগ্রাম চালান, তা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্যে বাঙালি সম্প্রদায় তেমন কিছু করেছে বলে মনে হয় না।

তোসাদ্দুক আহমদ বিলেতে আসেন ১৯৫০ সালে। তিনিও সিলেটী সম্প্রদায়ের জন্যে কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন। সিলেট থেকে আগতরা যাতে এ দেশে এসে শিক্ষা এবং সামাজিক সুযোগসুবিধা পেয়ে স্থায়ী বাসিন্দা হিশেবে নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করতে পারেন, তার জন্যে তিনি প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ব্রিটেনে বাংলা শিক্ষা এবং বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্যেও তিনি যত্ন নিয়েছিলেন।

১৯৫০-এর দশকের মধ্য ভাগ থেকে এ দেশে আসার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নিচের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাবে, ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কতো ধীর গতিতে বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

ব্রিটেনে পাকিস্তানি ও পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা

১৯৫১	১৯৬১	১৯৬৬	১৯৭১
৫০০০	২৪৯০০	১১৯৭০০	১২৭৫৬৫

এ থেকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বৃদ্ধির হার ছিলো খুবই ভালো। এটা মনে হওয়ার কারণ এই যে, আলাদা করে পূর্ব পাকিস্তানীদের এ পরিসংখ্যান থেকে সংখ্যা জানা যায় না। কিন্তু নিচের পরিসংখ্যান থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানীদের তুলনায় বাঙালিদের সংখ্যা ছিলো এক চতুর্থাংশের কম।

ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের সংখ্যা

১৯৮১	১৯৯১	২০০১
৬৪৫৭২	১৫৭৮৮১	২৭৫২৫০

বাঙালিদের সংখ্যা মোট পাকিস্তানীদের অর্ধেক ধরলে ১৯৫১ সালে বাঙালিদের সংখ্যা ছিলো আড়াই হাজার, ৬১ সালে সাড়ে বারো হাজার আর ৭১ সালে চৌষট্টি হাজার। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাঙালিদের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার হওয়া অসম্ভব। কারণ আমরা জানি যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটেনে বাঙালিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তা সত্ত্বেও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ছিলো মাত্র ৬৪ হাজার সুতরাং ১৯৭১ সালে তাঁদের সংখ্যা হাজার বিশেকের বেশি ছিলো বলে মনে হয় না।

অন্য সূত্র থেকেও এর পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। ক্যারোলাইন অ্যাডামসের মতে, ১৯৪০-এর দশকে লন্ডনে সিলেটীদের সংখ্যা ছিলো তিন শোর মতো; আর ক্রিস ফিলিপসন ও তাঁর সহলেখকদের মতে, এ সংখ্যা ছিলো শ চারেক। দেশের অন্যত্র তাঁদের সংখ্যা এর দ্বিগুণের বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। তার অর্থ ১৯৫১ সালে ব্রিটেনে পূর্ব বাংলার বাঙালি ছিলেন খুব সম্ভব হাজার খানেক বা তার চেয়ে সামান্য বেশি। আমার ধারণা, ১৯৫৬ সালে পাসপোর্ট পাওয়ার সুযোগ বাড়ায় তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১ সাল নাগাদ তা দাঁড়ায় চার হাজারে। তারপর কারো কারো পরিবার আসতে শুরু করায় ১৯৭১ সালে বাঙালিদের সংখ্যা পৌঁছে বিশ হাজারে।

কিভাবে ব্রিটেনে বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা স্বদেশে ফিরে না-গিয়ে ব্রিটেনেই থেকে যান, এমন কি, তাঁদের পরিবার নিয়ে আসেন, এবারে সেই প্রক্রিয়ার দিকে তাকানো যাক।

১৯৪৮ সালের পর উপমহাদেশ এবং তার চেয়েও বেশি — ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে লাখ লাখ শ্রমিক আসার ফলে ব্রিটেনে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিলো। তাই ১৯৬২ সালে অদক্ষ শ্রমিকদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার নতুন অভিবাসন আইন প্রবর্তন করে। নিয়ম হয় যে, কেউ ব্রিটেনে আসতে চাইলে শ্রমিক মন্ত্রণালয় থেকে জব ভাউচার নিয়ে আসতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেউ আসতে চাইলে ব্রিটেন থেকে তাঁকে আনার জন্যে শ্রমিক মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুমতি নিয়ে জব ভাউচার পাঠাতে হবে। অথবা দেশ থেকেও সরাসরি শ্রমিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়েও কেউ আসতে পারেন। ব্রিটেনের কোনো প্রতিষ্ঠান আগন্তুক শ্রমিককে চাকরি দিতে রাজি আছে — এটা প্রমাণ করতে পারলেই সরকার সেই শ্রমিককে আসার অনুমতি দিতো।

এর আগে পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যে-শ্রমিকরা এসেছিলেন, তাঁরা ছিলেন বাঙালি শ্রমিকদের মতো — প্রায় সবাই পুরুষ। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো, সাময়িকভাবে ব্রিটেনে বাস করে আয়-উপার্জন করে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার। কিন্তু আইনী কড়াকড়ি দেখা

দেওয়ার পর তাঁরা স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন। এভাবে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসে নার্স এবং অন্য বিভিন্ন ধরনের কাজে হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সাল থেকে ৬৭ সালের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পশ্চিম আফ্রিকা থেকে কতোজন শ্রমিক হিশেবে এবং কতোজন পরিবারের সদস্য হিশেবে আসেন, তা দেখা যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে:

শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যদের আগমন, ১৯৬২-৬৭

অঞ্চল	শ্রমিক	পরিবারের সদস্য
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	১৫৫০	৫৫৩১০
পশ্চিম আফ্রিকা	৩২২০	১১০৫০

কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় ১৯৬০-এর দশকে উপমহাদেশ থেকে খুব সামান্য সংখ্যক পরিবারই এ দেশে এসেছিলো। কিন্তু বাঙালি অভিবাসীরা পরিবার না-এনে বরং জব ভাউচার পাঠিয়ে দিয়ে আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত ব্যক্তিদের শ্রমিক হিশেবে নিয়ে এসেছিলেন যথেষ্ট সংখ্যায়। *Across Seven Seas and Thriteen Rivers* গ্রন্থে যে-অভিবাসীদের জীবনকাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন — নওয়াব আলি — একাই এই দশকে বিশ জনকে জব ভাউচার দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন যে, তাঁর পরিচিতরাও এ রকম অনেককে এ দেশে আসতে সাহায্য করেছিলেন। অনেকে আবার আবদুল গাফফার নাসির মিয়ার মতো সরাসরি দেশ থেকে দরখাস্ত করে জব ভাউচার জোগাড় করেন। নতুন যে-অভিবাসীরা আগমন করেন, তাঁরাও পরে আবার তাঁদের আত্মীয়দের নিয়ে আসেন। এমনি করে ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে বাঙালি অভিবাসী শ্রমিকদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

বাঙালি অভিবাসীদের সঙ্গে পাঞ্জাবী এবং গুজরাটীদের তুলনা করলে এই তিন শ্রেণীর অভিবাসীরা কারা কখন আসেন তার একটা চিত্র পাওয়া যায়। ২০০১ সালের লোকগণনার সময়ে যে-জরিপ করা হয়, তা থেকে দেখা যায় যে, বাঙালি অভিবাসী-শ্রমিকরা পাঞ্জাবী এবং গুজরাটীদের তুলনায় এ দেশে বেশি দিন — গড়পড়তা ৩৫ বছরেরও বেশি — বাস করেছেন। অপর পক্ষে, পাঞ্জাবীরা বাস করেছেন ৩৪ বছর আর গুজরাটীরা ২৯ বছর। নিচের পরিসংখ্যান থেকে এই তিন অঞ্চলের লোকেদের আগমন সম্পর্কে আর-একটু পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হয়।

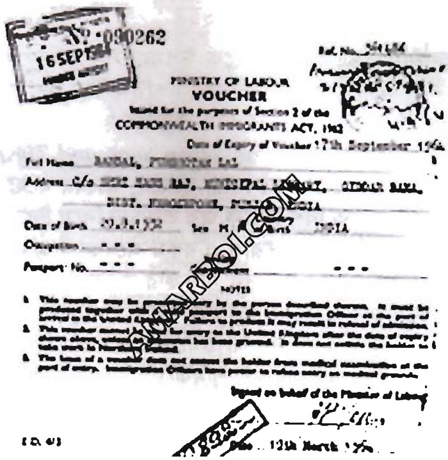
অভিবাসীদের আগমনের সময়

	১৯৫০-এর দশক	১৯৭০-এর দশক
বাঙালি	২৫%	২১%
পাঞ্জাবী	৯%	২১%
গুজরাটী	৫%	৪৪%

বস্তুত, জব ভাউচারের মাধ্যমে অভিবাসীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে-উদ্যোগ ব্রিটিশ সরকার নিয়েছিলো, তা দিয়ে শ্রমিক আগমন খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও অন্য

অভিবাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ, যে-অভিবাসীরা আগে থেকে ব্রিটেনে কাজ করছিলেন এবং ব্রিটেনের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁরা যখন দেখলেন যে, এ দেশে পরিবার নিয়ে আসার ব্যাপারে ধীরে ধীরে আইনী বাধা দেখা দিতে পারে, তখন তাঁরা সে রকমের বাধা আরোপের আগেই তাড়াতাড়ি করে স্ত্রী এবং পরিবার এ দেশে নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন।

এ রকমের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আশকের মিয়া আখনজি লন্ডনে আসেন ১৯৩৩ সালে। তবে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেননি। দেশে গিয়ে বিয়ে করেন ১৯৪৫ সালের দিকে। কিন্তু পরিবার নিয়ে আসেন ১৯৮৮ সালে। ময়না মিয়া


MINISTRY OF LABOUR
VOUCHER
COMMONWEALTH IMMIGRANTS ACT, 1962
Full Name
Address
Date of Birth
Occupation
Passport No.

জব ভাউচার

লন্ডনে আসেন ১৯৩৬ সালে। দেশে গিয়ে বিয়ে করেন ১৯৪৬ সালে। সেখানেই তাঁর পরিবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারপর তিনি ১৯৬৭ সালে দেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসার অনুমতি জোগাড় করেন। তখন তাঁর স্ত্রী গর্ভবতী থাকায় তিনি আসতে আগ্রহী ছিলেন না। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে পরিবার নিয়ে আসা সম্ভব হয় ১৯৭৬ সালে। অপর পক্ষে, কোনা মিয়া নিজে ইংল্যান্ডে আসেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। কিন্তু নিজের পরিবার নিয়ে আসেন ১৯৭৪ সালে। আবদুল মালিক নিজে এসেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে আসেন বিয়ের ৩১ বছর পরে, ১৯৭৫ সালে। তখন তাঁর নিজের বয়স ৭৩ বছর এবং তাঁর হিশেব অনুযায়ী এই স্ত্রীর বয়স ৪০ বছর।

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালিরা স্বদেশ থেকে তাঁদের স্ত্রী এবং পরিবার বলতে

গেলে নিয়েই আসেননি। তখন যে-সামান্য সংখ্যক বাঙালি এ দেশে পরিবার গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা এ দেশেই বিয়ে করেছিলেন। অন্যরা টাকাপয়সা কামাই করে দেশে গিয়ে বিয়ে করতেন। তারপর স্ত্রীকে সেখানে রেখে নিজেরা ফিরে আসতেন। কয়েক বছর পর পর তাঁরা দেশে গিয়ে কয়েক মাস পরিবারের সঙ্গে বাস করতেন। পুরোনো অভিবাসীদের অনেকে দেশে স্ত্রী-পরিবার রেখে এ দেশে বাস করতেন শ্বেতাঙ্গিনী নারীদের সঙ্গে। তা ছাড়া, কেউ কেউ দুটি বিয়েও করতেন – একটি বাংলাদেশে, একটি বিলেতে। *Across Seven Seas and Thriteen Rivers* গ্রন্থে আমরা এ রকমের একাধিক দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন, ইসরাইল মিয়ার একটি পরিবার ছিলো লন্ডনে, একটি ঢাকায়। আবদুল মালিকেরও তাই। ইসরাইল মিয়া লিখেছেন যে, তাঁর শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে এসেছেন। এবং তাঁর দুই স্ত্রীর মধ্যে দুই বোনের মতো সদ্ভাব ছিলো। তাঁর বাঙালি স্ত্রী এবং সন্তানদের ঢাকার গুলশানে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তারপর যখন তাঁর শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রী মারা যান, তখন তিনি দেশে চলে যান।

যাঁরা এ দেশে আয়-উন্নতি করে দেশে গিয়ে বিয়ে করতেন, তাঁরা সাধারণত একটু বেশি বয়সেই বিয়ে করতেন। এর ফলাফল এখনো লন্ডনের বাঙালি পাড়ায় দেখা যায়। সেখানে এমন অনেক দম্পতি রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান খুবই বেশি। অনেক বৃদ্ধ পিতার কমবয়সী ছেলেমেয়েও প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এ রকমের একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই *Tales of Three Generations of Bengalis in Britain* গ্রন্থে। এই স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান তিরিশেরও বেশি। *Across Seven Seas and Thriteen Rivers* গ্রন্থে নওয়াব আলির সঙ্গে তাঁর বাংলাদেশী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ছিলো তার চেয়েও বেশি। তিনি এঁকে বিয়ে করেন তাঁর বয়স যখন অন্তত ৫২ বছর। স্ত্রীর বয়স আঠারো-উনিশের বেশি ছিলো বলে মনে হয় না। আবদুল মালিক দ্বিতীয় বিবাহ করেন ৪২ বছর বয়সে, তখন তাঁর স্ত্রীর বয়স ছিলো ন বছর।

বয়সের এই পার্থক্য কতো প্রকট, পূর্বোক্ত গ্রন্থ দুটি থেকে তা সঠিক বোঝা যায় না। তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশে জন্ম-নিবন্ধনের কোনো রীতি ছিলো না। পাসপোর্ট করতে গিয়ে অনেকে নিজেদের আনুমানিক বয়স লিখেছেন। অনেকে শ্রমিকের কাজ পেতে সুবিধে হবে মনে করে নিজেদের বয়স দশ-পনেরো বছর কমিয়ে লিখেছেন, এমন ঘটনা জানা যায়। ফলে পাসপোর্ট অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য যতোটা দেখা যায়, সত্যিকারের পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশি।

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের এ রকমের ব্যাপক ব্যবধানের ফলে অনেক সময়ে পারিবারিক সমস্যাও সৃষ্টি হতো এবং এখনো হয়। এ বিষয়ে লন্ডন স্কুল অব একনোমিকসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকার গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি পুব লন্ডনে জরিপ করে দেখতে পান যে, বৃদ্ধদের তরুণী স্ত্রীদের মধ্যে কেউ

কেউ মানসিকভাবে অসুখী। এমন কি, তাঁদের কারো কারো কমবয়সীদের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে।

প্রসঙ্গত আমরা বাঙালিদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনীদের সম্পর্ক নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারি। উনিশ শতক থেকে বঙ্গদেশ থেকে যাঁরা বিলেতে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মীর্জা আবু তালিব এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে অনেকেই শ্বেতাঙ্গ নারীদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং অনেকে তাঁদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৭৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে* যা লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, এ ধরনের সম্পর্ক সেকালে বেশ ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিলো। তিনি নিন্দা করে লিখেছেন যে, এই প্রবাসী বাঙালিরা যে-নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, তাঁরা সাধারণত গৃহভৃত্যের মতো সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারী। বাড়িওয়ালি অথবা তাঁদের কন্যাদের সঙ্গেও বাঙালি বাবুরা সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রথমত ঠাট্টা রসিকতা করে তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতেন, তারপর তাঁদের মধ্যে তৈরি হতো ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক।

শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে তা নিয়ে অনেকে বেশ গর্ব বোধ করতেন। ষষ্ঠ বাঙালি আইসিএস ব্রজেন্দ্রনাথ দে পরীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে লন্ডনে এসে পৌঁছান ১৮৭২ সালের অগস্ট মাসে। যে-বাড়িতে তিনি ওঠেন, সে বাড়িতে থাকতেন, দুজন বাঙালি ছাত্র। প্রথম পরিচয়েই তাঁদের একজন একটি শ্বেতাঙ্গিনী নারীর ফোটো দেখিয়ে বলেন যে, তিনি হলেন তাঁর বান্ধবী। অন্য একটি মেয়ের ছবি দেখিয়ে বলেন যে, সেটি তাঁর কাজিনের বান্ধবী।

এ ধরনের বন্ধুত্ব থেকে বিয়েও হতো। আগেই এ রকম একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি—ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্তের। তিনি বিয়ে করেছিলেন তাঁর বাড়িওয়ালির কন্যাকে (১৮৬৬)। ক্ষেত্রমোহনের দুই কন্যা পরে ভারতীয় ছাত্রদের জন্যে একটি অতিথিশালা চালাতেন। তাঁর বড়ো মেয়ে ম্যাবেল তারকনাথ পালিতের বাড়িতে গভর্নেসের কাজ করতে গিয়ে লোকেন পালিতের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরা বিয়ে করেন। তা ছাড়া, রাজেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্র, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত, অরুণ দত্ত, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক গোলাম হায়দার, সৈয়দ আমীর আলি, আবদুর রসুল-সহ সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বিলেতে বিয়ে করেছিলেন।

এঁরা কেউ কেউ অভিজাত পরিবারের শিক্ষিত নারীদের বিয়ে করলেও, সাধারণভাবে বললে বলতে হয় যে, তখন যে-বাঙালিরা লেখাপড়া করতে আসতেন, তাঁরা নিম্নশ্রেণীর নারীদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতেন অথবা করতে পারতেন। নিম্নশ্রেণীর নারীরাও নিঃসঙ্গ বাঙালি শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে চেষ্টা করতেন। ১৮৮০-এর দশকের গোড়ায় গিরিশচন্দ্র বসুর এক বন্ধু ইংরেজ পরিবারে কিছুকাল বাস করার ইচ্ছা জানিয়ে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং তার উত্তরে প্রায় ১৫০টি চিঠি পেয়েছিলেন। অনেক চিঠিই মেয়েদের লেখা। এসব

চিঠিতে বাড়িতে কোন কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বাস করেন এবং তাঁদের বয়স কতো ইত্যাদিরও উল্লেখ ছিলো।

কেবল শিক্ষার্থী নন, লস্করদের মধ্যেও অনেকে শ্বেতাঙ্গ নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। ১৮৪৬ সালে কলকাতা থেকে মহাম্মদ ইবরাহিম নামে এক লস্কর এসে কিভাবে এক ইংরেজ নারীর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন, আগেই তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এই ধারা পরের এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে অক্ষুণ্ন ছিলো।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শতকরা দু ভাগের বেশি বাঙালি অভিবাসীরা তাঁদের পরিবার নিয়ে আসেননি। কিন্তু তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, তাঁরা নারী-সাহচর্য পেতেন না। *Across Seven Seas and Thriteen Rivers* গ্রন্থে যে-অভিবাসীদের কথা জানতে পাই, তাঁদের একজনের ভাষায় সে সময়কার অভিবাসীদের বর্ণনা দেওয়ার মতো কতোগুলো পরিভাষা ছিলো। যেমন, "বাড়িওয়ালা", অর্থাৎ যাঁদের নিজেদের বাড়ি ছিলো; "বেটিওয়ালা" অর্থাৎ যাঁরা ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে একত্রে বাস করতেন; আর "শাদিওয়ালা" অর্থাৎ যাঁরা ইংরেজ মহিলা বিয়ে করেছিলেন। ইংরেজ নারী তখন অনেকেই বিয়ে করেছিলেন। এই যে, শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে বাস করা, এটাকে অভিবাসীরা স্বভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তবে এই মহিলাদের অন্যরা অমুকের স্ত্রী বলে উল্লেখ করতেন না, বরং এঁদের বলতেন, যাকে বাংলায় বলা হয় 'মেয়েমানুষ'। পূর্বোক্ত গ্রন্থে আবদুল মালিক যেমন কথা প্রসঙ্গে বলছেন, 'My uncle's woman.' বলা বাহুল্য, এই নারীরা শ্বেতাঙ্গিনী হলেও, বেশির ভাগই সম্ভ্রান্ত ছিলেন না। এক সাক্ষাৎকারে আবদুল গাফফার নাসির মিয়া (বিলেতে আগমন ১৯৬৩) আমাকে বলেন যে, তাঁর পরিচিত লস্কররা যে-নারীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিতান্তই নিম্নশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গিনী।

নওয়াব আলির এ রকমের একাধিক সঙ্গিনী ছিলেন। তিনিও তাঁদের woman বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি নিজেই কয়েকজন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গ লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে চারটি সন্তান লাভ করেন। এ ছাড়া, তাঁর দীর্ঘ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো আরও দুজন শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে — একজন ইংরেজ, একজন অস্ট্রেলিয়ান। তার মধ্যে ইংরেজ রমণীকে নিয়ে পালিয়ে যায় নওয়াব আলির বড়ো ছেলে। আর অন্য রমণী স্বদেশে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে নওয়াব আলিকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ ছাড়া, নওয়াব আলির আরও দুটি সন্তান জন্মেছিলো — একটি আলেক্সজান্দ্রিয়ায়, অন্যটি ইটালিতে — অন্য দুই মহিলার সঙ্গে। তাঁর ইংরেজ স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করার অনেক পরে ১৯৭২ সালে তিনি দেশে গিয়ে সেখানে বিয়ে করেন। তখন তার বয়স অন্তত ৫২ বছর। সেই স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর চারটি সন্তান জন্মে।

Across Seven Seas and Thriteen Rivers এবং *Roots and Tales of the*

Bengali Settlers in Britain উভয় গ্রন্থ থেকেই জানা যায়, অভিবাসীরা শ্বেতাঙ্গিনী রূপজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। লস্কররা যেহেতু বাড়িওয়ালিদের তত্ত্বাবধানে বাস করতেন না, নিজেরা কম ভাড়ার কোনো বাড়িতে অনেকে মিলে বাস করতেন, সে জন্যে তাঁদের বেশির ভাগই শারীরিক প্রয়োজন মেটাতেন রূপজীবিনীদের কাছে গিয়ে।

ইউসুফ চৌধুরীও তাঁর গ্রন্থে এ রকমের তথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, লস্কররা কোথায় থাকেন, রূপজীবিনীরা সে খবর রাখতেন। ছুটির দিনে তাঁরা এসব বাড়িতে আসতেন। এ ছাড়া, সমাজের নিম্নশ্রেণীর কোনো কোনো নারীর সঙ্গে লস্করদের স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠতো। তাঁরা বিয়ে করতেন অথবা একত্রে বাস করতেন। এ রকম স্থায়ীভাবে শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে একত্রে বাস করা এতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো যে, তা বাঙালি সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলো।

কেবল লস্কররা নন অথবা কেবল উনিশ শতকেই নয়, ঢাকাই এবং ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যেও অনেকে শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যেমন, ১৯৫০-এর দশকে বিলেতে এসেছিলেন বেতার-সাংবাদিক নূরুল ইসলাম। দেশে তাঁর স্ত্রী ছিলেন, সন্তানও ছিলো। কিন্তু তিনি লন্ডনে আবার বিয়ে করেন এবং সেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কয়েকটি সন্তান জন্মে। বেতার-সাংবাদিক শ্যামল লোধও বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে, তবে দেশে তাঁর কোনো স্ত্রী ছিলেন না। দি. চৌধুরী ৫০-এর দশকে এসেছিলেন চাকরির সন্ধানে। তিনি এক জার্মান মহিলার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হন। তারপর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে নিউজীল্যান্ডের এক নারীর সঙ্গে। এ ছাড়া, অন্য নারীদের সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সব শেষে বিয়ে করেন এক বেলজিয়ান রমণীকে। কিন্তু ইদানীং কালে শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করার ঘটনা কমে গেছে বলে মনে হয়। এর একটা কারণ স্বদেশের সঙ্গে এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে। যাঁরা দেশ থেকে আসেন, তাঁরা স্ত্রীদের নিয়ে আসতে পারেন অথবা দেশে গিয়ে বিয়ে করতে পারেন। তা ছাড়া, বাঙালি সম্প্রদায় এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এখানেই পাত্রপাত্রীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় বিয়ে হচ্ছে।

শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে একত্রে বাস অথবা অস্থায়ী বিয়ের ফলে সমাজে নানা রকমের সমস্যা দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বস্তুত, এ ধরনের সমস্যা যে উনিশ শতক থেকেই দেখা দিয়েছিলো, সমসাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে তা জানা যায়। রোজিনা বিশ্রাম তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে, এখন থেকে দেড় শো বছর আগে — ১৮৫০ সাল নাগাদ — লন্ডনের রাস্তায় মিশ্রবর্ণের সন্তানদের ভিক্ষা করতে দেখা যেতো। ১৮৫৭ সালে *টাইমস* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে এটাকে একটা বড়ো সামাজিক সমস্যা বলে কড়া সমালোচনা করা হয়। আসলে শ্বেতাঙ্গিনীরা ভারতীয় লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে লস্করদের সঙ্গে একত্রে বাস করছেন, এটাকে সমাজ আদৌ সহ্য করতে পারতো না।

অপর পক্ষে, শ্বেতাঙ্গিনীদের প্রতি বাঙালিদের আকর্ষণ এখনো বেশ বজায় আছে, যদিও বিয়ে কমই হচ্ছে। বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গিনী যৌনকর্মীদের সঙ্গে কোনো কোনো বাঙালি এখনো বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রাখেন। এ ধারণা হওয়ার কারণ *ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে* প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, পুব লন্ডনের শতকরা ১৫ ভাগের বেশি বাংলাদেশী পুরুষ এবং শতকরা ১০ ভাগের বেশি বাংলাদেশী মহিলার হয় গনোরিয়া, নয়তো সিফিলিস আছে। আমার বিশ্বাস, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে এ জাতীয় যৌন-রোগ সংক্রামিত হয়েছে তাঁদের স্বামীদের মাধ্যমে, নয়তো তাঁদের পক্ষে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রাখা বেশ ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বাংলাদেশ থেকে পরিবার নিয়ে আসার ফলে শ্বেতাঙ্গিনীদের সঙ্গে দীর্ঘ অথবা সাময়িক সম্পর্ক রাখার ঘটনা এখন অনেক কমে এসেছে। কখন থেকে বাঙালি স্ত্রীরা এ দেশে আসতে আরম্ভ করেন, তার আভাস পাওয়া যায় আবদুল মজিদ কোরেশীর কথা থেকে। তাঁর মতে, প্রথম যে-বাঙালি তাঁর স্ত্রীকে বিলেতে নিয়ে আসেন, তিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন বাঙালি সৈন্য । সরকারের কাছ থেকে টিকিট পেয়ে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। এই সৈন্যের নাম অবশ্য কোরেশী বলতে পারেননি। কিন্তু বলেছেন যে, মহিলা যখন লস্করদের মেসে আসেন, তখন অতোগুলো পুরুষের মধ্যে খুব বিব্রত বোধ করেন। তিনি তাই রান্নাঘরে যেতে চান। ভেবেছিলেন যে, সেখানে অন্য মহিলারা আছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে আরও কতোগুলো পুরুষই দেখতে পান।

ইউসুফ চৌধুরীর মতে (*Roots and Tales of the Bengali Settlers in Britain)*, আবদুল হাকিম নামে ব্যর্মিংহ্যামের এক দোকানদার ১৯৫৭ সালে সবার আগে বাংলাদেশ থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। তখন এটা ছিলো একটা অসাধারণ ঘটনা। নয়তো বাঙালি শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার বাংলাদেশেই রাখতেন আর নিজেরা এ দেশে বাস করতেন অবিবাহিত লোকের মতো, অন্য পুরুষদের সঙ্গে। ইউসুফ চৌধুরী আরও লিখেছেন যে, ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অভিবাসীদের মধ্যে আনুমানিক শতকরা মাত্র দুজন এ দেশে পরিবার নিয়ে এসেছিলেন। তবে পুত্ররা বড়ো হলে, অভিবাসীরা তাঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে দেশ থেকে এ দেশে নিয়ে আসতেন এবং কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দিতেন। তখন নিয়ম ছিলো যে,সন্তানদের বয়স আঠারোর বেশি হলে, তাঁদের আর এ দেশে আসার অধিকার থাকবে না। সিলেটী অভিবাসীরা ব্যাপক সংখ্যায় স্ত্রী এবং পরিবার নিয়ে আসতে আরম্ভ করেন ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর।

এ দিকে, কমনওয়েলথ-দেশগুলো থেকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় শ্রমিক আসার ফলে, ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গরা উৎকণ্ঠা বোধ করেন। তাঁদের অনেকে আশঙ্কা করেন যে, এর দরুন তাঁদের চাকরি-বাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। তা ছাড়া, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ/ভীতি থেকেও অনেকে বর্ণবাদী প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন। "ব্রিটেন শ্বেতাঙ্গ ব্রিটনদের জন্যে" এবং "কৃষ্ণাঙ্গদের এ দেশ থেকে চলে যেতে হবে" – এই নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টি (বিএনপি) গঠিত হয় ১৯৬৬ সালে। এই দল

তারপর থেকে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নিতে আরম্ভ করে এবং কোনো কোনো এলাকায় খানিকটা জনসমর্থনও লাভ করে।

অভিবাসন-বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জোগান ইনক পাওয়েল। তিনি ছিলেন মধ্য ইংল্যান্ড থেকে নির্বাচিত রক্ষণশীল দলের একজন পার্লামেন্ট সদস্য। ১৯৬৭ সাল থেকে বিভিন্ন বক্তৃতা এবং রচনার মাধ্যমে তিনি প্রচার করতে আরম্ভ করেন যে, অভিবাসী শ্রমিকরা তাঁদের পরিবার নিয়ে আসার ফলে এবং অপরিকল্পিতভাবে তাঁদের পরিবার বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেন ভবিষ্যতে একটা দারুণ সমস্যার মুখোমুখি হবে। ১৯৬৮ সালে ব্যর্মিংহ্যামে প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন যে, একদিন কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গদের সহিংসতার ফলে ব্রিটেনে "রক্ত নদী" বয়ে যাবে। অনেকটা তাঁরই উদ্যোগে ১৯৬৮ সালে তড়িঘড়ি করে পার্লামেন্টে মাত্র তিন দিনের বিতর্কের পর একটি আইন প্রণীত হয়, যার মাধ্যমে কেনিয়া থেকে উপমহাদেশের অভিবাসীদের আগমনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়; যদিও ব্রিটিশ সরকার আগে থেকেই কেনিয়ার বিতাড়িত ভারতীয়দের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও তাঁদের ঢালাওভাবে ব্রিটেনে আসার পথ এই আইন দিয়ে রুদ্ধ করা হয়।

তাঁর বর্ণবাদী বক্তৃতার ফলে ইনক পাওয়েল রক্ষণশীল দলের শ্যাডো মন্ত্রীসভায় তাঁর পদ হারান। কিন্তু তিনি যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সরকার তা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে নতুন আইন প্রণীত হয় যে, এক মাত্র কাজের উদ্দেশে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে অভিবাসীরা ব্রিটেনে আসতে পারবেন। তা ছাড়া, মা সঙ্গে না-থাকলে পুরোনো অভিবাসীরাও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে আসতে পারবেন না — এমন আইনও প্রণীত হয়। এই আইনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসীরা অনেকেই স্ত্রী-সহ গোটা পরিবার এ দেশে নিয়ে আসতে বাধ্য হন। একদিন তাঁরা এ দেশে এসেছিলেন অস্থায়ীভাবে থেকে টাকাপয়সা উপার্জন করে দেশে চলে যাওয়ার উদ্দেশে; কিন্তু আইনের চাপে তাঁরা শেষ পর্যন্ত বাধ্য হন তাঁদের পুরো পরিবার এ দেশে নিয়ে এসে এখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা নিশ্চিত করার জন্যেও তাঁরা কেউ কেউ পরিবার নিয়ে এসেছিলেন।

১৯৭০ সালকে একটা মাইল-ফলক হিশেবে চিহ্নিত করলে বলা যায় যে, তখন পর্যন্ত সিলেটী অভিবাসীরা কার্যত দুটি সংসার করতেন — একটি বিলেতে, অন্যটি দেশে। এখানে বাস করতেন কয়েকজন পুরুষ মিলে একটা বাড়ি ভাড়া করে। আর, সিলেটে থাকতেন তাঁদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা। কিন্তু তারপর থেকে এই চিত্র বেশ দ্রুত গতিতে পাল্টে যেতে আরম্ভ করে।

১৯৭১-এ এমন দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটলো, যা এই পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। এই বছর এক দিকে কঠোর অভিবাসন আইন প্রণীত হয়, অন্য দিকে একটি স্বাধীন দেশ হিশেবে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করে। অভিবাসন আইন কঠোর হওয়ায় আরও বেশি অভিবাসী বাংলাদেশ থেকে তাঁদের পরিবার নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন । আর, স্বাধীন বাংলাদেশে পাসপোর্ট পেতেও তাঁদের আর কোনো

বাধা ছিলো না। এভাবে ১৯৭০-এর দশকে বাঙালিদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। এই ধারা এর পরেও অক্ষুণ্ন থাকে। সে জন্যে, ১৯৮১ সালে বাঙালিদের সংখ্যা যা ছিলো, পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে তা আড়াই গুণ বৃদ্ধি পায় (২৪৪%)। ধরে নিতে পারি, ১৯৭০-এর শতকে বাঙালিদের বৃদ্ধির হার ছিলো শতকরা ৩০০ বা তার চেয়েও বেশি।

১৯৮০-এর দশকেও বৃদ্ধির হার বেশি থাকার কারণ কী? বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, অভিবাসন আইন ধাপে ধাপে ক্রমাগত কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিলো। ১৯৮২ সালে এমন অন্যায্য আইনও প্রণীত হয় যে, ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করলেও সে সন্তান ব্রিটেনের নাগরিক বলে গণ্য হবে না, যদি না তার পিতামাতাও ব্রিটিশ নাগরিক হন। এই পরিবেশে প্রবাসী বাঙালিরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, আরও দেরি করলে তাঁদের পরিবার নিয়ে আসা অসম্ভব হবে। তা ছাড়া, স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক ডামাডোল চলতে থাকে। অর্থনৈতিক সংকটও বৃদ্ধি পায়। তদুপরি, যে-প্রবাসীরা ১৯৫০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকে ১৯৮০-এর দশকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যান। তাঁরা সে জন্যে পরিবার কাছে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

বাঙালিদের বাস করার জন্য ব্রিটেনেও এ সময়ে অনুকূল অবস্থা তৈরি হয়। যেমন, বাংলাদেশী খাবার খুব সহজলভ্য হয়। দেশীয় এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, বাংলাদেশী পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশেই একটা স্বদেশী পরিবেশ এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশে যে-প্রবাসীরা পরিবার নিয়ে আসতে দ্বিধা বোধ করছিলেন, তাঁরাও পরিবার নিয়ে আসতে উৎসাহ বোধ করেন। এর ফলে ব্রিটেনে কেবল বাংলাদেশী শিশুদের সংখ্যাই বাড়েনি, মহিলা এবং প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সংখ্যাও যথেষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় — জরিপ অনুসারে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হলো শতকরা ৩০ ভাগ। ১৯৯০-এর দশকেও তাই বাংলাদেশীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৃদ্ধির হার আগের দশকের চেয়ে খানিকটা কম: পৌনে দু গুণ (১৭৪%)।

অনেকে বলেন যে, ১৯৮০/৯০-এর দশকে পরিবার এবং আত্মীয়দের নিয়ে আসার ব্যাপারে অভিবাসীরা এতোটাই সচেতন হয়ে ওঠেন যে, অসত্য তথ্য দিয়ে অথবা আইন ফাঁকি দিয়েও তাঁরা আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতদের নিয়ে এসেছিলেন। ভাইবোনের সন্তানদের নিজের সন্তান হিশেবে পরিচয় দিয়ে নিয়ে আসার ঘটনা তো ঘটেইছে, এমন কি, নিজের ভাই অথবা শ্যালককে নিজের সন্তান হিশেবে পরিচয় দিয়ে নিয়ে আসার ঘটনাও জানা যায়। বেআইনীভাবে মানুষ পাচারের এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার কয়েক বছর আগে ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে সন্তান প্রমাণ করে তবে তাদের নিয়ে আসার নিয়ম চালু করে।

তারপরেও এ দেশে আসার পথ এখন একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। যেমন, এখনো অভিবাসীরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে সেখানকার পাত্র/পাত্রীর

সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের পর সেই সন্তানদের স্বামী / স্ত্রীকে নিয়ে আসার আইনী ব্যবস্থা আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই সন্তানদের প্রমাণ করতে হয় যে, স্বামী অথবা স্ত্রীকে নিয়ে আসার এবং এ দেশে রাখার মতো তাদের নিজস্ব আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে। এই আইন দিয়েও অভিবাসীদের আগমনের স্রোত রুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি বলে অতিসম্প্রতি আইন হয়েছে যে, ব্রিটেনের নাগরিক হতে হলে ইংরেজি ভাষা এবং ব্রিটেনের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। আমার ধারণা, এ যাবৎ অভিবাসী নিয়ন্ত্রণ করার যেসব আইন প্রণীত হয়েছে, এ আইন হলো সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কঠোর। অন্তত এ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে অদক্ষ এবং অশিক্ষিত শ্রমিকদের জন্যে এ দেশে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

অপর পক্ষে, দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ শ্রমিকদের আগমনের পথ এর পরেও খোলা থাকবে। কারণ তাঁরা বিশেষ ধরনের দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে এ দেশে আসতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরাও স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে এ দেশে আসেন এবং তাঁদের কেউ কেউ আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে এ দেশেই থেকে যান। স্টুডেন্ট ভিসা দেওয়ার জন্যে কিছু ভুয়ো অথবা নাম-সর্বস্ব কলেজও গড়ে উঠেছে। তবে নানা পথে অভিবাসীরা এলেও যেমনটা একটু আগেই পরিসংখ্যান থেকে দেখেছি — ১৯৯১ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে আগত বাঙালি অভিবাসীদের সংখ্যা আগের দশকের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তার পরের হিশেব জানা না-গেলেও অনুমান করা হয় যে, এখন এ হার আরও কমে গেছে। সুতরাং এমন ধারণা করলে ভুল হবে না যে, বিপুল সংখ্যায় অভিবাসীদের আগমনের ধারা এক সময়ে পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে।

ব্রিটেনে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা, বিশেষ করে ভারত এবং পাকিস্তান থেকে আসা অভিবাসীদের তুলনায় বাঙালিদের সংখ্যা কম হওয়ার একটা কারণ হলো: বাঙালিরা প্রায় সবাই আসেন শ্রমিক হিশেবে এবং আসেন পূর্ব পাকিস্তানের একটা বিশেষ অঞ্চল থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা থেকে তখন খুব কম লোকই এসেছিলেন। তা ছাড়া, পশ্চিম বাংলা থেকেও যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা শ্রমিক ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রধানত শিক্ষার্থী। খুব সামান্য সংখ্যক লোক। শ্রমিকের কাজ করার জন্যে সেখান থেকে আদৌ কেউ এসেছিলেন কিনা, তাতেই সন্দেহ আছে। তাঁরা প্রায় সবাই আসেন লেখাপড়া করার জন্যে অথবা চাকরির সন্ধানে। এ রকমের দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

হি. ভট্টাচার্য লেখাপড়া করার জন্যে লন্ডনে আসেন ১৯৫৫ সালে। প্রথমে ড. এন সেনের মেসে থাকেন। তারপর মাস ছয়েক পরে যখন তাঁর স্ত্রীও এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন, তখন তিনি একটি ঘর ভাড়া করে সেখানে চলে যান। তারপর এক সময়ে তাঁর লেখাপড়া শেষ হয়, কিন্তু তাঁর আর দেশে ফিরে যাওয়া হয়নি। প্র. রায় দেশ থেকে এমবি পাশ করে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিলেতে আসেন। শিক্ষা তিনি লাভ করেন ঠিকই, কিন্তু কখনো আর দেশে ফিরে যাননি। ন. ব্যানার্জি দেশে ব্যাংকে কাজ করতেন। ধর্মঘট করার কারণে তাঁর চাকরি চলে গেলে, তিনি কাজের খোঁজে

লন্ডনে আসেন ১৯৫৮ সালে। তখন ভারতীয়রা সহজে একটা কাজ পেতেন ডাকঘরে, বেশির ভাগই চিঠিপত্র বিলি করার কাজ। কিন্তু ব্যানার্জি ঘোরাঘুরি করে অ্যাকাউন্টেন্টের কাজই পেয়ে যান। তারপর বছর দুয়েক পরে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। দেশে ফিরে যেতে পারেননি। এ রকম আরও এসেছিলেন দিলীপ চৌধুরী, মনোতোষ মজুমদার, অনিল ব্যানার্জি, অমিয় বসু প্রমুখ।

মোট কথা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষিত কিছু লোক এলেও, যেহেতু তাঁরা দলে দলে শ্রমিকের কাজ করতে আসেননি, সে জন্যেই বাঙালি অভিবাসীদের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু এবং সিলেটী মুসলমানদের সংখ্যায় বড়ো ধরনের বৈষম্য দেখা দেয়। তা ছাড়া, যেহেতু বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকেও বেশি লোক আসেননি, সে জন্যে সিলেটী এবং 'ঢাকাই' বাঙালিদের সংখ্যায়ও বিরাট পার্থক্য রচিত হয়। অপর পক্ষে, পাঞ্জাবী অভিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ — সব ধর্মের লোক এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের লোকই ছিলেন। এ জন্যে পাঞ্জাবীদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায়, বাঙালিদের সংখ্যা সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়নি।

বিলেতে বাঙালিদের তিনটি, বলতে গেলে, একেবারে ভিন্ন রকমের সম্প্রদায় রয়েছে এবং এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য এতো বেশি যে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার করে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো: এই বৈষম্য এখনও বাড়ছে। তারও কারণ আঞ্চলিক এবং পেশাগত।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা আসেন এবং এখনও আসছেন, তাঁরা শিক্ষিত পেশাদার। অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে পেশাদার হিশেবে কেউ আসেন না, তা নয়; কিন্তু আগতদের সিংহ ভাগই সাধারণ কাজ করতে আসেন। রেস্টুরেন্টের কাজ পেলেও তাঁদের অনেকেই বর্তে যান। এমন কি, অনেকে রেস্টুরেন্টে কাজ পাবেন — এই ভরসাতেই আসেন। তা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ এলে বিলেতে বসবাস করার জন্যে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের কাছ থেকে যতোটা সহায়তা পান, সিলেট থেকে কেউ এলে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তাঁরা সহায়তা পান তার চেয়ে ঢের বেশি। আগেই বলেছি, সিলেটের লোকেদের মধ্যে আত্মীয়তার যে-দৃঢ় বন্ধন রয়েছে, সে রকমের বন্ধন বাংলাদেশ অথবা পশ্চিমবঙ্গের অন্য জেলার লোকেদের মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায় না।

আর-একটা প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে: আগে অভিবাসীরা আয়-উন্নতি করে দেশে ফিরে যেতেন, কিন্তু এখন এখানেই থেকে যায়। এর কারণ কি?

কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিলেত থেকে লেখাপড়া শিখে দেশে ফিরে লোকেরা ভালো কাজ পেতেন। কোনো কোনো সময় একঘরে হলেও অথবা সাময়িকভাবে একঘরে হলেও তারপর সমাজে গৃহীত হতেন এবং মর্যাদা লাভ করতেন। 'অমুক বিলেতফেরত' এ কথাটার মধ্য দিয়ে সেই 'অমুকে'র প্রতি সম্মানই দেখানো হতো। কিন্তু বিশ শতকের শেষ তিন দশকে অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে আরম্ভ করলো।

বিলেতি শিক্ষা থাকলেই যে দেশে ভালো কাজ জুটবে — এর সম্ভাবনা ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া, দেশে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষার বিকাশের ফলে এখন আগের তুলনায় বেকারত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাথা-ভারী শিক্ষা পদ্ধতির কল্যাণে কী পশ্চিম বাংলায়, কী বাংলাদেশে বর্তমানে যতো শিক্ষিত লোক জোটে, চাকরির সংখ্যা তার থেকে ঢের কম। এর দরুন যারা বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেছেন, তাঁরা অনেকে দেশে ফেরার প্রতি আগ্রহ দেখান না। কোনো মতে, দরকার হলে নিম্নতর পেশার কাজ করে, বিদেশের মাটিই আঁকড়ে ধরতে চান। এমন কি, যাঁরা অনেক দিন বিদেশে বাস করে সচ্ছল জীবনের স্বাদ পেয়ে স্বদেশে ফিরে গেছেন, তাঁরা দ্বিতীয় বার বিদেশে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের একজন অধ্যাপক পিএইচডি করে দেশে ফিরে না-গিয়ে এখন লন্ডনে পাতালরেল চালান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বর্তমানে লন্ডনে বেআইনী জায়গায় গাড়ি রাখা হচ্ছে কিনা, তা তদারকির জন্যে যে-ট্রাফিক ওয়ার্ডেন থাকে, সেই কাজ করছেন। নিউ ইয়র্কেও বহু শিক্ষিত বাঙালি অন্য কাজের অভাবে ভাড়ার ট্যাক্সি চালানোর কাজ করেন।

দেশে শিক্ষা লাভ করে যাঁরা ছোটোখাটো কাজ করছিলেন, অথবা পুরোপুরি বেকার ছিলেন, তাঁরা বিদেশে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে বেপরোয়াভাবে চেষ্টা করেন। তার জন্যে জমিজমা বিক্রি করে আদম ব্যাপারীকে টাকা দেন। এমন কি, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সাহারা মরুভূমি পার হতে, ডিঙিতে করে সাগর পাড়ি দিতে, অথবা ট্রাকের মালের তলায় শুয়ে থেকে আধ-মরা হতেও এই ভাবী অভিবাসীরা রাজি হন। বিদেশে যাওয়ার পথে বহু বাঙালিই প্রাণ হারিয়েছেন বলে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়। তা সত্ত্বেও এক মাত্র বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য এবং ইউরোপ-অ্যামেরিকায় আশি লাখ শ্রমিক গিয়েছেন বলে বেসরকারী হিশেবে বলা হয়। এই সংখ্যায় অতিরঞ্জন থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যিকার সংখ্যা এর অর্ধেক হলেও বলতে হবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা তিন ভাগ বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন। কেবল অর্থনৈতিক কারণে এ রকম ব্যাপকভাবে দেশত্যাগের ঘটনাকে বিরল বলে আখ্যায়িত করতে হবে।

অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের দরুন এক সময়ে কালাপানি পাড়ি দেওয়া পাপের কাজ বলে বিবেচিত হতো। অপরিচয়ের কারণে তখন বিদেশ সম্পর্কে একটা ভীতিও কাজ করতো অনেকের মনে। তা ছাড়া, পারিবারিক বন্ধন এমন দৃঢ় ছিলো যে, ইচ্ছে করলেই কেউ পরিবার ছেড়ে দূরে যেতে পারতো না। কিন্তু কালে কালে একান্নবর্তিতা তো ভেঙে গেছেই, পারিবারিক শাসন এবং বন্ধনও শিথিল হয়ে পড়েছে। সুযোগ পেলে বিদেশ গমনে কেউ বাধা দেয় না। বরং পরিবারের বয়স্করাও তরুণদের বিদেশে যেতে উৎসাহিত করেন। তরুণরাও বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখার এবং

চাকরি করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। উভয় বঙ্গেই সাধারণ লোকেরা বিদেশে কাজ করাকে এখন সম্মানের চোখেই দেখেন — বিদেশে আয় বেশি বলে।

বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, বাংলাদেশ থেকে সাধারণ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা, এমন কি, অশিক্ষিত ব্যক্তিরাও আদম ব্যাপারীকে নিজের যথাসর্বস্ব দিয়ে বিদেশে এসে অতি সাধারণ কাজ করতেও তৈরি থাকেন। বস্তুত, মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে গিয়ে রাস্তায় ঝাঁট দেওয়ার কাজ পেলেও অনেকে দারুণ সন্তুষ্ট হন। যা আরও বিস্ময়ের তা হলো: এ কাজে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ-সহ ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে হাজার হাজার মহিলা মধ্যপ্রাচ্যে গিয়ে সম্মানজনক এবং অসম্মানজনক — নানা ধরনের কাজই করছেন এখন।

বিলেতে অবশ্য রাস্তায় ঝাঁট দেওয়ার কাজ মেলে না। এখানে সবচেয়ে সহজে কাজ মেলে নানা দেশের রেস্টুরেন্টে — খুব কম বেতনে। পূর্ব ইউরোপ থেকে যাঁরা বিলেতে আসেন, তাঁরা বেশির ভাগই দক্ষ শ্রমিক। বাড়ি তৈরি করা, বৈদ্যুতিক কাজ করা, কারখানায় কাজ করা ইত্যাদি করেন। এমন কি, অদক্ষ শ্রমিকরা বাড়ি পরিষ্কার করার কাজও ঘৃণা করেন না। তাঁরা অনেক পরিশ্রমীও। অপর পক্ষে, বাঙালিরা সাধারণত এসব কাজে আগ্রহী নন অথবা এসব কাজের দক্ষতা নেই তাঁদের। তাঁদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা খুব কমই। তা ছাড়া, তাঁরা পরিশ্রমের কাজ সহজে করতে চান না। অনেক রেস্টুরেন্টের মালিকই অবশ্য বাঙালিদের নিয়োগ দিতে আগ্রহী থাকেন। কারণ, ঘণ্টায় ন্যূনতম বেতন দেওয়ার যে-সরকারী আইন আছে এঁদের তার চেয়েও কম বেতনে নিয়োগ করা যায়। অনেক মালিক কম বেতনের কর্মচারীদের কোনো নথিও রাখেন না বলে শোনা যায়।

দেশে — বিশেষ করে — বাংলাদেশে জীবনের নিরাপত্তা কম এবং কঠোর সংগ্রাম করে সংসার চালাতে হয়। তদুপরি, অনেক কিছুই অনিয়ম এবং ঘুসের উপর নির্ভরশীল। অমুসলমান হলে তো কথাই নেই। সাম্প্রদায়িক হয়রানি এবং বৈষম্যের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় শতকরা প্রায় এক শো ভাগ। সরকারী চাকরি পাওয়াও হিন্দুদের পক্ষে বেশ কঠিন। পরীক্ষার ফলাফলেও কখনো কখনো বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। আর, চাকরির উন্নতিতে বাধা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বিশেষ করে কমবয়সী মেয়ে হলে কর্মস্থানে যৌন হয়রানি, এমন কি, ধর্ষণের সম্ভাবনাও থেকে যায়। ভোট দিলেও অথবা না-দিলেও নির্বাচনের পর তাঁদের ওপর অতীতে অনেক বার হামলা হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় ছবি-সহ অনেক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কাজেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সুযোগ পেলে বিদেশে যাওয়ার জন্যে বিশেষ আগ্রহী থাকেন, যদিও তাঁদের পক্ষে বিদেশে যাওয়া তুলনামূলকভাবে কঠিন। কোনো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বৃত্তি লাভের সম্ভাবনা তাঁদের নেই বললেই চলে। এ অবস্থায়, তাঁদের মধ্যে যাঁদের আর্থিক সঙ্গতি থাকে, কেবল তাঁরাই আদম ব্যাপারীকে তুষ্ট করে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান। বাংলাদেশ থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এ জন্যে অতো কম।

এখন যে অনেকে বিদেশে এসে বিদেশেই থেকে যান, তার পেছনে আরও কতোগুলো কারণ কাজ করে। আগে বিদেশে থাকতে গেলে বিভিন্ন ধরনের অসুবিধে স্বীকার করেই থাকতে হতো। যেমন, দেশীয় লোকেদের অভাবে অনেক সময় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হতো। কিন্তু এখন লন্ডন অথবা নিউ ইয়র্কের মতো জায়গায় ছোটো ছোটো বাংলাস্তান গড়ে উঠেছে। বাংলাস্তান বলার কারণ এই সম্প্রদায়গুলোর বিশাল ভাগই মুসলমানদের এবং এঁরা বেশির ভাগই ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তানীদের মতো খুব অনুগত। নিজেদের স্বরূপের ব্যাপারেও তাঁরা পাকিস্তানীদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য অনুভব করেন। এই বড়ো সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস করায় এখন আর তাঁরা দেশের অভাব অথবা দেশে যাওয়ার তাগিদ বেশি অনুভব করেন না।

বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাঁরা আসতেন, তাঁরা দেশীয় খাবারের অভাবও খুব অনুভব করতেন। এসব খাবার তখন কালে-ভদ্রে পাওয়া যেতো। ভাতের প্রতি বাঙালিদের আকর্ষণ এতো প্রবল যে, যে-কালে লন্ডনে চাল খুব কম পাওয়া যেতো অথবা মাঝেমধ্যে পাওয়া যেতো, সেই সময়ে — ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি — মোহাম্মদ আশকের আখনজিকে তাঁর ভাই কলকাতা থেকে পার্সেল করে একটি থলিতে চাল পাঠিয়েছিলেন। আখনজির পুত্র সেই থলি এখনো স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। ক্যারোলাইন অ্যাডামসের বই-এ সংগৃহীত সাক্ষাৎকারগুলোর একটিতে আবদুল মান্নান (চানু মিয়া) বলেছেন যে, তাঁর ৩৬ নম্বর প্যার্সি স্ট্রীটের রেস্টুরেন্টে যখন চাল থাকতো না, তখন স্পেগিটি টুকরো টুকরো করে অনেকটা ভাতের চেহারা দেওয়া হতো। লস্কররা সেই স্পেগিটি খেয়েই ভাতের স্বাদ মেটাতেন। মোট কথা, দেশী খাবার তখন পাওয়া যেতো না এবং সেটাও দেশে ফিরে যাওয়ার একটা কারণ হিশেবে কাজ করতো।

কিন্তু এখন লন্ডন, ব্যর্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, এডিনবরা-সহ ব্রিটেনের এমন কোনো শহর নেই, যেখানে বাঙালি-চালিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, বাংলাদেশী খাবার বাংলাদেশী অথবা পাকিস্তানীদের গ্রোসারি শপেও পাওয়া যায়। এসব দোকানে চাল, ডাল, মশলা, দেশী মাছ, তরকারি-সহ সব রকমের দেশী খাবার কেনা যায়। তার চেয়েও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো: বড়ো সুপারমার্কেটগুলোতেও চাল এবং উপমহাদেশের খাবার পাওয়া যায়। এমন কি, অনেক সুপারমার্কেটে ভারতীয় তৈরি খাবারও বিক্রি হয়। কাজেই দেশী খাবারের সরবরাহ সম্পর্কে স্বামীদের প্রতি গৃহিণীদের কোনো অভিযোগ নেই।

দেশের অভাব মানুষ আরও অনুভব করে সাংস্কৃতিক কারণে, দেশীয় আমোদপ্রমোদের জন্যে। এখন তারও এন্তার ব্যবস্থা রয়েছে। লন্ডনে বাংলা টেলিভিশনের একাধিক চ্যানেল আছে। নিউ ইয়র্কে আছে তার চেয়েও বেশি। ইটালির মতো ইউরোপের কোনো কোনো দেশেও এসব বাংলা চ্যানেল দেখা যায়। তা ছাড়া, বাঙালিরা নিজেরাও মাঝেমধ্যে গান-বাজনা এবং নাচের অনুষ্ঠান করেন। বাংলা পত্রপত্রিকাও আছে অনেকগুলো। সেসব পত্রিকায় দেশের বাসী খবর ছাপা হয়। তা পড়েও অনেকে

দেশের খানিকটা স্বাদ পান। মোট কথা, লন্ডন, রোম, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি জায়গায় ছোটো ছোটো বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। সেই বাংলাদেশে বাস করে এখন কেউ আর বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম অথবা সিলেটের জন্যে উতলা হয়ে ওঠেন না।

আগে দেশে ফিরে যাওয়ার আর-একটা কারণ ছিলো বর্ণবাদ এবং বর্ণবৈষম্য। তখন বাঙালি অথবা ভারতীয়রা যোগ্যতা থাকলেও ভালো অথবা ভদ্র চাকরি পেতেন না। কিন্তু, আগেই বলেছি, এখন ডাক্তারদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই ভারতীয় এবং বাঙালি। নার্সদের মধ্যেও আছেন অনেক ভারতীয়, বাংলাদেশী তেমন না-থাকলেও। উপমহাদেশের লোকেরা অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভ করে বড়ো চাকরির জন্যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। শিক্ষিত এবং যোগ্য লোক দেখে দেখেও ইংরেজ এবং অন্য বিদেশীরা এখন বাঙালিদের প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাশীল হচ্ছেন। তা ছাড়া, বাঙালি, ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা দেশের কোনো কোনো জায়গায় তাঁদের সংখ্যার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে বিবেচিত হচ্ছেন। ফলে চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকারের আইন আগের তুলনায় কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখন বৈষম্য করার খুব বেশি উপায় নেই।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বিলেত এখন বাঙালিদের বাসের জন্যে বেশ অনুকূল জায়গাতে পরিণত হয়েছে। একটা সময় ছিলো যখন ভাষার জন্যে অনেক লোক এ দেশে বাস করতে গিয়ে অসুবিধের মুখোমুখি হতেন অথবা কোনো চাকরি পেতেন না। কিন্তু এখন ইংরেজি না-জানা একজন লোক এ দেশে এলেও নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো কাজ জুটিয়ে নিয়ে বছরের পর বছর ইংরেজি না-শিখে বাস করতে পারেন। এসব বাঙালি-পাড়াকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশেরই সম্প্রসারণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে এর পরেও বাঙালি অভিবাসী তথা বাঙালি সম্প্রদায়ের আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে কিনা। এক কথায় এর উত্তর হলো: বাড়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, ব্রিটেনে যে-দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তান জন্মের হার সবচেয়ে বেশি, তাঁরা হলেন পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশের বাঙালিরা। এঁদের অনেকের পরিবারে সন্তানদের সংখ্যা চার-পাঁচজন। আট-দশ সন্তানের পরিবারও একেবারে বিরল নয়। ফিলিপসন এবং তাঁর সঙ্গীরা *Women in Transition* গ্রন্থের জন্যে যে-জরিপ করেন, তা থেকে দেখা যায় যে, তাঁদের জরিপ-করা পরিবারগুলোতে সন্তানসংখ্যা গড়পড়তা ৫.২ জন। এই সংখ্যার সঙ্গে ১৯৯১ সালের লোকগণনার মিল দেখা যায়। তখন বাংলাদেশী পরিবারের গড় আয়তন ছিলো ৫.৩ জন। ২০০১ সালের লোকগণনার হিশেব থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তখন পরিবারের আয়তন দাঁড়ায় চার দশমিক সাতে, যেখানে ভারতীয় পরিবারের আয়তন ছিলো ৩.৩ এবং শ্বেতাঙ্গদের ২.৩। ১৯৯৬ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর একটি জরিপ করা হয়েছিলো, তা থেকে দেখা গিয়েছিলো যে, জরিপ-করা পরিবারগুলোর মধ্যে ৯টি বাংলাদেশী পরিবারে সন্তানসংখ্যা ছয় অথবা তার চেয়ে বেশি। এমন কি, দশ / বারোটি সন্তানের পরিবার যে নেই তা নয়।

Across Seven Seas and Thriteen Rivers গ্রন্থে একজন অভিবাসীর কথা জানতে পাই, যাঁর সন্তান সংখ্যা আঠারো।

বস্তুত, বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বয়স্কদের অনুপাতে কমবয়সীদের সংখ্যা কতোটা বেশি, তার প্রমাণ মেলে ২০০১ সালের লোকগণনার হিশেব থেকে। এতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশীদের মধ্যে ষোলো বছরের কম বয়সীদের শতকরা হার হলো ৩৮। অন্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এই হারই সবচেয়ে বেশি। ১৯৯৬ সালে নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের যে-জরিপ হয়েছিলো, তা থেকে এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তখন বাংলাদেশীদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জনের বয়স ছিলো ১৫ অথবা তার চেয়ে কম, শতকরা ৪৮ জনের বয়স ১৬ থেকে ৫৯, আর শতকরা মাত্র ৪ জনের বয়স ৬০ অথবা তার চেয়ে বেশি। স্কুলে ভর্তির সংখ্যা থেকেও বাংলাদেশীদের মধ্যে কমবয়সীদের অনুপাত কতো বেশি, তা দেখা যায়। যেসব এলাকায় বাঙালি এবং পাকিস্তানীদের ঘন বসতি আছে, সেসব এলাকায় সন্তান সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্কুলে তাদের ভর্তি করা এরই মধ্যে একটা সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

এসব তথ্য থেকে মনে হয় যে, সরাসরি বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসীদের সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে কমে গেলেও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে বাঙালিদের সংখ্যা সামনের দশ-পনেরো বছর যথেষ্ট বাড়বে। তবে তারপর এই হার এখনকার তুলনায় হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, দ্বিতীয়/তৃতীয় প্রজন্মের বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার যতো বিকাশ ঘটবে, পরিবারের আয়তন সম্পর্কে তাঁরা ততোই সচেতন হবেন। তা ছাড়া, এসব পরিবারের স্ত্রীরাও ধীরে ধীরে কর্মজীবী হবেন। তা-ও পরিবারের আয়তনের ওপর স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করবে। কর্মজীবী স্ত্রীরা বেশি সন্তান নিতে পারেন না। এখন বর্ধিত পরিবারে সন্তান দেখাশোনার যে-সুবিধে আছে, তাও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এ ছাড়া, গত সিকি শতাব্দীতে শিশু ভাতা, বেকার ভাতা এবং স্বল্প-আয় ভাতা যেভাবে কমে গেছে, তা পরিবারের আকারের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছে এবং ভবিষ্যতে আরও ফেলাই স্বাভাবিক। অনেকেই এখন অনুভব করতে পারছেন যে, একটা বড়ো পরিবার পোষণ করা আদৌ সহজ নয়। একটা সময় ছিলো, যখন শিশু-ভাতার লোভেও বহু পিতামাতা সন্তান নিতেন। তাঁদের ধারণা ছিলো, শিশু-ভাতা দিয়েই তাঁরা পরিবারের সন্তানদের মানুষ করতে পারবেন।

বাংলাদেশীদের সংখ্যা এবং পরিবারের আয়তন সম্পর্কে লোকগণনার হিশেব থেকে একটা ধারণা করা সম্ভব হলেও, ভারতীয় বাঙালিদের সম্পর্কে কোনো পরিসংখ্যানই মেলে না। কারণ, লোকগণনার সময়ে যেভাবে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় সংগ্রহ করা হয়, তাতে ভারতীয় বাঙালিদের পক্ষে নিজেদের বাঙালি বলে শনাক্ত করার মতো কোনো প্রশ্ন থাকে না। অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক এবং জন্মস্থান সম্পর্কে এমন প্রশ্ন থাকে না, যাতে ভারতীয় বাঙালিরা নিজেদের পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন। জরিপ হয় জাতীয়তার ভিত্তিতে। ফলে তাঁদের সংখ্যা এবং পরিবারের আয়তন সম্পর্কে আমরা কেবল অনুমান করতে পারি, কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা করতে পারিনে। তবে এ কথা বলা যায় যে,

প্রায় দেড় শো বছর ধরে এলেও তাঁরা এসেছেন কম এবং পরিবারের আয়তনও ছোটো। তাঁদের সংখ্যা এ জন্যে বাংলাদেশী বাঙালিদের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম — বড়ো জোর শতকরা দশ ভাগ হওয়া সম্ভব। শতকরা দশ ভাগ ধরলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ হাজারের কিছু বেশি।

স্কুল-কলেজে ভারতীয় বাঙালি ছাত্রছাত্রী এবং তাঁদের শিক্ষার মান সম্পর্কেও কোনো পরিসংখ্যান মেলে না। তারও কারণ একই। এ দেশে হসপিটালে ভর্তি, স্কুলে ভর্তি, স্থানীয় সরকারের নথিভুক্তি — সর্বত্রই নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটা ঘর থাকে। তাতে উপমহাদেশের লোকেদের জন্যে যে-বিকল্পগুলো থাকে, সেগুলো হলো: ভারতীয় এশিয়ান, বাংলাদেশী এশিয়ান এবং পাকিস্তানী এশিয়ান। কিন্তু বাঙালি বলে কোনো বিকল্প থাকে না।

বিলেতি বাঙালির সামাজিক অবস্থান

শিক্ষা ও জীবিকা

একজন-দুজন করে বাঙালিরা বিলেতে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন প্রায় দেড় শো বছর আগে থেকে। কিন্তু এতো দীর্ঘকাল ধরে এ দেশে বাস করলেও শিক্ষা, সম্পদ এবং সামাজিকভাবে এ দেশের সঙ্গে সামান্যই সমন্বিত হয়েছেন। বরং তাঁদের অনেক পরে যে-অভিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চল থেকে এসেছেন, তুলনামূলকভাবে তাঁরা এ সব বিষয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছেন। ১৯৯০-এর দশকের বেশ কয়েকটি জরিপ থেকে দেখা গিয়েছিলো যে, ইংল্যান্ডে যেসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে, শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছে আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশীরা। অপর পক্ষে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ছিলো ভারতীয় সম্প্রদায়। কিন্তু ২০০১ সালের লোকগণনা এবং তার পরবর্তী একাধিক জরিপ থেকে বাংলাদেশী বাঙালিদের অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এখন আর স্কুলের শিক্ষায় বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান অন্য সবগুলো সম্প্রদায়ের নিচে নয়। বরং তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশী মেয়েরা — যেমনটা দেখা যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি সম্প্রদায়েই মেয়েদের ফলাফল ছেলেদের চেয়ে যথেষ্ট ভালো।

জিসিএসই (স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষার ফলাফল

৫টি বিষয়ে সি থেকে এ* গ্রেড প্রাপ্ত প্রার্থীর শতকরা হিশাব

সম্প্রদায়	ছেলে	মেয়ে
চীনা	৬৮	৭৮
ভারতীয়	৬৫	৭২
শ্বেতাঙ্গ	৫০	৬০
বাংলাদেশী	৪২	৫৫

এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকিস্তানী এবং কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়সহ অন্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের অবস্থান বাংলাদেশীদের নিচে। এ থেকে আরও একটা জিনিশ লক্ষ্য করা যায় — ভারতীয়দের মধ্যে ছেলে এবং মেয়েদের শিক্ষায় পার্থক্য সবচেয়ে কম অর্থাৎ লেখাপড়ায় ভারতীয় ছেলেমেয়ে উভয়ই প্রায় সমান উৎসাহী। অপর পক্ষে, বাংলাদেশীদের মধ্যে ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় লেখাপড়ায় খুব কম উৎসাহী।

স্কুলের পরীক্ষায় বাংলাদেশীদের এই উন্নতির কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত যে-ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তো, তাদের বেশির ভাগের জন্মই ছিলো বাংলাদেশে। অনেকে সেখানে খানিকটা লেখাপড়াও শিখে এসেছিলো। এমন কি, কেউ কেউ দশ/পনেরো বছর বয়সে এ দেশে এসে প্রথমবারের মতো লেখাপড়ার স্বাদ পায় — এমন ঘটনা কম হলেও, ছিলো। ইংরেজি ভাষা না-জেনে এ দেশে আসায় এই ছাত্রছাত্রীরা ভালো ইংরেজি শিখতে পারেনি। এবং শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু ইংরেজি, সে জন্যে অন্যান্য বিষয়েও তারা পিছিয়ে থেকেছে। এ রকমের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় সাহায্য দেওয়ার জন্যে তখন আলাদা শিক্ষক থাকতেন। তা সত্ত্বেও ইংরেজিতে তাদের দুর্বলতা থেকেই গেছে। এর দরুন তাদের পরীক্ষার ফলাফলই খারাপ হয়নি, বরং লেখাপড়া শেষ করার পর চাকরি পেতেও অসুবিধে হয়েছে।

অনেকে বলেন, স্কুল-কলেজেও এই ছাত্রছাত্রীরা এক ধরনের বর্ণবৈষম্যের শিকার হতো। শিক্ষকরা এই পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে কুণ্ঠিত হতেন। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাও লেখাপড়া শিখতে না-পেরে হাল ছেড়ে দিতো।

অপর পক্ষে, এখন যারা স্কুলে পড়ে, সেই ছেলেমেয়েদের প্রায় সবারই জন্ম বিলেতের মাটিতে। লেখাপড়ায় তারা যেমনই হোক, ইংরেজি বুঝতে এবং বলতে তাদের কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং এখন তাদের পক্ষে স্কুলের শিক্ষা গ্রহণ করা আগের তুলনায় সহজ হয়েছে। এ জন্যেই ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিক থেকে বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের স্কুলের ফলাফল ধীরে ধীরে ভালো হতে আরম্ভ করে। লেখাপড়া শেষ হবার পর তাদের পক্ষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও এখন তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ভালো করার আর-একটা কারণ তাদের পিতামাতা এবং অভিভাবকরা লেখাপড়ার গুরুত্ব আগের চেয়ে বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এই প্রজন্মের অভিভাবকরা তাই সন্তানদের শিক্ষায় যতোটা উৎসাহী, আগেকার অভিভাবকরা ততোটা উৎসাহী ছিলেন না। ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত ষোলো বছর বয়স হলেই অভিভাবকরা তাঁদের পুত্রদের রেস্টুরেন্টে অথবা কলকারখানায় কাজ করতে পাঠাতেন। আর মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন স্কুল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতারা পুত্রদের চাকরি নিতে বাধ্য করেন না। অথবা মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্যেও তাঁরা আগের মতো ব্যতিব্যস্ত হন না।

এ জন্যে এখন বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের একটা বড়ো অংশ স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা (জিসিএসই) শেষ করার পর সিক্সথ ফর্মে (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে) থেকে যায় এবং এ-লেভেল অথবা পেশাদারী শিক্ষা জিএনভিকিউ করতে চেষ্টা করে। সিক্সথ ফর্মে থেকে যাওয়ার আর-একটা কারণ হলো: অর্থনৈতিক সুবিধে। যারা ষোলো বছর বয়সে স্কুল ফাইনাল শেষ করে সিক্সথ ফর্মে ভর্তি হয়, তারা দু বছর পর্যন্ত সপ্তাহে সপ্তাহে সরকারী ভাতা পায়। কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিলে এই ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা পেতে পারে চাকরি-সন্ধানীর ভাতা। এ ভাতা পাওয়ার জন্যে

তাদের প্রমাণ করতে হয় যে, তারা চাকরি পেতে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে। অনেকে তাই ফলাফল যেমনই হোক না কেন, ভাতার লোভেই স্কুলে থেকে যায়।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, ব্রিটেনে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক। সুতরাং বাংলাদেশী অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে বাধ্য হন। কিন্তু স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার পর যখন এই বাধ্যবাধকতা থাকে না, তখন ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই লেখাপড়া ছেড়ে দেয় অথবা আগে দিতো। মেয়েদের মধ্যে আবার অনেকের উচ্চশিক্ষায় না-যাওয়ার একটা কারণ পিতামাতারা তাদের উচ্চশিক্ষায় যেতে উৎসাহ দিতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিয়ে দিতে না-পারলেও তাদের ঘরে বসিয়ে রাখতেন। বিয়ের পরে শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত তাদের মধ্যে বিরল, নেই বললেই চলে। *Women in Transition* গ্রন্থ থেকে একজন মাত্র বিবাহিতার তথ্য জানা যাচ্ছে, যিনি বিবাহিত জীবন যাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে গিয়ে লেখাপড়াও শিখছেন।



বাঙালি পাড়ার প্রধান স্কুল মালবেরির ছাত্রী ও শিক্ষিকা। বাঙালিরা সবাই হিজাব পরা।

বাঙালি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল ভালো হওয়ার যে-পরিসংখ্যান উপরে উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে তাদের উচ্চশিক্ষার সত্যিকার চিত্র পাওয়া যায় না। সে দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা এখনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারছে না, বরং অধিকাংশ সম্প্রদায়ের তুলনায়ই তারা পিছিয়ে আছে। ২০০১/০২ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে চীনা, ভারতীয়, আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি পাওয়ার সম্ভাবনা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায়ও বেশি ছিলো। অপর পক্ষে, বাংলাদেশী এবং পাকিস্তানী ছাত্রছাত্রীদের অবস্থান ছিলো শ্বেতাঙ্গদের পেছনে। এর

অর্থ দাঁড়ায় এই যে, স্কুলের লেখাপড়া শেষ করার পর বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার দিকে কম যাচ্ছে। যারা যাচ্ছে, তাদের অনেকে সন্তোষজনক ফলাফল করতে পারছে না।

তবে এসব বাধা অতিক্রম করে আগের তুলনায় এখন বেশি বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার দিকে যাচ্ছে। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো ফলাফল করে কেউ কেউ এখন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে। এমন কি, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজেও ভর্তি হতে পারছে। বিশেষ করে যে-ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা শিক্ষিত অথবা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন, তাঁদের সম্পর্কে এই মন্তব্য বেশি প্রযোজ্য। বস্তুত, যেসব পরিবারে পিতামাতা অথবা বড়ো সন্তানরা শিক্ষিত, সেসব পরিবারের সন্তানদের ফলাফল অন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের মতোই উন্নত। যেহেতু বাংলাদেশী অধিকাংশ পরিবারে এ যাবৎ শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ছিলো না, সে জন্যে পরিসংখ্যান থেকে মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা বুঝি লেখাপড়াতেই খারাপ। কিন্তু তা ঠিক নয়। মেধার দিক দিয়ে বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীরা যে-কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। এমন কি, যেসব পরিবারে পিতামাতা অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত, সেসব পরিবারের সন্তানরাও এখন দু-চারজন ডাক্তার, এনজিনিয়ার, আইনজীবী অথবা শিক্ষক হয়েছেন। বিশেষত, যেসব পরিবার শহরকেন্দ্রের কাছে বাস না-করে বরং শহরতলিগুলোতে বাস করেছে, সেসব পরিবারে এ রকমের দৃষ্টান্ত বেশি লক্ষ্য করা যায়।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতারা কতোটা সচেতন হয়েছেন, তারও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা-বছরের শেষে লেখাপড়ায় ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি নিয়ে আগে যখন শিক্ষকরা অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তখন পিতামাতারা এসব সভায় বেশি আসতেন না। ১৯৯০-এর দশকের গোড়াতেও যেখানে শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ পিতামাতা এ রকমের আলোচনায় উপস্থিত হতেন, সেখানে এখন হাজিরার হার শতকরা সত্তর ভাগ ছাড়িয়ে গেছে। সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কে অভিভাবকরা এতোটা সচেতনতা লাভ করার জন্যেই এখন তাঁরা আর ষোলো বছর হলেই ছেলেদের কাজ নিতে বাধ্য করেন না অথবা তড়িঘড়ি করে মেয়েদের বিয়েও দেন না। অন্য আরও একটা ইতিবাচক পরিবর্তন তাঁদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯০-এর দশকেও তাঁরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছুটি কাটাতে গিয়ে মাসের পর মাস বাংলাদেশে থাকতেন। কেউ কেউ এক বছর / দু বছরও থেকে আসতেন। এর ফলে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় খুব পিছিয়ে পড়তো। কারো কারো লেখাপড়া চিরদিনের জন্যে বন্ধও হয়ে যেতো। এখন সে রকমের দীর্ঘ সময়ের জন্যে পিতামাতারা বাংলাদেশে থাকেন না। এ-ও লেখাপড়ায় ভালো করতে ছাত্রছাত্রীদের খুব সহায়তা করছে।

তবে পিতামাতারা শিক্ষিত কিনা — সন্তানদের শিক্ষায় তা এখনো কমবেশি প্রভাব বিস্তার করে। ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ঠিকমতো লেখাপড়া করছে কিনা, শিক্ষিত

পিতামাতা সেদিকে যতোটা লক্ষ্য রাখেন, অন্যরা ততোটা রাখেন না অথবা রাখতে পারেন না। তা ছাড়া, পিতামাতা লেখাপড়া জানলে ছেলেমেয়েদের হোমওয়ার্কে উৎসাহ দিতে পারেন — এমন কি, তাতে তাদের সাহায্য করতে পারেন। এখন যে-ছেলেমেয়েরা স্কুলের নিচু শ্রেণীতে যেতে আরম্ভ করছে, তাদের অনেকের পিতামাতার জন্ম ব্রিটেনে অথবা তাঁরা ব্রিটেনে শিক্ষিত। এই দ্বিতীয় প্রজন্মের পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকেন এবং কেউ কেউ লেখাপড়াতে সাহায্যও করেন। তদুপরি, এসব পিতামাতার পরিবারের আয়তনও ছোটো, ফলে বাড়িতে লেখাপড়া শেখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব। অপর পক্ষে, আগে বাড়িতে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে থাকতো বলে লেখাপড়া শেখার জন্যে যে-জায়গা এবং অনুকূল পরিবেশের দরকার, ছোটো বাড়িতে তাও থাকতো না। হৈচৈ, চেঁচামেচির মধ্যে হোমওয়ার্ক অথবা লেখাপড়া করাও অনেকগুলো সন্তানের পক্ষে অতো সহজ ছিলো না।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকে সিলেট থেকে যাঁরা শ্রমিক হিশেবে এ দেশে এসেছিলেন, আগেই লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা বেশির ভাগ সামান্যই লেখাপড়া জানতেন। অনেকে আদৌ লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি, নিজেদের নামও সই করতে পারতেন না। পাসপোর্টে সে জন্যে টিপ সই করতেন। *Across Seven Seas and Thirteen Rivers* গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, নতুন অভিবাসীরা অনেক সময়ে কাজের জায়গা চেনার জন্যে কিছু দূর পর পর রাস্তায় ইঁট রেখে দিতেন। এই ইঁট দেখে দেখে তাঁরা কর্মস্থানে যেতেন। কেউ ইঁট সরিয়ে ফেললে তাঁরা বিপদে পড়তেন। ইংরেজি আট নম্বর বাস চেনার জন্যে সেই বাসকে তাঁরা বলতেন 'দুই আণ্ডার বাস' অর্থাৎ উপরে-নিচে দুটি ডিম রাখলে যে-রকম দেখায়, সেই নম্বরের বাস। এই অভিবাসীরা লেখাপড়া কতো কম জানতেন, তার আর-একটা দৃষ্টান্ত হলো: এঁরা নিজেরা চিঠি লিখতে অথবা দেশ থেকে চিঠি এলে তা পড়তে পারতেন না। আইয়ুব আলি মাস্টারের মতো লেখাপড়া জানা অভিবাসীদের সাহায্য নিয়ে তাঁরা এই সমস্যার সমাধান করতেন। তা ছাড়া, ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত বাঙালি পাড়ায় গিয়ে চিঠি লেখার অথবা পড়ে শোনানোর কাজও করতেন অনেকে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্যে যাঁরা বাংলাদেশ (তার আগে পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আসতেন, তাঁরা এই চিঠি লেখা এবং পড়ার কাজ করতেন। এটা বেশ লাভজনক কাজ ছিলো। ১৯৭০-এর দশকেও এর জন্যে তাঁরা এক পাউন্ড করে দাবি করতেন। কিন্তু এখন পরিবারে সন্তানরা লেখাপড়া শেখার ফলে চিঠিপত্র পড়া অথবা লেখার জন্যে বাইরের লোকের সাহায্য নিতে হয় না। তা ছাড়া, পিতামাতারা হাসপাতাল, সোশ্যাল সিকিওরিটি অথবা স্থানীয় কাউন্সিলের অফিসে গেলেও এখন আর দোভাষী লাগে না। সে কাজ সন্তানরাই করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। সে হলো: অভিবাসীদের মধ্যে মাতৃভাষা এবং ধর্মীয় ভাষার চর্চা। বাংলাদেশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ

রক্ষা করা সহজ হবে — এই মনোভাব থেকে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের বাংলা শিখতে উৎসাহ দেন। এ ছাড়া, সন্তানরা যাতে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারে, তার জন্যে স্কুলের পরে সন্তানদের তাঁরা আরবি শেখার ক্লাসে পাঠান — অনেক সময়ে সন্তানদের অনিচ্ছায়ও তাদের সেখানে যেতে বাধ্য করেন। এসব ক্লাসে কেবল আরবি এবং ইসলাম ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া হয় না, বরং এখানে ইসলামী জাতীয়তাবাদের শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিশেষ করে ব্রিটেনের মুসলমানরা যে কট্টর মুসলিম স্বরূপ সম্পর্কে এতোটা সচেতন, তার কারণ সম্ভবত স্কুলের পর মোল্লাহদের রক্ষণশীল এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দান। আরবির সঙ্গে বেশির ভাগ সন্তান বাংলাও শেখে। কিন্তু তারা যতোটা মুসলিম জাতীয়তাবাদী স্বরূপ সম্পর্কে বাল্যকাল থেকেই সচেতন হয়ে ওঠে, বাঙালি স্বরূপ অথবা ব্রিটিশ পরিচয় সম্পর্কে ততোটা সচেতন হয় না।

বস্তুত, তাদের বাংলা শিক্ষা এতোটাই অপূর্ণ যে, তারা অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা এবং বাঙালিদের ইতিহাস সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে। তারা শেখে বিশেষ করে চিঠিপত্র লেখা। এদের অনেকেরই ধারণা, বাংলা ভাষা কেবল বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাষা। কেউ বাংলায় কথা বলছে শুনলে তারা ধরে নেয় যে, সে বাংলাদেশী মুসলমান। এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয় না। তাদের দুটি পরিচয়ই মুখ্য: হয় বাংলাদেশী, নয়তো সিলেটী। যে-দেশে তাদের জন্ম এবং বসবাস সেই ব্রিটেন সম্পর্কেও তাদের তেমন ভালোবাসা আছে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। তবে এই ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাঙালি ছেলেমেয়েরা এখন শিক্ষার দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে।

বাঙালি পাড়ার অনেক স্কুলেই বাংলা শেখার ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া, ব্রিটেনে যে-উনিশটা আধুনিক বিদেশী ভাষা জিসিএসই (স্কুল ফাইনাল) পরীক্ষার বিষয় হিশেবে নেওয়া যায়, বাংলা সেগুলোর একটি। বাংলায় এ লেভেল পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজে বাংলায় আংশিক ডিগ্রি করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

মোট কথা, প্রথম দিকের অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত অভিবাসীরা কাজ করে আয় করতে যতোটা আগ্রহী ছিলেন, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানোয় ততোটা যত্ন নিতেন না। যত্ন না-নেওয়ার একটা বড়ো কারণ ছিলো এই যে, আগে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে বেনিফিট পাওয়া যেতো পর্যাপ্ত পরিমাণে। কেউ বেকার থাকলেও বেনিফিটের টাকাপয়সা দিয়েই বেঁচে থাকতে পারতেন। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা তাই দুশ্চিন্তা করতেন না। কিন্তু এখন এ ধরনের সরকারী আর্থিক সহায়তার পরিমাণ খুব কমে গেছে। বেকার ভাতার শর্তাবলীও আগের তুলনায় অনেক কঠোর হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, চাকরি-সন্ধানীদের যে-ভাতা দেওয়া হয়, তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বেঁচে থাকা যায় না। সে জন্যে, পিতামাতারা সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে এখন বেশি উদ্যোগ নিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অথবা বাংলাদেশের শিক্ষিত 'ঢাকাই' পরিবারের তরুণ-তরুণীদের চিত্রটা একেবারে ভিন্ন রকমের। মাতারা না-হলেও, তাদের পিতারা যেহেতু এ দেশে এসেছিলেন উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে অথবা পেশাদার হিশেবে, সে জন্যে এসব পরিবারে শিক্ষার জোরালো ঐতিহ্য রয়েছে। এসব পরিবারের পিতামাতারা প্রীতিকর অথবা অপ্রীতিকর যে-কোনো উপায়ে অর্থাৎ সন্তানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেমনই হোক না কেন, তাদের উচ্চশিক্ষা নিতে বাধ্য করেন। বেশির ভাগ পরিবার মানবিক বিদ্যা অথবা সাধারণ বিজ্ঞান না-পড়িয়ে সন্তানদের পেশাদার হওয়ার শিক্ষা নিতে উৎসাহিত করেন, যাতে তারা ডাক্তার, ডেনটিস্ট, এনজিনিয়ার, অ্যাকাউন্টেন্ট, আইনজীবী ইত্যাদি পেশাদার হতে পারে, অথবা নিদেন পক্ষে শিক্ষকতা করতে পারে। এই শিক্ষিত পরিবারগুলোর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত কোনো পরিসংখ্যান আলাদা করে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাদের দেখে যে-ধারণা হয়, তাতে মনে হয়, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় — উভয় পর্যায়ের শিক্ষার দিক দিয়ে তারা অন্য যে-কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনীয়; এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের চেয়েও উন্নত।

উচ্চশিক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়েদের পেশাদার করার আগ্রহ শিক্ষিত পিতামাতাদের মধ্যে কতো প্রবল তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে স্কটল্যান্ডের একটি ছোটো শহর — ডান্ডি থেকে। এই শহরে বাঙালি পরিবারের সংখ্যা প্রায় পঁচাত্তর। এই পরিবারগুলো প্রায় সবই পশ্চিম বাংলার এবং 'ঢাকাই' অর্থাৎ সিলেট ছাড়া অন্যান্য জেলার। প্রথমে 'ঢাকাই' পরিবারগুলোর দিকে তাকানো যাক। এসব পরিবারের কর্তাদের বয়স ষাট ছাড়িয়ে যায়নি। কেউই ১৯৬৮ সালের আগে এ দেশে আসেননি। তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তানদের বয়স বড়ো জোর তিরিশের কোঠায়। এই সন্তানদের শিক্ষা এবং পেশার দিকে নজর দিলে তাদের পিতামাতার লক্ষ্য সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব।

সন্তানদের শিক্ষা এবং পেশা
ঢাকাই বাঙালি

পরিবারের কর্তা	সন্তানসংখ্যা		সন্তানদের শিক্ষা ও পেশা	
	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা
... আলি	২	১	ডাক্তার, ডাক্তার	অর্থনীতির ছাত্রী
মোতালেব	১	২	ডাক্তার	ডাক্তার, আর্কিটেকচারের ছাত্রী
ফরিদ	২	১	ডাক্তার, ডাক্তার	ডাক্তার
রহমান	১	১	ডাক্তার	ডাক্তার
ইসলাম	০	২		ডাক্তার, ডেন্টিস্ট
মালেক	১	২	আইনের ছাত্র	ডাক্তার, ডাক্তার
শাহাবুদ্দীন	১		ডাক্তার	
মোল্লাহ	৩	০	ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার	লেখাপড়া শেষ করেনি
করিম	০	২		ডাক্তার, স্কুলের ছাত্রী
মধু	২	০	পিএইচডি, অ্যাকাউন্টেন্ট	
সুলেমান	১	১	ডাক্তারির ছাত্র	অর্থনীতিবিদ
আবেদীন	১	২	ব্যাংকার	গ্রাফিক ডিজাইনার, ডাক্তারির ছাত্রী

আনিস	০	৪		ডাক্তারি, অপ্টোমেট্রিস্ট, ডাক্তারি, নার্সিং-এর ছাত্রী
ফরিদ	১	১	স্কুলের ছাত্র	আইনের ছাত্র
ভূঁইয়া	২	০	অর্থনীতিতে ডিগ্রি, মনস্তত্ত্বে ডিগ্রি	
রহিম	১	১	চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট	বায়োকেমিস্ট
জামান	১	১	স্কুলের ছাত্র	আর্কিটেক্ট
কালাম	১	১	অর্থনীতিতে ডিগ্রি	অপ্টিশিয়ান
চৌধুরী	১	১	আইনের ছাত্রী	বায়োকেমিস্ট
আবুল	০	১	ফার্মাসিস্ট	

সিলেটী বাঙালি

মোট তিনটি পরিবারের দুটির সন্তানরা কেউ উচ্চশিক্ষার দিকে যাননি — ব্যবসা করেন। একটি পরিবারের তিন কন্যা যথাক্রমে হেলথ ভিজিটর, স্কুলের শিক্ষিকা এবং অ্যাকাউন্টেন্ট। পুত্র স্কুলের শিক্ষা নিয়েছে।

ভারতীয় বাঙালি

ড প্রধান	১	১	এঞ্জিনিয়ার	সোশ্যাল ওয়ার্কার
ড রায়চৌধুরী	৩	০	ডাক্তার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার	
হাজরা	১	১	?	ডিজাইনার
সরকার	২		?, ?	
ড চ্যাটার্জি	০	২		ছাত্রী
ড বোস	১	১	ডাক্তার	পিএইচডি
ড চৌধুরী	১	১	শিশু	শিশু
ড সুভাষ ?	০	১		প্রাইমারির ছাত্রী
ড মুখার্জি		২		ছাত্রী, ছাত্রী

এ ছাড়া, ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসা কিছু কম-বয়সী বাংলাদেশী দম্পতিও ডান্ডিতে বাস করেন। এঁদের মধ্যে ১৫টি পরিবার খৃস্টান এবং ১০টি মুসলমান।

এই পরিবারগুলোর সঙ্গে লন্ডনের নগরীকেন্দ্রের বাঙালিদের (যাঁরা প্রায় সবাই সিলেটী) তাদের তুলনা করলে পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রথমেই চোখে পড়ে পরিবারের আয়তন। ডান্ডির একটি পরিবারের সন্তানসংখ্যা ৪, চারটি পরিবারের ৩ আর বাকি পরিবারগুলোর ২ অথবা ১। যে-পরিবারের সন্তানসংখ্যা ৪, সে পরিবারের সন্তানরা সবাই কন্যা। সুতরাং পরিবার বড়ো হওয়ার কারণ বোঝা যায়। দ্বিতীয় যে-পার্থক্য চোখে পড়ে, তা হলো এসব পরিবার তাদের সন্তানদের কেবল সাধারণ শিক্ষা দিতে চায় না, বরং পেশাদার করতে চায়। সন্তানরা কেউই মানবিক বিদ্যার দিকে যায়নি। যারা বিজ্ঞান পড়েনি, তারা অন্তত অর্থনীতি, আর্কিটেকচার, অ্যাকাউন্টিং এবং আইন অধ্যয়ন করেছে অথবা করছে। এসব পরিবারের কর্তারা শিক্ষিত হলেও, এ দেশে থাকার জন্যে কেউ কেউ সাধারণ কাজ করেন, যেমন রেস্টুরেন্ট চালান। কিন্তু নিজেদের আশা পূর্ণ না-হলেও, তাঁরা সন্তানদের সফল করে তুলেছেন অথবা

তুলছেন। এই শহরে পশ্চিম বাংলার পরিবার আছে দশ-বারোটি। এই পরিবারগুলোর কর্তারা বেশির ভাগই ডাক্তার। তাঁদের সন্তানরাও কেউ কেউ ডাক্তারি পড়ছে।

বস্তুত, সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দেওয়া এবং পেশাদার হিশেবে দেখা পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত পিতামাতাদের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য, সম্ভবত সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষিত বাঙালিরা উনিশ শতক থেকে পরিশ্রমের কাজ এবং লেখাপড়ার কাজ দিয়ে সাধারণ লোক এবং ভদ্রলোকের পার্থক্য নির্ণয় করতে আরম্ভ করেন। বিলেতে এসেও তাঁরা এই সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতনতা বজায় রেখেছেন। এখানেও শিক্ষিত পরিবারগুলো নতুন শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত পরিবারগুলোকে নিচু দৃষ্টিতে দেখে। এ জন্যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত পরিবারগুলো যখন কাউকে সিলেটী বলে, তখন তার মধ্যে কেবল একটা আঞ্চলিক পরিচয়ই নিহিত থাকে না, বরং একটা তুচ্ছতার মনোভাবও থাকে। আমার ধারণা, স্বল্পশিক্ষিত সিলেটী পরিবারের লোকেরা যখন বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার লোকেদের "ঢাকাই" বলে চিহ্নিত করেন, তখন তার মধ্যেও এক ধরনের ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের মনোভাব থাকে।

বাঙালিদের জীবিকা উপার্জন

আগেই লক্ষ্য করেছি, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে-লস্কররা জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে অথবা জাহাজ থেকে পালিয়ে বিলেতে থেকে যেতেন, তাঁরা অনেকে পেডলার অর্থাৎ ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। এই কাজকে লিভারপুলের পুলিশ দপ্তর থেকে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান "অশুভ উৎপাত" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছিলো। কিন্তু এটাই তাঁদের একমাত্র কাজ ছিলো না। জীবিকার জন্যে তাঁরা অন্যান্য পথও খুঁজে নেন। এমন কি, তাঁরা রাস্তাও ঝাঁট দিতেন। *Across Seven Seas and Thirteen Rivers; Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers; Tales of Three Generations of Bengalis in Britain* ইত্যাদি গ্রন্থে গোড়ার দিকের অভিবাসীদের যেসব জীবন-কাহিনী লেখা হয়েছে, তা থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায় জীবিকা উপার্জনের জন্যে তাঁদের কী কঠোর সংগ্রাম করতে হতো।

অনেকেই অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করতেন রেস্টুরেন্টে। লস্করদের জন্যে সে পর্যায়ে ওয়েটার অথবা বাবুর্চির কাজ পাওয়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, ওয়েটার হতে হলে

ইংরেজিতে লেখা মেনিউ অর্থাৎ খাদ্য-তালিকা পড়ার যোগ্যতা লাগতো। খানিকটা চটপটেও হতে হতো। আর বাবুর্চি হতে হলে জানতে হতো বিলেতি রান্নার কৌশল। বেশির ভাগই তাই করতেন বাসন-পত্র ধোয়া, জিনিশপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া, ঘর পরিষ্কার করা আর আলুর খোসা ছাড়ানোর কাজ। তখন ভারতীয় রেস্টুরেন্ট ছিলো না। সুতরাং তাঁদের কাজ করতে হতো গ্রীক, ইটালিয়ান, মিশরীয়, আরব অথবা ইংরেজদের রেস্টুরেন্টে। রোজিনা বিশ্রাম ১৯৪৪ সালের একটি জরিপের কথা উল্লেখ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, তখন পুব লন্ডনের একমাত্র স্টেপনি এলাকায় অশ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত ৩২টি কাফে ছিলো।



রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁতের ব্যথার দেশীয় ওষুধ বিক্রি করছেন একজন ভারতীয়। ১৮৫০-এর দিকে আঁকা ছবি।

সে সময়ে হোটেলগুলোতে ঘর গরম রাখার জন্যে গরম পানির বয়লার রাখা হতো। এই বয়লারে কয়লা দেওয়ার কাজ ছিলো অনেকটা জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার মতো। সাবেক লস্কররা অনেকে তাই এ কাজও করতেন। কারণ, এ কাজে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা — উভয়ই ছিলো।

কিছু কাল অন্যদের রেস্টুরেন্টে কাজ করে অভিজ্ঞতা এবং টাকাপয়সা সংগ্রহ করে এই অভিবাসীরা কেউ কেউ কিভাবে নিজেরাই রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন, সেই আগ্রহব্যঞ্জক খবর জানা যায় অভিবাসীদের কাহিনী থেকে। ক্যারোলাইন অ্যাডামস এবং ইউসুফ চৌধুরী — উভয়ের গ্রন্থ থেকেই দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আবদুল মান্নান ওরফে চানু মিয়া এবং নওয়াব আলির জীবনসংগ্রামের কাহিনীকে আমরা বলতে পারি টিপিক্যাল, অর্থাৎ কমবেশি এ রকম ঘটেছিলো অনেকেরই জীবনে।

পঁচিশ বছর বয়সে আবদুল মান্নান বাণিজ্যিক জাহাজে কাজ নিয়েছিলেন, ১৯৩২ সালে। জাহাজ থেকে পালিয়ে এসে তিনি লন্ডনে বাস করতে আরম্ভ করেন। নানা রকমের কাজ করে টিকে থাকেন তিনি। মন্দার সময়ে তখন তাঁর মতো স্বল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষে কোনো সন্তোষজনক চাকরি পাওয়া সম্ভব ছিলো না। কিন্তু দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি সাবেক লস্কর হিশেবে সহজেই চাকরি পান নৌবাহিনীতে। তিন বছর তাতে চাকরি করে ১৯৪২ সালে তিনি ব্যর্মিংহ্যামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। এ সময়ে এক কারখানায় কর্মকারের কাজ গ্রহণ করেন তিনি। চার শো পাউন্ড সঞ্চয় করে অতঃপর তিনি ১৯৪৪ সালে লন্ডনের ৩৬ নম্বর প্যার্সি স্ট্রীটের বেইসমেন্ট কাফের দখলীস্বত্ব কিনে নেন এবং সেখানে নিজের কাফে গড়ে তোলেন। এই বেইসমেন্ট কাফে ছিলো সিলেটী লস্করদের একটি জনপ্রিয় আড্ডার জায়গা। কাজের পর রাতের বেলায় এখানে এসে তাঁরা সুখদুঃখের গল্প করতেন, জুটলে রাইস-কারি খেতেন আর খবর দিতেন কোথায় কোন কাজ খালি আছে। দু বছর পরে এই কাফে ছেড়ে দিয়ে আবদুল মান্নান ব্রম্পটন রোডে "গ্রীন মাস্ক" নামে একটি সফল রেস্টুরেন্ট খোলেন। যে-লস্বররা অন্যান্য রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন, তাঁরা এখানে এসে মিলিত হতেন এবং গল্পগুজব করতেন।



বাঙালি লস্কর, ১৯০৮

নওয়াব আলি কোনো দিন স্কুলে যাননি। সিলেট থেকে প্রথম যৌবনে কলকাতায় এসে তিনি জাহাজের কাজ শিখেছিলেন। তিনি ছিলেন একটু রগচটা মানুষ। তাঁকে ঠকানোর কারণে তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মারধর করা সহ নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৭ সালে লস্করদের জন্যে কলকাতার ডক এলাকায় তিনি একটি রেস্টুরেন্ট করার চেষ্টাও করেছিলেন। তারপর সিলেটী সারেংদের সহায়তায় বিলেতগামী জাহাজে কাজ পান। প্রথমবার তিনি বিলেতে আসেন ১৯৩৯ সালে। তাঁর কাজ ছিলো জাহাজের বয়লারে কয়লা দেওয়ার। নিজেই বলেছেন, সেটা ছিলো দারুণ কষ্টের কাজ।

তাঁর জাহাজ কার্ডিফ বন্দর ছেড়ে যাওয়ার আগের রাতে তিনি পালিয়ে ডাঙায় নামেন। গোড়ার দিকে কার্ডিফে লুকিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাঁর জায়গা হয় লন্ডনের বাঙালি পাড়ায়। তখন তাঁর সঙ্গে ছিলো মাত্র চার পাউন্ড। প্রথম তিনি ধোয়া-মোছা এবং আলুর খোসা ছড়ানোর কাজ করেন একটি ইজিপশিয়ান কাফেতে। অল্প দিন এখানে কাজ করার পর তিনি স্যাভয় নামে একটি নাম-করা হোটেলে একই ধরনের কাজ পান। সেখানে কাজ করেন দু সপ্তাহ। তারপর চাকরি নেন বীরস্বামী রেস্টুরেন্টে।

এটি ছিলো তখনকার সবচেয়ে বড়ো ভারতীয় রেস্টুরেন্ট। কিছুদিন এখানে কাজ করার পর বিশ/তিরিশজন অভিবাসীর সঙ্গে মধ্য-ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি শহরে গিয়ে তিনি এক কারখানায় কাজ করেন। তা ছাড়া, অবসর সময়ে তিনি কালোবাজারি করে বাড়তি আয় করতেন। এই টাকা দিয়ে ১৯৪৩ সালে তিনি একটি কাফে কিনে সেখানে এক শরিককে নিয়ে রেস্টুরেন্ট খোলেন। কিন্তু শরিকের বিশ্বাস ঘাতকতায় এই ব্যবসায় তিনি টিকে থাকতে পারেননি। এর পর লন্ডনে এসেও তিনি রেস্টুরেন্টের কাজ করেন। এমন কি, একটি জুয়ো খেলার ক্লাবও করেন অল্ডগেইট এলাকায়।


জাহাজের ডেকে বসে লস্কররা খাচ্ছেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আবদুল মান্নানের মতো তিনিও যোগ দেন নৌবাহিনীতে। জার্মেনি হেরে যাওয়ার পর ১৯৪৫ সালের মে মাসে তিনি নৌবাহিনী থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি ফেরিওয়ালার কাজ নিয়ে ইংল্যান্ডের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু তাতে তেমন জুত করতে না-পারায় কার্ডিফে গিয়ে এক পাঞ্জাবীর কাছ থেকে একটি রেস্টুরেন্ট কিনে নিয়ে সেটাকে "ক্যালকাটা রেস্টুরেন্ট" নাম দিয়ে তিনি সেখানে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এর পর লন্ডনে তিনি হালাল মাংসের একটি দোকান খোলেন। ব্রিটেনে তিনিই প্রথম ধর্মীয় অনুষঙ্গ জুড়ে দিয়ে হালাল মাংসের ব্যবসা শুরু করেন। ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকায় এই ব্যবসায় তিনি খুব সাফল্য লাভ করেন। নিজেই বলেছেন, তিনি কিভাবে শতশত গোরু আর মোরগ জবাই করতেন। যেভাবে জবাই করতেন বলে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সে মাংস ঠিক হালাল হতো কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। তাঁর সাফল্য দেখে তাসলিম আলিও ১৯৪০-এর দশকে হালাল মাংসের দোকান করেন।

মাংসের ব্যবসা ছাড়াও, ১৯৪৮ সালের দিকে বন্দর-নগরী প্লিমথে গিয়ে নওয়াব আলি সেখানে "বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট" নামে একটি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। কিন্তু এটিই তাঁর

শেষ রেস্টুরেন্ট নয়। এর পরও তিনি একাধিক রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। মোট কথা, একটার পর একটা বিচিত্র ধরনের কাজ করেন তিনি। উদ্যোগী এবং পরিশ্রমী লোক হিশেবে তিনি কেবল টিকে থাকেননি, বরং শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অন্য যে-অভিবাসীরা বিলেতে এসেছিলেন, তাঁরাও কেউ তুলনামূলকভাবে সহজে, কেউ বা তাঁর চেয়ে আরও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ দেশের মাটিতে শেকড় গাড়তে সমর্থ হয়েছিলেন।

আবদুল মজিদ কোরেশী ওরফে ময়না মিয়া ১৯৩৬ সালে লন্ডনে এসে প্রথমে চকলেট ফেরি করার কাজ করেন। সে জীবন ছিলো রীতিমতো সংগ্রামের। কিন্তু কিছু সঞ্চয় করে তিনি তারপর ১৯৩৮ সালে রেস্টুরেন্টের ব্যবসা শুরু করেন। আশকের আখনজি ১৯৩৩ সালে লন্ডনে এসে কী কাজ করেন, তা ঠিক জানা যায় না। তিনি লেখাপড়া জানতেন না। মনে হয় বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি। সে জন্যে কয়েক বছর পরে তিনি আবার জাহাজে ফিরে যান। তাঁর নথি থেকে দেখা যায় যে, ১৯৪০ সাল থেকে শুরু করে তিনি দশ বছরেরও বেশি সময় জাহাজের লস্কর হিশেবে কাজ করেন।



বৃদ্ধ বয়সে নওয়াব আলি, তাঁর বাঙালি স্ত্রী-সহ

আমরা যাকে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বলছি, লস্কররাই অবশ্য তা প্রথমে আরম্ভ করেননি। তা খোলা হয়েছিলো বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। ১৯০৫ সালের আগেই মধ্য লন্ডনের শ্যাফ্‌ট্‌বেরি অ্যাভে-নিউতে একটি, এবং হোবর্নে আর-একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন রোজিনা বিশ্রাম। তবে এগুলোর মালিক কারা ছিলেন তা জানা যায় না। কিন্তু ১৯১১ সালে গ্রেজ ইন রোডে যে-ভারতীয় রেস্টুরেন্ট খোলা হয়েছিলো, তার মালিক ছিলেন একজন বাঙালি — কে এন দাশগুপ্ত। এসব রেস্টুরেন্টের অবস্থা ভালো

ছিলো না। কারণ, ভারতীয় রেস্টুরেন্টে খাওয়ার মতো বেশি লোক তখন ছিলেন না। এগুলো তাই দীর্ঘদিন টিকে ছিলো বলেও মনে হয় না অথবা এগুলো ভারতীয় খাদ্যকেও এ দেশের লোকেদের কাছে জনপ্রিয় করতে পারেনি।

প্রথম দিকের যে-দুটি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে টিকে ছিলো, সে দুটি খোলা হয়েছিলো ১৯২০-এর দশকে। এদের নাম শাফি আর বীরস্বামী। ১৯২০ সালে যাত্রা শুরু হয় শাফি রেস্টুরেন্টের। এর মালিক ছিলেন দুজন উত্তর ভারতীয় লোক — মোহাম্মদ ওয়াসিম আর মোহাম্মদ রহিম। অচিরেই শাফি ভারতীয় ছাত্রদের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, বীরস্বামী রেস্টুরেন্ট নামে ভারতীয় হলেও, এটি খুলেছিলেন এডওয়ার্ড পামার নামে একজন ইংরেজ। পুরোপুরি ইংরেজ না-বলে বরং বলা উচিত, আধা-ইংরেজ, কারণ তাঁর মা ছিলেন ভারতীয়। পামার এই রেস্টুরেন্টে ভারতীয় পরিবেশ তৈরি করেছিলেন এবং রান্নার জন্যে লোক এনেছিলেন ভারত থেকে। ১৯৩৫ সালে এই রেস্টুরেন্ট কিনে নেন স্যার উইলিয়াম স্ট্যুয়ার্ট নামে একজন পার্লামেন্ট সদস্য। তারপর আরও চল্লিশ বছর এই রেস্টুরেন্ট টিকে ছিলো। এটি পরিচিত হয়েছিলো সেকালের সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে সফল ভারতীয় রেস্টুরেন্ট হিশেবে। যাঁরা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রেস্টুরেন্ট করেছিলেন, তাঁরা অনেকেই কাজ শিখেছিলেন এখানে।

বাঙালি লস্করদের মধ্যে সবার আগে কে রেস্টুরেন্ট স্থাপন করেন, সে ইতিহাস ঠিক পরিষ্কার নয়। একটি সূত্রে বলা হয়েছে যে, ভিক্টোরিয়া ডক রোডে আবদুর রহিম আর কনি [গনি?] খান মিলে একটি কফি হাউস খুলেছিলেন ১৯২০ সালে। এখানে কেবল কফি নয়, ভাত আর ঝোলও পাওয়া যেতো। আইয়ুব আলি মাস্টারও মোটামুটি একই সময়ে অ্যামেরিকা থেকে লন্ডনে এসে কমার্শিয়াল স্ট্রীটে শাহ জালাল নামে তাঁর কফি হাউস খুলেছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে কলকাতার অশোক মুখার্জি এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষ যথাক্রমে প্যর্সি স্ট্রীটে 'দরবার' এবং উইন্ডমিল স্ট্রীটে 'দিলখুশ' নামে দুটি রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। তাঁরা অবশ্য লস্কর ছিলেন না। তবে লস্করদেরই একজন — ময়না মিয়া ওরফে আবদুল মজিদ কোরেশী ১৯৩৮ সালে দিলখুশ রেস্টুরেন্টের মালিকানা কিনে নেন নগেন্দ্রনাথের কাছ থেকে। তার অর্থ এক বাঙালির কাছ থেকে আর-এক বাঙালি এ রেস্টুরেন্ট কিনে নিয়েছিলেন। কোরেশীর পরিচালনায় রেস্টুরেন্টটি খুব ভালোভাবে চলছিলো, কিন্তু বেশি দিন টিকে থাকেনি। কারণ ১৯৪০ সালে বোমার আঘাতে এটি ধ্বংস হয়েছিলো। কোরেশী দাবি করেছেন যে, তাঁর আগে অন্য কোনো সিলেটী রেস্টুরেন্ট ছিলো না।

আবদুল মজিদ কোরেশীর দাবি সঠিক হলেও, বাংলাদেশীদের পরিচালিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিলো মোশাররফ আলি আর তাঁর বন্ধু ইসরাইল মিয়ার। ক্যারলাইন অ্যাডামস তাঁর গ্রন্থে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার পথিকৃৎ হিশেবে এই দুজনের নাম উল্লেখ করেছেন। এই দুই বন্ধুই এসেছিলেন মৌলভীবাজার থেকে। জাহাজের কাজ থেকে যা সঞ্চয় করেছিলেন এবং পরিচিতদের কাছ থেকে

ধার নিয়ে তাঁরা দুজনে মিলে ১৯৪২-৪৩ সালে ব্রম্পটন রোডে অ্যাংলো-এশিয়া নামে একটি রেস্টুরেন্ট খোলেন। নাম থেকে বোঝা যায়, এখানে ভারতীয় এবং বিলেতি— দু ধরনের খাবারই পাওয়া যেতো। মোশাররফ আলি ছিলেন একটু বেহিশেবী এবং খরুচে প্রকৃতির লোক। বিলাসী জীবন যাপন করতে পছন্দ করতেন তিনি। সে আমলেই দামী গাড়ি-বাড়ি কিনেছিলেন। টাকার টানাটানি হওয়ায় তিনি তাঁর নিজের শরিক বিক্রি করতে বাধ্য হন। কিন্তু বেশি দিন বসে থাকতে পারেননি। তাই কিছু কাল পরে তিনি পশ্চিম লন্ডনের অ্যার্লস কোর্টে একটি রেস্টুরেন্ট খোলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে সেটিও বিক্রি করতে বাধ্য হন। তাতেও তিনি তাঁর উদ্যম হারিয়ে ফেলেননি। আবার রেস্টুরেন্ট করেন। এভাবে তিনি দশ-বারোটা রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ঐহিত্যবিশিষ্ট "দরবার রেস্টুরেন্ট" কিনে নিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি স্থাপন করেন কারি গার্ডেন ইন্ডিয়ান নামে একটি রেস্টুরেন্ট। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, তিনি কোনো রেস্টুরেন্টই দীর্ঘদিন চালাতে পারেননি। তাঁর রেস্টুরেন্টগুলো একের পর এক কিনে নেন তাঁর অঞ্চলের লোকেরা। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় তাঁর অবদান হলো এই যে, নিজে মালিক না-থাকলেও, এসব রেস্টুরেন্টের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভারতীয় রেস্টুরেন্টের ব্যবসাকেই ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।



যৌবনে আবদুল মজিদ কোরেশী

ইসরাইল মিয়া সাফল্য লাভ করেছিলেন মোশাররফ আলির চেয়ে অনেক বেশি। তিনি কেবল তাঁর "অ্যাংলো-এশিয়া" নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না। বরং অন্য শরিক নিয়ে একের পর এক রেস্টুরেন্ট খুলতে থাকেন। মৌলভীবাজার এলাকার লোক দেখলেই তিনি তাঁদের রেস্টুরেন্ট খুলতে উৎসাহ দিতেন। তার চেয়েও যা মূল্যবান, তিনি তাঁদের বিনা সুদে টাকাপয়সা ধার দিতেন ব্যবসা করার জন্যে। এভাবে তিনি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ব্যবসাকে জনপ্রিয় করেন। আর তাঁর সাহায্য নিয়ে মৌলভীবাজার

এলাকার লোকেদের মধ্যেই এই ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লস্কররা নিজের নিজের এলাকার লোকেদের বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতেন।

নিচে একেবারে প্রথম দিকের রেস্টুরেন্টের একটি তালিকা দিচ্ছি। এ তালিকা অসম্পূর্ণ এবং সময় অনুসারে সাজানো নয়। তা সত্ত্বেও এ তালিকা থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবো, সেগুলো কখন তাদের যাত্রা শুরু করেছিলো এবং কারা তাদের হাল ধরেছিলেন।

গোড়ার দিকের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের তালিকা

রেস্টুরেন্টের নাম	মালিক
১৯৪০-এর আগে	
শাফি, জেরার্ড স্ট্রীট	ইয়াসিম, রহিম
বীরস্বামী	পামার
শাহ জালাল	আইয়ুব আলি
তাজমহল	.....
কোহিনুর	.....
রাজা	.....
বেঙ্গল, প্যার্সি স্ট্রীট	.....
ইন্ডিয়া-বার্মা, লেস্টার স্কোয়ার	দেবীপ্রসাদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম)
খায়াম, হল্যান্ড স্ট্রীট	তিনজন ছাত্র
অরিয়েন্টাল	......
দিলখুশ, উইন্ডমিল স্ট্রীট	নগেন্দ্রনাথ ঘোষ › কোরেশী
দরবার, প্যার্সি স্ট্রীট	অশোক মুখার্জী (কলকাতা)
তাজমহল, গ্লাসগো	বিধুভূষণ দেব (নোয়াখালি)
১৯৪০-পরবর্তী	
অ্যাংলো-এশিয়া, ব্রম্পটন রোড	ইসরাইল + মোশাররফ
, শার্লট প্লেস	মোশাররফ
গ্রীন মাস্ক	চানু মিয়া
সেট্‌লস স্ট্রীট কাফে, কভেন্ট্রি	নওয়াব আলি
ক্যালকাটা, কার্ডিফ	নওয়াব আলি
....., ড্রামন্ড স্ট্রীট	বশির আলি
ঈস্ট বেঙ্গল	সুরত মিয়া
লাহোর	সুরত মিয়া
এলাহাবাদ	মোবাশশের মিয়া
বেঙ্গল, প্লিমথ	নওয়াব আলি
নিউ করাচি, রাসেল স্কোয়ার	ইসরাইল
....., গ্রেন্ডাওয়ার প্লেস	ইসরাইল
মতি মহল	ইসরাইল
....., চেলসী	ইসরাইল

তাজমহল, নিউ রোড	হুরমুজ আলি
নিউ আসাম	মফিজ্জ আলি
লাখনৌ	শওকত আলি
বেঙ্গল	নওয়াব আলি
দরবার	মোশাররফ
দার্জিলিং, ব্যার্মিংহ্যাম	আফরোজ মিয়া
শাহ্ বাগ, ব্রিস্টল	নাজমুল ইসলাম

লস্করদের যেসব রেস্টুরেন্ট টিকে গিয়েছিলো, তার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিলো। যেমন, সেগুলো অনেক রাত অবধি এবং সপ্তাহে সাত দিনই খোলা রাখা হতো। মালিকরা কঠোর পরিশ্রম করে এসব রেস্টুরেন্ট চালাতেন। তা ছাড়া, প্রথম দিকের ভারতীয় রেস্টুরেন্টে কেবল রাইস-কারি নয়, বিলেতি এবং ইউরোপীয় খাবারও থাকতো। কারণ, এসব রেস্টুরেন্টে যাঁরা খেতেন, তাঁদের অনেকে তখনো ঝাল এবং মশলাওয়ালা খাবার খেতে অভ্যস্ত হননি। রাইস-কারি খেতেন সাধারণত ভারতীয়রা। খাবারের দামও ছিলো ইংরেজদের রেস্টুরেন্টের তুলনায় শস্তা। যেসব বিলেতি লোকেরা এক সময়ে ভারতে চাকরি করেছেন, তাঁরাও অনেকে মশলাওয়ালা খাবারের স্মৃতি থেকে এসব রেস্টুরেন্টে যেতেন। তারপরে ধীরে ধীরে শ্বেতাঙ্গরাও কেউ কেউ ঝালওয়ালা খাবার চেখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং একবার স্বাদ পাওয়ার পর ভারতীয় খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিখ্যাত নাট্যকার জর্জ ব্যনার্ড শ খেতে পছন্দ করতেন এবং প্রথম দিকে যে-শ্বেতাঙ্গরা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে খেতে আরম্ভ করেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন।

ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কখন থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে এবং তার ফলে এই ধরনের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে, তা বোঝা যায় নিচের পরিসংখ্যান থেকে।

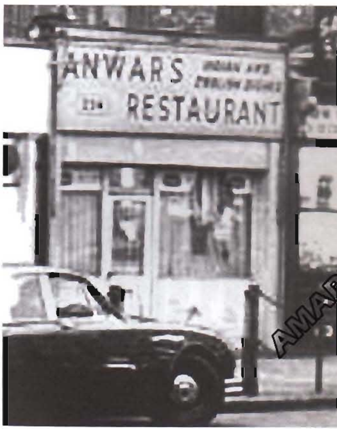
ব্রিটেনে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের সংখ্যা

বছর	১৯৪৬	১৯৬০	১৯৮০	২০০০
রেস্টুরেন্ট	২০	৩০০-	৩০০০+	৯০০০

বলা যেতে পারে যে, ১৯৫০-এর দশক ছিলো ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট টিকে থাকার সংগ্রামকাল। সেই সংগ্রামের সাফল্য অর্জন করার পর ভারতীয় রেস্টুরেন্টের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সে রেস্টুরেন্ট কেবল লন্ডনে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সিলেটী লস্করদের পরিচালিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট ধীরে ধীরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। একুশ শতকের গোড়ায় এখন ব্রিটেনের ছোটোখাটো শহর খুঁজলে সেখানেও একটা/দুটো বাংলাদেশী "ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট" চোখে পড়বে। আশ্চর্যের বিষয় হলো: ব্রিটেনে ভারতীয় খাবার বাংলাদেশের সাবেক লস্কররা প্রবর্তন এবং জনপ্রিয় করলেও, এসব রেস্টুরেন্ট পরিচিত হয় "ইন্ডিয়ান" রেস্টুরেন্ট নামে, যেমন উপমহাদেশ থেকে ১৯৫০-এর দশকে যে-হাজার হাজার অভিবাসী ব্রিটেনে আসেন, তাঁরা ভারত এবং পাকিস্তান

উভয় দেশ থেকে এলেও ব্রিটেনের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা পরিচিত হন "পাকি" হিশেবে। এখনো উপমহাদেশের লোকেদের প্রতি বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের সবচেয়ে প্রিয় গাল হলো "পাকি বাস্টার্ড"। ১৯৬০-এর দশকে যখন বর্ণবাদ প্রবল হয়ে ওঠে তখন উপমহাদেশের লোকেদের ধরে ঠ্যাঙানি দেওয়াকে শ্বেতাঙ্গরা বলতেন "পাকি ব্যাশিং"।

ব্রিটেনের বেশির ভাগ তথাকথিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের মালিক যে আসলে বাংলাদেশীরা – এটা সবারই জানা কথা। উত্তর অথবা দক্ষিণ ভারতের লোকেদের কেউ কেউ রেস্টুরেন্ট ব্যবসার দিকে গেলেও, পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা বলতে গেলে কেউই রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় উদ্যোগ নেননি। বস্তুত, তাঁদের অনেকে রেস্টুরেন্ট ব্যবসাকে অসম্মানজনক বলে গণ্য করেন। কিন্তু এ ব্যবসায় বাংলাদেশীরা এতোটা সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন যে, তাঁরা অনেক সময়ে এখন আর তাঁদের রেস্টুরেন্টের নাম তাজমহল, কহিনুর, এলাহাবাদ, লাহোর, দিল্লি, ক্যালকাটা রাখেন না, বরং সুরমা, পদ্মা, বাংলার মুখ, কলাপাতা, গোল্ডেন বেঙ্গল, বেঙ্গল কুইজিন, শাহজালাল, হাসন রাজা ইত্যাদির মতো নামও দেন – যেসব নাম থেকে প্রথমেই তাদের আঞ্চলিক চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে।



আনোয়ারের রেস্টুরেন্ট, ১৯৬৩

সে যাই হোক, ব্রিটেনে যাঁরা উপমহাদেশীয় বিশেষ করে মোগলাই স্টাইলের খাবার প্রবর্তন করেন, তাঁরা অসাধারণ কৃতিত্ব এবং প্রশংসার দাবিদার। বলা বাহুল্য, মোগলাই স্টাইলের ওপর ভিত্তি করে রান্না করলেও এসব রেস্টুরেন্টের খাবার হুবহু মোগলাই স্বাদের নয়। এঁদের পিলাউ রাইস আর সত্যিকারের পোলাউ, অথবা এদের কেবাব আর মোগলাই কাবাবে খানিকটা পার্থক্য আছে। এ ছাড়া, তাঁরা ইংরেজি খাবারের সঙ্গে কোথাও কোথাও আপোশ করেছেন, যাতে সে খাবার এ দেশীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। এসব খাবারের অনেকগুলোকে বলা যায়, মোগলিশ – অর্থাৎ মোগলাই এবং ইংলিশ রান্নার সমন্বয়। উত্তর ভারতের কোনো কোনো রান্নাকেও তাঁরা নিজেদের মতো পরিবেশন করেন। যেমন, তরকার ডাল, ভিন্ডালু ইত্যাদি।

তদুপরি, এসব রেস্টুরেন্টের বাবুর্চিরা নতুন নতুন খাবারও আবিষ্কার করেছেন। বিশেষ করে তন্দুরী চিকিন মসালা তাঁদের একটি অভিনব এবং জনপ্রিয় আবিষ্কার। বালটি

চিকিন, কড়াই চিকিন ইত্যাদি নামও এই রেস্টুরেন্টের উদ্যোগী মালিকদের আবিষ্কার। এভাবে ভারতীয় খাদ্যকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে তাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। বস্তুত, বিলেতের প্রাত্যহিক জীবনে এসব রেস্টুরেন্ট অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

বাংলাদেশীদের মালিকানায় এখন ব্রিটেনে যে-হাজার নয়েক রেস্টুরেন্ট আছে, তাতে কেবল ওয়েটার এবং বাবুর্চির কাজ থাকে না, কিচেন পোর্টার, ধোয়া-মোছার কাজ, তরকারি কোটার কাজ — ইত্যাদি নানা ধরনের কাজই থাকে। প্রায় আশি হাজার কর্মচারী এসব কাজ করেন বলে কেউ কেউ দাবি করেছেন। তবে এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ, এই কর্মচারীদের অনেকেই

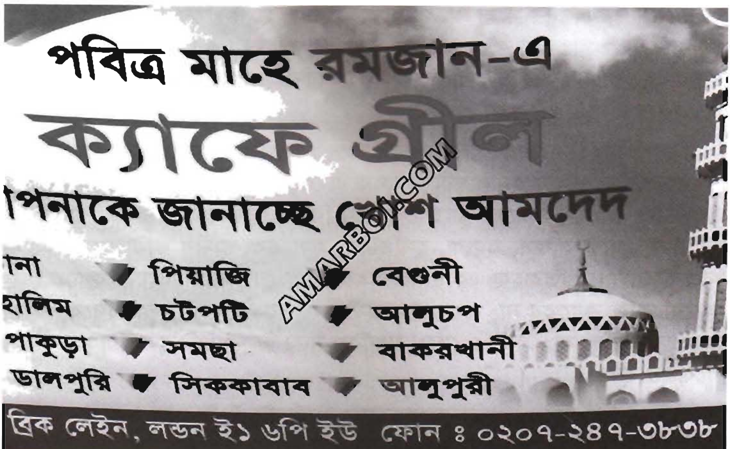


ব্রিক লেইনে পাশাপাশি তিনটি রেস্টুরেন্ট—বাংলার মুখ, আলিশান ও সোনারগাঁও

অস্থায়ীভাবে কাজ করেন। অনেকে আবার কাজ করলেও আয়কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যে অথবা সোশ্যাল সিকিওরিটি বেনিফিট বহাল রাখার জন্যে গোপনে কাজ করেন। সুতরাং কর্মচারীদের সংখ্যা ঠিক কতো, সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশীদের জীবিকা উপার্জনের একটা প্রধান অবলম্বনই যে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এবং ঠিক পরে পুব লন্ডন, বিশেষ করে ব্রিক লেইন, তখন ছিলো ইহুদীদের এলাকা। তাঁদের একটা প্রধান ব্যবসা ছিলো কাপড়ের এবং পোশাক তৈরির। লস্কররা অনেকে ইহুদীদের পোশাক তৈরির দোকানে সেলাই করার কাজ পেয়েছিলেন। সেলাইয়ের কল দিয়ে নয়, তাঁরা সেলাই করতেন হাত দিয়ে। দর্জির

কাজে বেতন ছিলো রেস্টুরেন্টের কাজের চেয়ে বেশি। সুতরাং যাঁরা সেলাইয়ে দক্ষতা দেখাতে পারতেন, তাঁরা এই কাজ থেকে বেশ ভালো আয় করতে পারতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: বাঙালি অভিবাসীরা সাধারণত আয়-উপার্জন করে সেই টাকা দিয়ে পোশাকের ব্যবসা না-করে বরং রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। আশেক আলি এবং আয়না মিয়ার মতো দু-একজন বাঙালি পুব লন্ডনে দর্জির দোকান করলেও, তা ছিলো নিতান্তই ব্যতিক্রম। সম্প্রতি বাঙালিরা তৈরি পোশাকের কয়েকটি শিল্প নির্মাণ করেছেন। এঁরা নিজেরা বিক্রি করার পরিবর্তে বড়ো বড়ো দোকানে তাঁদের চাহিদা-মতো পোশাক সরবরাহ করেন। চামড়ার পোশাক তৈরি করার কয়েকটি কারখানাও আছে বাঙালিদের।



দেশী খাবারের আয়োজন

রেস্টুরেন্ট ছাড়া, খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে মিষ্টি এবং তৈরি খাবার বিক্রির দোকানও লন্ডনে অনেকগুলোই আছে। মিষ্টির প্রতি বাঙালিদের যে-ভালোবাসা সেটা হাজার হাজার মাইল দূরে এসেও তাঁরা ভুলে যেতে পারেননি। এসব মিষ্টির দোকানে অন্যান্য তৈরি খাবারও পাওয়া যায়। রসগোল্লা এবং সন্দেশের মতো জনপ্রিয় কোনো মিষ্টির খানিকটা পরিবর্তন করে এঁরা নতুন নতুন মিষ্টিও উদ্ভাবন করেছেন।

উপমহাদেশের অন্য সম্প্রদায়গুলোর প্রধান পেশার সঙ্গে বাংলাদেশীদের প্রধান প্রধান পেশার তুলনা করলে তাদের জীবিকা উপার্জন সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়। যেমন, গুজরাটি এবং পাঞ্জাবী অভিবাসীদের একটা বড়ো অংশই হাতে-কলমের এবং শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক মিস্তিরি, দর্জি, মেরামতকারী, ড্রাইভার,

ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্লামার (যাঁরা পানির পাইপ থেকে শুরু করে সেন্ট্রাল হীটিং পর্যন্ত স্থাপন এবং মেরামতের কাজ করেন) এবং বিল্ডার দেখা যায়। বিল্ডার বললে বাড়ি নির্মাণ থেকে আরম্ভ করে বাড়িতে রঙ করা পর্যন্ত অনেক ধরনের কাজই বোঝায়। এসব কাজ রীতিমতো শারীরিক পরিশ্রমের। কিন্তু অফিসের ছোটো অথবা মাঝারি ধরনের চাকরির তুলনায় এসব কাজ থেকে আয় হয় বেশি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গুজরাটী, পাঞ্জাবী এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা লোকেরা এসব কাজ করলেও, পশ্চিম বাংলা অথবা বাংলাদেশের বাঙালিরা এসব কাজ শেখেন না অথবা করেন না। কারণ, তাঁরা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে চান না। পরিশ্রমের কাজের মধ্যে তাঁদের সবচেয়ে দক্ষতা রেস্টুরেন্টের কাজে। এ ছাড়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা না-থাকলে তাঁরা সাধারণত কলকারখানা, পোশাক-শিল্প ইত্যাদিতেও কাজ করেন। এ জন্যেই বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যে অদক্ষ শ্রমিকের হার হলো শতকরা ২৫, অপর পক্ষে গুজরাটী এবং পাঞ্জাবীদের মধ্যে এই হার মাত্র শতকরা ৭। পরিশ্রমের কাজ না-করার ফলে শতকরা ৭৫ ভাগ বাংলাদেশী কর্মজীবীর আয় অন্য সম্প্রদায়গুলোর তুলনায় যথেষ্ট কম।

বাংলাদেশী বাঙালিরা এখন ছোটোখাটো অনেক চাকরি করেন। এসব কাজ করেন সাধারণত যাঁরা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা অথবা এ লেভেল পাশ করেছেন, তেমন তরুণ-তরুণীরা। এগুলোর মধ্যে আছে দোকানে বিক্রি এবং অন্যান্য কাজ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পোস্ট অফিস, ব্যাংক, হাসপাতাল, স্কুল এবং স্থানীয় কাউন্সিলে কেরানির কাজ ইত্যাদি। ইতিবাচক একটি লক্ষণ হলো এই যে, আগে মেয়েরা বলতে গেলে কোনো কাজ করতেন না, এখন কমবয়সীরা অনেকেই কাজ করার দিকে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু বাঙালিরা এ দেশে মধ্যবিত্ত নন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র বলে বিবেচিত হন।

গুজরাটী, শিখ এবং পাঞ্জাবী মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটেনে এখন বহু লাখপতি বা কোটিপতি আছেন, যাঁদের ইংরেজিতে বলা হয় মিলিয়নিয়ার অথবা মাল্টি-মিলিয়নিয়ার। এঁদের মধ্যে ব্যর্মিংহ্যামের এক পাঞ্জাবী মুসলমান তাঁর সাফল্যের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি তাঁর গ্রোসারি বা মুদির দোকান খুলতেন প্রতিদিন সকাল আটটায় আর তা বন্ধ করতেন রাত এগারোটায়। তাঁর দোকান তিনি খোলা রাখতেন সপ্তাহের সাত দিন। তখন রোববার দোকান খোলা রাখার নিয়ম ছিলো না। কিন্তু সেদিনও তিনি দোকান খোলা রাখতেন। সাধারণ দোকানপাট যেহেতু খোলে নটায় এবং বন্ধ হয় সাড়ে পাঁচটায়, সে জন্যে তাঁর দোকানে বহু লোকই আসতেন, যাঁরা সময়মতো বাজার করতে পারেননি। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে তিনি তাঁর ব্যবসায় উন্নতি করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত 'বড়ো লোকে' পরিণত হন।

আর-একজন শিখ বলেছেন তাঁর সাফল্যের কাহিনী। তিনি ছোট্টো একটা কাজ করতেন অন্যের সঙ্গে। বাড়তি আয়ের জন্যে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য নিয়ে তিনি অবসর সময়ে ভোজ্য তেলের ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমে তিনি এ ব্যবসা আরম্ভ

করেন খুব সামান্য মূলধন দিয়ে। বড়ো ড্রামে তেল কিনে তিনি তা বোতলে ভরে, বোতলের ওপর একটা লেবেল লাগিয়ে মুদির দোকানে সরবরাহ করতে আরম্ভ করেন। প্রথম বছর এই বোতল-জাত তেল বিক্রি থেকে তাঁর মাত্র কয়েক হাজার পাউন্ড আয় হয়েছিলো। কিন্তু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর তিনি কর্মচারী নিয়োগ করে রীতিমতো তেল-সরবরাহকারী বড়ো ব্যবসায়ী হিশেবে পরিচিত হন।

ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা অনেকে ছোটো কাজ দিয়ে শুরু করে পরে শিল্পও স্থাপন করেছেন। এ রকম একটি ভারতীয় খাদ্য-শিল্পের নাম পাটক। লক্ষ্মীশঙ্কর পাঠক ১৯৫৬ সালে কেনিয়া থেকে মাত্র পাঁচ পাউন্ড নিয়ে লন্ডনে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং ছয় সন্তান। টিকে থাকার জন্যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে মাত্র ছ ফুট লম্বা এবং পাঁচ ফুট চওড়া রান্নাঘরে সামোসা (বাংলায় সিঙ্গাড়া) তৈরি করে বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা যে-আয় করেন, তা দিয়ে ১৯৫৮ সালে তিনি ড্রামন্ড স্ট্রীটে একটি মুদির দোকান খোলেন। সেখানে তিনি বিক্রি করতেন প্রধানত ভারতীয় খাবারের মাল-মশলা। ১৯৬২ সালে আচার এবং চাটনি তৈরি করার জন্যে উত্তর ইংল্যান্ডের একটি পুরোনো মিল কিনে তিনি "পাটক" নাম দিয়ে একটি খাদ্য-শিল্প গড়ে তোলেন। এ কম্পেনিতে তখন কাজ করতেন মাত্র ছজন লোক।

১৯৭০ সালে তাঁর পুত্র কীরিত লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পিতার ব্যবসায় যোগ দেন। ছ বছর পরে ভারতে খাদ্যদ্রব্য কিনতে গিয়ে মীনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁকে তিনি বিয়ে করেন। মীনা ব্রিটেনে এসে স্বামীর সঙ্গে ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯৮৪ সাল থেকে পাটকের খাদ্য-দ্রব্যাদি সুপারমার্কেটগুলো কিনতে আরম্ভ করে। এই কম্পেনি এখন আর কেবল চাটনি, আচার এবং মশলাতেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং ভারতীয় নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য তৈরি করে। বর্তমানে এই কম্পেনির কর্মচারীর সংখ্যা সাত শোরও বেশি এবং এ কম্পেনি ভারতীয় খাবারের মাল-মশলা রপ্তানি করে চল্লিশটি দেশে। কীরিত এবং মীনা দুজনই ব্রিটেনের খাদ্যশিল্পে তাঁদের অবদানের জন্যে ওবিই খেতাব পেয়েছেন।

কেবল এ ধরনের কুটিরশিল্প-ভিত্তিক শিল্প স্থাপন এবং পরিচালনাই নয়, বড়ো শিল্প স্থাপনেও ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা এগিয়ে এসেছেন। ব্রিটেনের বৃহত্তম ইস্পাত শিল্পের মালিক লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্তাল একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। এ দেশের সবচেয়ে ধনীও তিনি। তা ছাড়া, পৃথিবীর তাবৎ ধনীদের মধ্যে তাঁর স্থান পঞ্চম। ধারণা করা হয় যে, তাঁর সম্পদের পরিমাণ হলো প্রায় দু হাজার কোটি পাউন্ড। লক্ষ্মীনারায়ণ গরিব পরিবারের সন্তান। ছেলেবেলায় ঘুমাতেন দড়ির খাটিয়ায়। তারপর তাঁর পিতা কলকাতায় গিয়ে ছোটো ব্যবসা শুরু করেন। আর লক্ষ্মীনারায়ণ ভর্তি হন কলকাতার সেন্ট জাভিয়ের্স কলেজে। সেখান থেকে ১৯৬৯ সালে তিনি বি.কম পাশ করেন। তারপর পিতার ব্যবসায় যোগ দেন এবং ধীরে ধীরে নিজের ভাগ্য গড়ে তোলেন।

কেবল মিত্তাল গোষ্ঠীই নয়, ভারতীয় অন্য সফল ব্যবসায়ীদের মধ্যে যাঁরা খুবই ধনী বলে পরিচিত তাঁদের কয়েকজন হলেন শ্রী এবং গোপী হিন্দুজা (সম্পদের পরিমাণ ছ

শো কোটি পাউন্ডের বেশি), লর্ড স্বরাজ পল, অনিল আগারওয়াল, অনিরুদ্ধ দীক্ষিত, ভিখু ও বিজয় প্যাটেল, জাসমিন্দের সিংহ প্রমুখ। উপমহাদেশের ধনীদের তালিকায় নাম আছে তিন শতাধিক। কিন্তু এই কোটিপতিদের মধ্যে দু-একজনের বেশি বাংলাদেশী নেই। কারণ, তাঁদের মধ্যে উদ্যোগী শিল্পপতি নেই বললেই চলে। এমন কি, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও ব্যবসার চেয়ে চাকরি করতে বেশি পছন্দ করেন। তাঁদের মধ্যেও কেউ কোটিপতি আছেন বলে শোনা যায় না। একটি সফটওয়্যারের কম্পেনির বেশ নাম আছে। তবে কোটিপতির তালিকাভুক্ত বলে মনে হয় না।



রাস্তার ধারে বাংলাদেশী গ্রোসারি, হোয়াইটচ্যাপল

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রধানত ভারতীয়রা এবং কিছু সংখ্যক পাকিস্তানী যে-সাফল্য অর্জন করেছেন, বাংলাদেশী এবং পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের মধ্যে সে ধরনের নিরলস পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত খুব কম। তাঁরা সাধারণত আয়েশী জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার পরিবর্তে অন্যের চাকরি করতে বেশি আগ্রহী তাঁরা। অনেক বাঙালিই তাঁদের ব্যবসা শুরু করেছিলেন লক্ষ্মীশঙ্কর পাঠকের চেয়ে বেশি মূলধন নিয়ে এবং বড়ো আকারে, তবে কেউই ওপরের দিকে যেতে চেষ্টা করেননি। একটা রেস্টুরেন্টে সাফল্য অর্জন করলে অন্য পাড়ায় গিয়ে আর-একটা রেস্টুরেন্ট করেছেন, কিন্তু রেস্টুরেন্টের সীমানা অতিক্রম করে বিশাল বিশ্বের দিকে যাত্রা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। দৃষ্টান্ত হিশেবে একজন বিখ্যাত বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট মালিকের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি একালের বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট মালিকদের

মধ্যে সবচেয়ে ধনী বলে অনেকে দাবি করেন। তিনি মধ্য লন্ডনে একে একে কয়েকটি অত্যন্ত বিলাসী এবং আধুনিক রেস্টুরেন্ট খুলে সাফল্য লাভ করেছেন। কিন্তু রেস্টুরেন্ট থেকে অন্য পথে পা বাড়াননি। আগেই দেখেছি, মোশাররফ আলি এবং ইসরাইল মিয়া-সহ পথিকৃৎরা একটার পর একটা রেস্টুরেন্ট করেছেন, অন্য দিকে যাননি। বাংলাদেশীদের মধ্যে সে ধারা এখনো বহাল বলেই মনে হয়। অপর পক্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে ডাক্তার এবং কিছু পেশাজীবী ছাড়া বাকি প্রায় সবাই চাকরিজীবী। বাংলাদেশীদের মধ্যে ছোটোখাটো ব্যবসা করার যে-উদ্যোগ দেখা যায়, ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যে তাও নেই।



বাংলাদেশী সবজি— লাউ, কচুর লতি, মুখী কচু, কলার মোচা, কাঁঠালের বিচি

রেস্টুরেন্টের ব্যবসার পরেই বাংলাদেশীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ব্যবসা হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্রের দোকান অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য, বাড়িতে ব্যবহৃত প্রাত্যহিক জিনিশপত্র এবং কাপড়ের দোকান। এ ধরনের দোকানের সংখ্যা জানা যায় না। তবে হাজার খানেকের বেশি হওয়াই সম্ভব। লন্ডনের বাইরেও বড়ো শহরগুলোতে বাংলাদেশী গ্রোসারি এবং ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারির বহু দোকান আছে। গ্রোসারির বড়ো দোকানগুলোকে বলে ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি। বাংলাদেশীদের পরিচালিত রেস্টুরেন্টগুলো

ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নামে পরিচিত হলেও, আশ্চর্যের বিষয়, এই গ্রোসারিগুলোকে ভারতীয় গ্রোসারি বলা হয় না, বলা হয় বাঙালি দোকান বা বাংলাদেশী দোকান।

বাংলাদেশী গ্রোসারিতে পাওয়া যায় প্রধানত বাংলাদেশের খাবার — যার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো বাংলাদেশের মাছ এবং শাকসবজি। বাংলাদেশী পরিবারগুলোর কর্তা এবং কর্ত্রীরা যেহেতু দেশের স্বাদ এবং রুচি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, সেহেতু বাংলাদেশী খাবার ছাড়া ইউরোপীয় খাবার তাঁরা ঠিক পছন্দ করেন না। বিলিতি মাছ এবং সবজির বদলে তাঁরা তাই দেশী মাছ ও সবজি চান। বাংলাদেশে পাওয়া যায়, বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলে পাওয়া যায়, এমন কোনো মাছ নেই, যা এসব গ্রোসারিতে পাওয়া যায় না। টাকি মাছ, কুচো মাছ, পুঁটি মাছ ইত্যাদি ছোটো মাছও। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যেসব মাছ পাওয়া যায়, তা এসব দোকানে কমই পাওয়া যায়। যেমন, ভেটকি মাছ। শাক-সবজি সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। পাটের শাক, কুমড়োর শাক, পুঁই শাক, কচুর লতি, কলার মোচা এবং সিলেট অঞ্চলের সাতকড়াও এসব দোকানে পাওয়া যায়। এগুলো যে সবই বাংলাদেশ থেকে আসে, তা নয়। ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড এবং বর্মা থেকেও মাছ আসে। বিমানে আনতে হয় বলে এসব মাছ এবং সবজির দাম বেশিই পড়ে, তা সত্ত্বেও কেবল বাংলাদেশী বাঙালিরাই এসব গ্রোসারি থেকেই মাছ ও সবজি কেনেন না, পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা এবং এ দেশীয়রাও বাংলাদেশী অথবা পাকিস্তানী গ্রোসারি থেকে মাছ কেনেন। মুড়ি, চিঁড়ে, মোয়া, চানাচুর, গুড়, পান-সুপুরি — বলতে গেলে এমন কোনো দেশী খাবার জিনিশ নেই, যা এসব দোকানে পাওয়া যায় না।

বিলেতের সুপারমার্কেটগুলোতেও সব রকমের মাংস পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশীরা সাধারণত সুপারমার্কেট থেকে মাংস কেনেন না — তাঁরা মাংস কেনেন এসব গ্রোসারি থেকে। কারণ, এসব গ্রোসারিতে 'হালাল' মাংস পাওয়া যায়। গত বিশ-তিরিশ বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে যে-ধর্মীয় অনুভূতির জোয়ার এসেছে, তাকে কাজে লাগিয়ে হালাল-ব্যবসায়ীরা খুব রবরবা এবং একচেটিয়া ব্যবসা করছেন। এ ব্যবসা এতোই লাভজনক যে, কিছু লোক কেবল গরু, মেষ, মুরগি জবাই করার কাজ করেন। কতোটা ধর্মীয় নিয়ম রক্ষা করে এসব জবাই করা হয়, সেটা কেউ দেখতে যায় না, বরং দোকানে হালাল মাংস বিক্রি হয় — এই আশ্বাসকেই ক্রেতারা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেন। *Across Seven Seas and Thriteen Rivers* গ্রন্থে সংগৃহীত একাধিক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকেও হালাল মাংসের ব্যাপারে সাধারণ ক্রেতাদের এতো সচেতনতা ছিলো না, যদিও ১৯৪০-এর দশকের গোড়াতেই তসলিম আলি এবং নওয়াব আলি হালাল মাংসের ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন।

দেশী জিনিশের প্রতি বাংলাদেশীদের কারো কারো এমন নস্টালজিক স্মৃতি, ভালোবাসা এবং আনুগত্য আছে যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে তৈরি — ধরা যাক — উন্নত মানের প্রসাধনী বাদ দিয়ে এঁরা বাংলাদেশে তৈরি "তিব্বত স্নো" ব্যবহার করেন। প্রতিটি

গ্রোসারিতে মাথায় দেওয়ার মতো নারকেল তেল, জবাকুসুম তেল, এমন কি, ফেনির কদুর তেলও থাকে, যদিও এ দেশের লোকেরা কখনো মাথায় তেল মাখেন না। ভালো টুথ পেস্টের পাশাপাশি এসব গ্রোসারিতে দাঁতের মাজনও থাকে। বস্তুত, অনেকে টুথপেস্ট ব্যবহার না-করে সেই মাজনই পরম সমাদরের সঙ্গে কেনেন।

যে-বাংলাদেশীদের গ্রোসারি খোলার মতো মূলধন নেই, তাঁরা অনেকে রাস্তার ধারে — ফুটপাথে — শাক-সবজি ও ফলমূল থেকে আরম্ভ করে প্রাত্যহিক জীবনে দরকার এমন নানা রকমের জিনিশপত্র বিক্রি করেন। এমন কি, অনেকে গানের ক্যাসেট, ডিভিডি, ফোনকার্ড, পোশাক, শস্তা ইলেক্ট্রনিক্সের জিনিশপত্র ইত্যাদি বিচিত্র পণ্য সাজিয়ে বসেন।

বাংলাদেশীদের শাড়ি এবং কাপড়চোপড়ের দোকানও আছে। তবে গুজরাটীরা যেহেতু এ ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী, সে জন্যে এই ব্যবসায় বাঙালিদের একচেটিয়া অধিকার নেই। তদুপরি, সিলেটী বাঙালিরা বাংলাদেশী শাড়ির চেয়ে ভারতের কৃত্রিম সুতোর ঝকমকে শাড়িই বেশি পছন্দ করেন। বলিউড-স্টাইলের সালোয়ার-কামিজ এবং লেহেঙ্গার মতো নব্য পোশাকও বাঙালি তরুণীদের গুজরাটী দোকানের দিকে আকৃষ্ট করে। তা সত্ত্বেও বাঙালি-পাড়ায় বাঙালিদের শাড়ির দোকান থাকে বৈকি! তার প্রধান কারণ সম্ভবত গুজরাটী পাড়া থেকে বাঙালি-পাড়ার দূরত্ব। যেমন, পুব লন্ডন থেকে ঈলিং অথবা সাউথ হলের দূরত্ব অনেক। তা ছাড়া, গুজরাটীরা বাংলাদেশের শাড়ি আমদানি করেন না। সুতরাং সেসব দোকানে বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত জামদানি, ঢাকাই অথবা টাঙ্গাইলের শাড়ি পাওয়া যায় না। কেউ এ ধরনের শাড়ি কিনতে চাইলে, তাঁদের অবশ্যই বাংলাদেশী দোকানে যেতে হয়। এসব শাড়ির দোকানে কেবল শাড়ি-ব্লাউজ নয়, বাংলাদেশে তৈরি সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য ধরনের পোশাকও পাওয়া যায়।

বাঙালিদের মধ্যে একটা জিনিশ খুবই লক্ষণীয়, এঁরা কোনো রকম উৎপাদনমূলক ব্যবসায় যান না অথবা যেতে চান না। বরং নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন পরিসেবামূলক ব্যবসা এবং বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে। বিলেতের লোকেরা বছরে অন্তত একবার ছুটি কাটাতে কোনো না কোনো দেশে বেড়াতে যান, বিশেষ করে যেখানে আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান আছে অথবা নিদেন পক্ষে সমুদ্র উপকূল আছে, তেমন জায়গায়। কিন্তু সাধারণ বাংলাদেশীরা তা না-করে বেড়াতে যান বাংলাদেশে। এবং সেখানে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও অনেকে ভারতে বেড়াতে যান। অসম্ভব নয় যে, বছরে হয়তো লাখ খানেক বাঙালি বাংলাদেশ এবং ভারতে বেড়াতে যান। বাংলাদেশে যাওয়া ছাড়া, হাজার হাজার বাংলাদেশী হজ্জ করতে যান সৌদী আরবে। হজযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এঁদের বিমান-টিকিট বিক্রি করার জন্যে লন্ডনের বাঙালি পাড়ায় অনেকগুলো ট্র্যাভেল এজেন্টের দোকান আছে। ম্যানচেস্টার, বার্মিংহ্যাম, গ্লাসগো ইত্যাদি শহরেও এ ধরনের ট্র্যাভেল এজেন্টের দোকান আছে। প্রতিটি দোকানে অন্তত তিন-চারজন লোক কাজ করেন।

অনেক ট্র্যাভেল এজেন্ট এখন হজের সময় মক্কা-মদিনায় থাকা, খাওয়া এবং যানবাহনের ব্যবস্থা-সহ প্যাকেজ ট্যুরের আয়োজন করে দেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে কেবল মাত্র টিকিট বিক্রি করার চেয়ে অনেক বেশি আয় করা যায়।

বাংলাদেশী বাঙালিদের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের যোগাযোগ যেহেতু ক্ষীণ, সে জন্যে পশ্চিম বাংলার লোকেদের বিমান-টিকিটের জন্যে কিছু পশ্চিম বঙ্গীয় ট্র্যাভেল এজেন্টও আছেন। তবে পশ্চিম বঙ্গের এই ট্র্যাভেল এজেন্টরা বড়ো রাস্তায়



ট্র্যাভেল এজেন্ট, তার পাশেই দুটি রেস্টুরেন্ট – গ্রাম বাংলা ও শালিমার

দোকান করে ব্যবসা করেন না, বরং ছোটো আকারের ব্যবসা বলে নিজেদের বাড়ি থেকেই তাঁদের ব্যবসা পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশীদের আর-একটা ব্যবসা হলো দেশে টাকা পাঠানোর। আগেই বলেছি, সিলেটীদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। সে জন্যে অনেকেই দেশে যেসব আত্মীয়স্বজন বাস করেন, তাঁদের কাছে টাকা পাঠান। এমন কি, নিজেরা কোনো কালে দেশে গিয়ে থাকতে পারবেন কিনা, তার নিশ্চয়তা না-থাকলেও তাঁরা দেশে জমি, বাড়ি অথবা নিদেন পক্ষে একটা ফ্ল্যাট কিনতে চান। দেশের জন্যে নস্টালজিক স্মৃতি ছাড়াও এর সঙ্গে সামাজিক মর্যাদার একটা যোগ থাকা সম্ভব। এ জন্যেও তাঁদের দেশে টাকা পাঠাতে হয়। টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো সম্ভব এবং তা নিরাপদও।

কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ব্যাংক নেই। তা ছাড়া, ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে ব্যয়ও হয় সামান্য বেশি। সবচেয়ে বড়ো কথা, ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে গেলে কোন সূত্র থেকে টাকা পাওয়া গেছে, তার প্রমাণ দিতে হয়। সে জন্যে এখন অনেক প্রতিষ্ঠান হয়েছে, যারা এসব প্রশ্ন না-করেই কম খরচে টাকা পাঠানোর কাজ করে। যেসব ছাত্র অথবা যেসব ব্যক্তি বেআইনীভাবে আয়কর ফাঁকি দিয়ে টাকা উপার্জন করে এক সঙ্গে অনেক টাকা দেশে পাঠাতে চান, তাঁদের জন্যে এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক। মোট কথা, টাকা পাঠানোর কাজ একটা জনপ্রিয় ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যাঁরা টাকা পাঠান, তাঁরা সেই সঙ্গে অন্য ব্যবসাও করেন, বিশেষ করে ট্র্যাভেল এজেন্টের ব্যবসা। লন্ডনের বাংলা পত্রিকা খুললেই এ ধরনের দোকানের



রাস্তার ধারের দোকান, হোয়াইটচ্যাপল

বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সংখ্যার দিক দিয়ে রেস্টুরেন্ট ছাড়া, সম্ভবত অন্য কোনো বিজ্ঞাপন এতো প্রকাশিত হয় না।

বাড়ি কেনার জন্যে মর্টগেইজ কম্পেনির দালালি, বীমা কম্পেনির এজেন্সি, রেস্টুরেন্টের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিশপত্র সরবরাহ, গাড়ি মেরামতের কারখানা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক ব্যবসাও আছে বাংলাদেশীদের মধ্যে। তবে এ ধরনের কোনো ব্যবসা পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের মধ্যে আছে বলে শুনিনি।

এ ছাড়া, বাঙালিদের আর-একটা ব্যবসা আছে পাড়ার "কর্নার শপের"। বড়ো রাস্তা থেকে দূরে পাড়ার ভেতরের দিকের গলিতে কেউ কেউ ছোটো দোকান খুলে বসেন।

এসব দোকানে খবরের কাগজ, কাগজ-কলম, রুটি-দুধ-ডিম, বিস্কিট-চকলেট, দু-এক রকমের সবজি, টুথব্রাশ-টুথপেস্ট, লাইট বাল্‌ব; ছুরি-কাঁচি, ঠাণ্ডা পানীয়, পান-সিগারেট, ফোন কার্ড ইত্যাদি প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বিচিত্র জিনিশপত্র থাকে। ক্রেতারা ঘর থেকে বেরিয়ে দু পা হেঁটেই তা কিনে আনতে পারেন। এসব দোকানে জিনিশপত্রের দাম বড়ো রাস্তার দোকানের তুলনায় বেশি। তা সত্ত্বেও এ রকম দোকানের উপযোগিতা এবং চাহিদা আছে। বাঙালি পাড়ার বাইরে এই ধরনের দোকানের মালিক প্রায় সবাই গুজরাটী — প্রধানত প্যাটেল বংশনামধারী। তাঁরা সাধারণত দু-চার বছর এ জাতীয় দোকান চালিয়ে সেই টাকা দিয়ে বড়ো কোনো



ব্রিক লেইনের সবচেয়ে বড়ো বই-এর দোকান, সঙ্গীতা

ব্যবসা ফাঁদেন। কিন্তু বাঙালিরা সাধারণত এই দোকানের ব্যবসা থেকে বড়ো অন্য ব্যবসায় যেতে পারেন না অথবা যান না।

বাঙালি পাড়ায় আর-একটা দোকান দেখা যায়, ভিডিও, ক্যাসেট, বই, খবরের কাগজ ইত্যাদির দোকান। দেশ থেকে বহু দূরে থাকেন বলে অভিবাসীদের মন অনেক সময়েই দেশের জন্যে ব্যাকুল হয়। এখানে তাঁদের মেলামেশা করার মতো সামাজিক পরিধিও সীমিত। ইংরেজি ছায়াছবি তাঁদের সবার কাছে বোধগম্য নয়। টেলিভিশনের সাধারণ অনুষ্ঠানেও তাঁদের আকর্ষণ খুব কম। তাই তাঁরা দেশের গান শোনেন; দেশের নাটক অথবা চলচ্চিত্র দেখেন। হিন্দী চলচ্চিত্র তাঁদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়।

এসব দেখানোর জন্যে সিনেমাও আছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও ভিডিও ক্যাসেট এবং ডিভিডি হিশেবে পাওয়া যায়। গানের মধ্যে পল্লীগীতিতেই বয়স্কদের আগ্রহ বেশি। এসব দোকান তাঁদের সেই চাহিদা পূরণ করে। বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় ছোটো ছেলেমেয়েদের বাংলা এবং আরবি শেখানোর বই। সঙ্গীতার মতো বড়ো দোকানে বাংলাদেশের দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং নানা রকমের ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। এমন কি, পশ্চিমবঙ্গের পত্রপত্রিকাও পাওয়া যায়।

এসব ছাড়া, সবচেয়ে জনপ্রিয় বই হলো উপন্যাস। রোমেনা আফাজের মতো কিছু বটতলার ঔপন্যাসিকের রচনা স্বল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। ধর্মগ্রন্থও প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। তবে রূপসী বাংলা এবং সঙ্গীতার মতো বড়ো বইয়ের দোকানে ঢাকা-কলকাতার প্রচুর ভালো বইও পাওয়া যায়। কোনো কোনো দোকানে মওলানাদের ওয়াজ-নসিয়তের ক্যাসেটও বিক্রি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধর্ম-ব্যবসা করেও মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক জীবনধারণ করেন। মসজিদে ইমামতি, বাড়িতে মিলাদ, আকিকা ও বিবাহ উপলক্ষে এবং জানাজার নামাজ পড়িয়ে অনেক ধর্মব্যবসায়ী ভালো আয় করেন। এঁরা সবাই যে বাংলাদেশে থাকার সময়ে এ কাজ করতেন, তা নয়। অনেকে এ দেশে এসেই এই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। পশ্চিম বাংলার লোকেদের মধ্যেও বৃত্তিধারী পুরুত আছেন বলে মনে হয়। তবে এ সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য আমার জানা নেই।

ব্রিটেনে বাংলা পত্রপত্রিকার পাঠক-সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশি নয়। কিন্তু এখানে অর্ধ-ডজনেরও বেশি সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে। দ্বিভাষী পত্রিকাও আছে। এসব পত্রিকার প্রধান আয় স্থানীয় কাউন্সিল, ট্রাভেল এজেন্ট, সম্পত্তি বিক্রি এবং রেস্টুরেন্টের বিজ্ঞাপন। বাংলা পত্রিকা এবং রেস্টুরেন্টের মেনিউ ছাপানোর জন্যে কয়েকটি ছাপাখানাও আছে লন্ডনে। এই ছাপাখানার ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন কয়েকজন বাংলাদেশী এবং তাঁদের কিছু দক্ষ শ্রমিক। বিজ্ঞাপন তৈরি করার জন্যেও একাধিক কম্পেনি আছে।

মোট কথা, পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা ব্যবসায় আগ্রহী না-হলেও, জীবিকার প্রয়োজনেই বাংলাদেশীরা নানা ধরনের ব্যবসা করছেন এখন। মূলধন, অভিজ্ঞতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যে আরও নতুন নতুন এবং বড়ো মাপের ব্যবসার দিকে অগ্রসর হবেন, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ব্যবসা না-করার যে-ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছে, বিলেতে এসেও তাতে লক্ষণীয় ফাটল ধরেনি। তাঁরা কোনো পেশায় যেতে অথবা চাকরি করাকেই তাঁদের কর্ম-জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে বিবেচনা করেন। সত্যি বলতে কি, অনেক শিক্ষিত লোক ব্যবসা করাকে সম্মানের হানিকর বলে গণ্য করেন।

আমরা আগেই দেখেছি, শিক্ষিত বাঙালি পিতামাতার চোখে সবচেয়ে আকর্ষণীয় পেশা হলো ডাক্তারি, কারণ এটা যেমন সম্মানজনক কাজ, তেমনি এ পেশা থেকে আয়ও সবচেয়ে বেশি। তাঁরা তাই সন্তানদের চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে উৎসাহিত করেন।

অনেক সময় বাধ্যও করেন। কিন্তু সবাই এই বিদ্যা শেখার মতো ভালো ছাত্র নয়, অথবা শিখতে আগ্রহীও নয়। সেসব ক্ষেত্রে পিতামাতারা চান যে, তাঁদের সন্তানরা যাতে নিদেন পক্ষে ডেন্টিস্ট, আইনজীবী অথবা অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারে। ডান্ডি শহরের যে-জরিপ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তা থেকে পিতামাতাদের অগ্রাধিকার বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই মূল্যবোধের পরিধিতে বড়ো হয়ে বাঙালিরা যেসব কাজ করছেন, সেদিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

ডাক্তার এবং ডেন্টিস্টদের পরে সবচেয়ে আয়-উন্নতি করেছেন অ্যাকাউন্টেন্টরা। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন অথবা নিজেরাই কয়েকজন মিলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এঁদের মক্কেলরা সবাই বাঙালি না-হলেও বেশির ভাগই উপমহাদেশের লোক। এসব প্রতিষ্ঠান প্রধানত ব্যবসায়ীদের আয়কর সম্পর্কিত উপদেশ এবং কাজ করে দেন। অনেক তরুণ-তরুণী আইন অধ্যয়ন করে ব্যারিস্টার অথবা সলিসিটর হচ্ছেন। আইনজীবী হিশেবে কোনো বাঙালি এখনো বিখ্যাত না-হলেও, অনেকেই আইনের প্রতিষ্ঠানে সলিসিটর হিশেবে কাজ করছেন। ধারণা করি, এ কাজ থেকে তাঁরা ভালোই আয় করেন। এ ধারণা হওয়ার কারণ এই যে, আগের চেয়েও বেশি বাঙালি ছাত্রছাত্রী আইন অধ্যয়ন করছে। অর্থনীতি আর-একটা বিদ্যা যাতে বাঙালিরা বেশ আকৃষ্ট হচ্ছেন। অর্থনীতি অধ্যয়ন করে এঁরা অনেকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, সাধারণ ব্যাংক, বীমা এবং বিভিন্ন কম্পেনিতে কাজ করছেন।

ব্রিটেনে বাংলাদেশীদের যে-টিভি চ্যানেল এবং বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে, তাতে কাজ করেন অনেকে। তাঁদের বেশির ভাগেরই সাংবাদিকতায় বিশেষজ্ঞতা নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জনের সূত্রে এসব কাজ করেন। বিবিসির বাংলা বিভাগেও ডজনখানেক বাঙালি অভিবাসী কাজ করেন। মোট কথা, সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত আছেন প্রায় শ খানেক শিক্ষিত বাঙালি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সংখ্যা খুব কম থাকলেও, এখন স্কুলে বাঙালি শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ছে। আগে বাঙালি শিক্ষক বললে বোঝাতো বাংলা ভাষার শিক্ষক অথবা সেই সব শিক্ষক যাঁরা দেশ থেকে সদ্য আসা ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি বুঝতে সাহায্য করতেন। এঁদের বলা হতো ইএসএল (ইংলিশ অ্যাজ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ) শিক্ষক। যাঁরা বাংলা পড়াতেন, তাঁরা বাংলা ভাষায় তাঁদের ডিগ্রি অথবা দক্ষতার জন্যে নয়, বরং বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা এই সুবাদে বাঙালি-প্রধান এলাকায় চাকরি পেতেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা সাধারণত তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখাতে আগ্রহী নন। কিন্তু তাঁরাও অনেকে বাঙালি পাড়ায় গিয়ে বাংলার শিক্ষকতা করতেন এবং এখনো করেন।

এই চিত্র বর্তমানে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে। এখন বাঙালি শিক্ষকরা শুধু বাংলা পড়ান না। বরং তাঁরা বিজ্ঞান-সহ নানা বিষয় পড়িয়ে থাকেন। বস্তুত, এই তরুণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেশির ভাগ বাংলাদেশ অথবা পশ্চিম বাংলা থেকে লেখাপড়া শিখে এ দেশে আসেননি। এঁরা এ দেশেই লেখাপড়া শিখে এখন নানা বিষয়ে পড়াচ্ছেন।

আরও একটা কথা এই শিক্ষকদের সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। আগে এই শিক্ষকরা বেশির ভাগই ছিলেন পুরুষ। কিন্তু এখন বাঙালি মেয়েরাও শিক্ষকতার দিকে এগিয়ে আসছেন। এই মেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই সিলেটী। বাঙালি তরুণ (এবং তরুণী) শিক্ষকরা বিজ্ঞান, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান, এমন কি, ইউরোপীয় ভাষা শেখানোর কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উন্নতিও করছেন। কেবল শিক্ষক হিশেবে নয়, অনেকে ক্লাসরুম অ্যাসিস্টেন্ট হিশেবেও কাজ করছেন এখন। পুরোপুরি শিক্ষক হতে হলে ডিগ্রি থাকতে হয় এবং তারপর শিক্ষকতার প্রশিক্ষণও দরকার হয়। কিন্তু যাঁদের ডিগ্রি নেই, ধরা যাক, যাঁরা কেবল এ লেভেল পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন, তাঁরাও ক্লাসরুম অ্যাসিস্টেন্ট হিশেবে কাজ করতে পারেন। যেসব ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে, এঁরা সাধারণত তাদের সাহায্য করেন। কয়েক বছর আগেও সিলেটী পিতামাতারা তাঁদের কন্যাদের লেখাপড়াই শেখাতেন না। এখন তাঁদের মধ্য থেকে মেয়েদের শিক্ষকতায় আসতে দেখে তাকে বাঙালি অভিবাসীদের একটা অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন বলেই আখ্যা দিতে হয়।

শিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির একটা বড়ো কারণ হলো ইংল্যান্ডে শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ জন্যে এই পেশার দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে স্থানীয় কাউন্সিলগুলো বিনে পয়সায় শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ (ন মাসের পিজিসিই কোর্স) দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এমন কি, যাঁরা প্রশিক্ষণ নেন, কাউন্সিলগুলো তাঁদের ভাতাও দেয়। এর ফলে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষক হওয়া বেশ সহজ হয়েছে। তা ছাড়া, শিক্ষকদের বেতন যেমন বেশি, তেমনি তাঁদের চাকরিও সাধারণত স্থায়ী। প্রথম শিক্ষকতায় প্রবেশের সময়ে কোথাও কোথাও তাঁদের স্বাগতম জানিয়ে এককালীন অর্থও দেওয়া হয়। এক কথায়, শিক্ষকতা বাঙালিদের জন্যে রীতিমতো আকর্ষণীয় এবং সম্মানজনক একটি পেশা বলে বিবেচিত হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো যেসব এলাকায় প্রচুর বাঙালি বাস করেন, সেসব কাউন্সিলেও নানা কাজে বাঙালি কর্মচারীদের প্রয়োজন হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো: পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা বাংলাদেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম রাখলেও, বাঙালিদের জন্যে কাউন্সিলের এসব কাজ করতেন এবং এখনো করেন। এর প্রধান কারণ এই যে, এসব কাজ করতে পারেন অথবা করতে আগ্রহী — এমন বাংলাদেশী কিছু কাল আগেও বেশি ছিলেন না। কিন্তু এখন বাংলাদেশীরাও অনেকে কাউন্সিলের কাজ করতে এগিয়ে আসছেন।

বাংলাদেশীরা যেসব এলাকায় বেশি সংখ্যায় বাস করেন, সেসব এলাকায় তাঁরা আরও কিছু কাজ করেন, যা অন্যান্য এলাকায় গেলে তাঁদের পক্ষে করা হয়তো সম্ভব হতো না। যেমন, হাসপাতালে দোভাষীর কাজ অথবা সোশ্যাল ওয়ার্কের কাজ। বাঙালিদের মধ্যে ইংরেজি না-জানা বয়স্ক লোকের সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনুপাতে সবচেয়ে বেশি। সে জন্যে তাঁদের সঙ্গে কাজ করার জন্যে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের বাংলা-জানা (আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে সিলেটী জানা)

লোকেদের প্রয়োজন হয়। বাঙালি পাড়ার ব্যাংক এবং বড়ো ব্যবসাগুলোও বাংলা জানা অন্তত দু-একজন কর্মচারী রাখতে চায়।

এসব বিচিত্র ধরনের কাজ করলেও, বাঙালিদের মধ্যে বেকারত্ব অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি। ব্রিটেনের শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় বাংলাদেশী পুরুষদের বেকারত্বের হার চার গুণ। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে যে, এই হার হলো প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন (শতকরা ৩৩ ভাগ)। বিশেষ করে বাংলাদেশী মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার হলো ব্রিটেনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কারণ, বয়স্ক মহিলারা বেশির ভাগ শিক্ষিত নন। এই বেকারত্ব পাকিস্তানী মহিলাদের তুলনায়ও বেশি। বেকারত্ব এবং মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অভাবে শতকরা ৬৯ জন বাংলাদেশী এ দেশের মাপে দারিদ্র্য সীমানার নিচে বাস করেন।

বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বেকারত্ব বেশি বয়স্কদের মধ্যে। এঁদের সন্তানাদি বড়ো হওয়ায় এঁরা এখন আর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। তা ছাড়া, তাঁরা প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে অনেকেই কাজ করতে চান না। অনেকের কাজ করার মতো যথেষ্ট শিক্ষা এবং দক্ষতাও নেই। কেউ কেউ আছেন, যাঁরা প্রথমে যখন কাজ ছেড়ে দেন, তখনকার আইন অনুসারে তাঁরা পর্যাপ্ত পরিমাণ বেকার ভাতা পেতেন। ১৯৮০-এর দশকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত তখন কেউ ছ মাস কাজ করে থাকলে তারপর কাজ না-করলেও, তত্ত্বত, সারা জীবন এই বেকার ভাতা পেতে পারতেন। এই সুযোগ নিয়েই অনেকে কম বয়সেই কাজ ছেড়ে দিতেন এবং গল্পগুজব করে সময় কাটাতেন অথবা গোপনে খণ্ডকালীন কাজ করতেন। কিন্তু এখন সোশ্যাল সিকিউরিটির ওপর আর্থিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা কেউ কেউ কাজে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে বেকার ভাতা না-থাকলেও, যাঁদের আয় কম তাঁদের জন্যে স্বল্প-আয় ভাতা আছে। ২০০১ সালের লোকগণনার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশী অভিবাসীদের মধ্যে যাঁদের বয়স ৬৫ অথবা তার বেশি, তাঁরা প্রায় সবাই এই ভাতা পেয়ে থাকেন।

মোট কথা, বাংলাদেশী বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষার হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাঁরা আগের চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিচ্ছেন, কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে এখনো তাঁরা ব্রিটেনের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে আছেন। দক্ষ শ্রমিক হওয়ার মতো শিক্ষা অথবা প্রশিক্ষণ নিতেও তাঁরা উৎসাহ দেখাচ্ছেন না।

বিলেতি বাঙালির স্বরূপ ও সংস্কৃতি

বিলেতি বাঙালিদের সিংহ ভাগ — আনুমানিক শতকরা আশি ভাগই — বাংলাদেশের একটি জেলা সিলেট থেকে আসা। দশ ভাগ বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ, সিলেটীরা যাঁদের বলেন 'ঢাকাইয়া' বাঙালি। আর, দশ ভাগ পশ্চিম বঙ্গের বাঙালি — যাঁদের এক কথায় পরিচয় 'ইন্ডিয়ান' হিশেবে। এই তিন শ্রেণীর বাঙালিদের মাতৃভাষা এক, কিন্তু শিক্ষা, জীবিকা, জীবনযাত্রা, স্বরূপ এবং সংস্কৃতিতে মিল আছে যতোটুকু, অমিলই তার চেয়ে বেশি। পারস্পরিক যোগাযোগ আরও কম। এমন কি, কারো কারো এ-ও মনে হতে পারে যে, এই তিনটি গোষ্ঠী জল-অচল কামরায় বিভক্ত। এই গোষ্ঠীগুলো বিভক্ত একটি দুর্ভেদ্য দেওয়াল দিয়ে — সে দেওয়াল প্রধানত আঞ্চলিতার। তা ছাড়া, বিলেতি বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিচার করতে গেলে তাঁদের ধর্মীয়, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভেদাভেদও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়।



রাস্তার নামফলক

বিলেতের দূরত্ব বঙ্গভূমি থেকে ছ হাজার মাইল। যে-বাঙালিরা স্থায়ীভাবে বিলেতে বসতি স্থাপন করেছেন, তাঁদের অনেকে এসেছেনও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। তা সত্ত্বেও তাঁদের একটা বড়ো অংশই মনের দিক থেকে এখনো বাস করেন বঙ্গদেশে — স্বদেশ থেকে নিয়ে-আসা মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। এটা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যায়, তাঁদের ভাষা, ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনের আর-পাঁচটা জিনিশ থেকে। যেমন, ডাল-ভাত-মাছ ছাড়া বয়স্কদের এখনো পেট, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মন ভরে না। খাবার নিয়ে বাড়িতে মায়েদের সঙ্গে সন্তানদের প্রায়ই দেখা দেয় মতানৈক্য। সন্তানরা খেতে চায় পশ্চিমা খাবার — ব্যর্গার, ব্রেড, রোল, পিৎসা, স্যান্ডউইচ; অপর পক্ষে, মা তাদের দিতে চান দেশী খাবার — মাছ অথবা মাংসের ঝোল এবং ভাত। এ ছাড়া, বাড়ির ভেতরে বয়স্করা যেসব অভ্যাস উৎসাহের সঙ্গে পালন করেন, তাতেও প্রতিফলিত হয় বঙ্গদেশ থেকে আয়ত্ত করে আসা ভালো-মন্দ অভ্যাস এবং আচার-আচরণ।

ছোট্টো একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি – এতো দূরে এসেও বয়স্করা ভালো-মন্দ অনেকে পান খাওয়া ছাড়তে পারেন না। তাঁদের কেউ কেউ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে পান চিবান এবং রাস্তায় থুক করে পিক ফেলেন। বিড়ি খাওয়ার অভ্যাস এখানে এসে সিগারেটের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বয়স্কদের মধ্যে ধূমপান খুবই বেশি। অনেকে আবার ছাড়তে পারেন না চেঁচিয়ে কথা বলার অভ্যাস। এতো বছর এ দেশে থেকেও বেশির ভাগ বাঙালি স্যামন, কড, ট্রাউট, হ্যাডক মাছ খেতে চান না, বরং রুই, কাৎলা, ইলিশ, কৈ, মাগুর খেতে পছন্দ করেন। ম্যারো, কোর্জেট, ব্রকলির



'খেয়ে যান এক খিলি পান' ব্রিক লেইনে পানের দোকান

বদলে খোঁজ করেন লাউ, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়শ, করলা, সাতকড়া। অনেকে মাশরুমের মতো সবজিকে মনে করেন অখাদ্য হিশেবে।

পোশাকের ক্ষেত্রেও এই মনোভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পোশাকের সঙ্গে ধর্ম এবং ঐতিহ্যের যোগাযোগ থাকলেও, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবহাওয়ার। ব্রিটেন একটি শীতপ্রধান দেশ; বঙ্গদেশ, অপর পক্ষে, গ্রীষ্মপ্রধান। সে কারণে ব্রিটেনে এসে বাঙালিদের পোশাক পুরো বদলে গেলে অবাক হওয়ার কারণ থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং বলতে পারি, পুরুষদের পোশাকে যদিও বা লক্ষণীয় পরিবর্তন এসে থাকে, মহিলাদের পোশাকে পরিবর্তন এসেছে সে তুলনায় খুব সামান্যই। যেমন, শীতের কোট পরলেও, মহিলারা সাধারণত পশ্চিমা পোশাকের অন্যান্য উপকরণ এড়িয়ে চলেন। এখনো তাঁরা খোদ বঙ্গদেশের মহিলারা যা পরেন,

এখানেও তারই অনুকরণ করেন। যেমন, বেশির ভাগ মহিলা বাড়িতে শাড়িই পরেন। তবে সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের শহরের অনেক মহিলা যেহেতু সালোয়ার-কামিজ পরতে আরম্ভ করেছেন, তাই বিলেতের অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী বাঙালি মহিলারাও সালোয়ার-কামিজ ধরেছেন। নয়তো প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে শাড়ি পরেই বাইরে যান।

পুরুষদের পোশাক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা সবাই এক ধরনের পোশাক পরেন না, তার মধ্যেও আছে প্রকার ভেদ। বয়স, শিক্ষা, পেশা, আর্থিক অবস্থা



দেশী পোশাকে কয়েকজন বাঙালি বাজার করছেন। হোয়াইটচ্যাপল

ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তাঁরা কী পরেন। যাঁরা শিক্ষিত এবং পেশাদার, কাজে যাওয়ার সময়ে তাঁরা ইংরেজি পোশাকই সাধারণত পরেন। যদিও সবাই স্যুট পরেন না – সেটা বর্তমানে বেশির ভাগ ইংরেজরাও পরেন না। অপর পক্ষে, যাঁরা অল্পশিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত এবং সেই সঙ্গে বয়স্ক, তাঁরা ইংরেজি পোশাকের সঙ্গে দেশী পোশাকের সমন্বয় ঘটান। যেমন, প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবী এবং তার ওপর কোট পরেন। শীত বেশি না-থাকলে কেউ কেউ কেবল পাঞ্জাবীও পরেন। রক্ষণশীল মুসলমানরা অনেকে হাঁটুর নিচ অবধি লম্বা জোব্বা এবং পাজামা পরেন। এঁরা মাথায় দেন গোল টুপি। অর্থাৎ তাঁরা দেশী পোশাকই পরেন, তবে শীতের সময়ে সেটাকে

বিলেতি উপকরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে বাধ্য হন। নীরদ চৌধুরীর মতো চলনে-বলনে, জীবনাচরণে ইংরেজ হয়েছিলেন, এমন বাঙালি খুঁজলে কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু একাধিক সূত্র থেকে শুনেছি, তিনিও নাকি তাঁর ট্রাউজারের তলায় কাছা দিয়ে একটা ধুতি পরতেন।

এটা একটা প্রতীকী দৃষ্টান্ত। বেশির ভাগ বাঙালি নীরদ চৌধুরীর মতো আধুনিক নন। তাই তাঁরা দেশের ঐহিত্যের সঙ্গে অনেক বেশি মাত্রায় বিদেশের মূল্যবোধের মিলন



পুব লন্ডনে কেবল মাত্র চোখ খোলা বোরকা পরা মহিলা।
পেছনে মুখ খোলা বোরকা পরা দুজন।

ঘটাতে চেষ্টা করেন। বরং তার থেকেও সঠিক হবে, যদি বলি যে, তাঁরা দেশের ঐতিহ্যই বজায় রাখতে চেষ্টা করেন, তবে বাধ্য হয়ে কিছু বিদেশী মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি মেনে নেন। এ ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করি আগেকার লস্করদের। লস্কররা এ দেশে এসেই এ দেশের পোশাক পরে দ্রুত সমাজের মধ্যে মিশে যেতে চাইতেন, কিন্তু এখন যেহেতু এখানে বাঙালিদের একটি বড়ো সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সে জন্যে তাঁরা আর বিলেতি পোশাক পরাকে অত্যাবশ্যক বলে গণ্য করেন না। এমন কি, অনেকে বাঙালি সম্প্রদায়ের বাইরে কোনো কাজ করেন না, অথবা যানও না। অপর পক্ষে, তরুণদের কথা আলাদা। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের ওঠা-বসা এবং আদান-প্রদান অনেক বেশি। তাই তাঁদের মধ্যে যাঁরা পেশাদার, তাঁরা আনুষ্ঠানিক

ইংরেজি পোশাক পরেন — অর্থাৎ কাজে যান স্যুট পরে। অন্যরা প্যান্ট-শ্যর্ট-জ্যাকেট পরেন।

স্বদেশে এবং বিদেশে — সর্বত্রই বাঙালি পুরুষদের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় — তাঁরা নিজেরা যতোটাই আধুনিকতা এবং পাশ্চাত্য দিয়ে প্রভাবিত হয়ে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন নিয়ে আসেন না কেন, স্ত্রী এবং কন্যাদের ওপর সেই প্রভাব তাঁরা দেখতে চান না। অথবা অতোটা পশ্চিমা প্রভাব দেখতে চান না তাঁরা। পোশাকের বেলাতে এ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা স্যুট পরে সাহেব হলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু তাঁদের স্ত্রী এবং কন্যাদের স্কার্ট পরতে দেবেন না। অথবা পরলে সেটা তাঁরা পছন্দ করবেন না। এটাকে তাঁরা ধর্ম, সংস্কৃতি এবং নারীর সম্ভ্রম — সব কিছুরই পরিপন্থী বলে গণ্য করেন। নারীদের পোশাকের বেলায় আরও কতোগুলো বিবেচনা কাজ করে। যেমন, পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষা, ধর্ম, চাকরি করেন কিনা, ইত্যাদি।

প্রথমে সংখ্যাগুরু মহিলাদের দিকে তাকানো যাক। তাঁদের মধ্যে যাঁদের বয়স — মোটামুটি চল্লিশের কাছাকাছি অথবা তার চেয়ে বেশি — পোশাকে-আশাকে তাঁরা সবচেয়ে প্রাচীনপন্থী। আগেই বলেছি, শাড়িই তাঁদের প্রধান পোশাক। এর কারণ, তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যশীল। তা ছাড়া, বাড়ির বাইরে তাঁরা কোনো অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িত নন। প্রকাশ্য স্থানে তাঁদের তেমন যেতেও হয় না। সুতরাং শাড়ি পরলে তাঁদের চলাফেরায় কোনো অসুবিধে হয় না। এই মহিলাদের মধ্যে যাঁরা আবার সাম্প্রতিক ইসলামী রক্ষণশীলতা দিয়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁরা বেশির ভাগই বাইরে গেলে বোরকা অথবা হিজাব পরেন। কেউ কেউ এমন বোরকা পরেন, যাতে কেবল তাঁদের চোখ বের করা থাকে।

অন্য দিকে, মহিলাদের মধ্যে যাঁদের বয়স মোটামুটি তিরিশের নিচে তাঁরা কমবেশি শিক্ষিত। কেউ কেউ চাকরিও করেন। এঁরা বাইরে গেলে অনেকেই সালোয়ার-কামিজ, এমন কি, ট্রাউজার-শার্ট পরেন। কারণ, বাস-পাতালরেলে শাড়ি পরে চলাচল করা শক্ত। কিন্তু, ধরা যাক, কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে সাধারণত শাড়ি পরেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা ইসলামী মূল্যবোধ দিয়ে বেশি প্রভাবিত, তাঁরা বোরকা না-হলেও অন্তত হিজাব পরেন। লন্ডনের বাইরের এই বয়সী বাঙালি মহিলাদের মধ্যে হিজাব-বোরকা পরার রীতি কতোটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে, আমার জানা নেই। কিন্তু লন্ডনের বাঙালি পাড়ায় গেলে হিজাব এবং বোরকা দিয়ে বাঙালি মহিলাদের সহজেই চেনা যায়।

এমন কি, স্কুলের ছাত্রীদের পোশাকেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক আট-ন-দশ বছরের মেয়েও অভিভাবকদের কথায় হিজাব পরতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্কুল অথবা কলেজের ছাত্রীরা বাড়ির শাসনে ঐতিহ্যিক পোশাক পরলেও, তাদের অনেকে পশ্চিমা পোশাক পরতে আগ্রহী। তাই বাবামাকে ফাঁকি দিয়ে তাদের অনেকে পশ্চিমা পোশাক পরে বাইরে যায়। আর যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, তারা বেশির ভাগই

নিম্নাঙ্গে ট্রাউজার (এমন কি, আঁটোসাঁটো জীনস), উর্ধ্বাঙ্গে শ্যার্ট এবং মাথায় হিজাব পরে। এই ছাত্রীদের কেউ কেউ মুখ-খোলা বোরকাও পরে। লন্ডনে বোরকার প্রচলন সবচেয়ে বেশি বাঙালি মহিলাদের মধ্যে। বোধ হয় পাকিস্তানীদের তুলনায়ও বেশি। ইসলামের উৎস-ভূমি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা মহিলারাও পোশাকের ব্যাপারে বাঙালি মহিলাদের মতো এতোটা রক্ষণশীল নন।

এবারে দেখা যাক, তথাকথিত সংখ্যালঘু 'ঢাকাই' মহিলারা কী পোশাক পরেন। তাঁরা যে বাংলাদেশী ঐতিহ্য থেকে খুব একটা দূরে সরে গেছেন, তা বলা যায় না। বয়স্করা



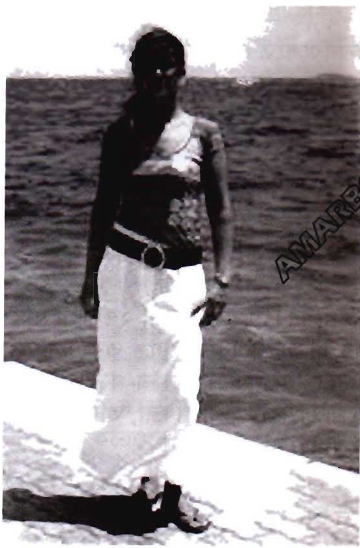
হিজাব-পরা ছাত্রীদের ছবি। ডানদিকের ছাত্রীদের বয়স ১১/১২ বছর। কয়েকটি অবাঙালি ছাত্রীও আছে।

শাড়ি পরেন। তবে তাঁদের অনেকে বাজারঘাট ও কর্মস্থানে সালোয়ার-কামিজ পরেন। অবশ্য সালোয়ার-কামিজ পরলেও এঁরা সাধারণত বোরকা পরেন না, যদিও দু-চারজন হিজাব পরেন। অপর পক্ষে, যাঁরা একটু আধুনিক, তাঁরা ট্রাউজার, এমন কি, কর্মস্থানে স্যুটও পরেন। কেউ কেউ লম্বা স্কার্টও পরেন। সাধারণ বাঙালিরা এঁদের দিকে খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই তাকান। অনেকে এঁদের বাংলাদেশী অথবা মুসলমান বলেও মনে করেন না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি নারীদের পোশাকও কমবেশি ঢাকাই বাঙালি মহিলাদের মতো। বলা বাহুল্য, তাঁরা কখনো হিজাব অথবা বোরকা পরেন না।

ঢাকাই এবং পশ্চিমবঙ্গের তরুণীদের পোশাক সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় যে, তাঁদের মায়েদের তুলনায় তাঁরা আর-একটু আধুনিক। তাঁরা ট্রাউজার তো পরেনই, তা ছাড়া কখনো কখনো স্কার্টও পরেন। কিন্তু বাঙালি তরুণীরা এমন পোশাক কমই পরেন যাতে তাঁদের হাঁটু পর্যন্ত দেখা যায় অথবা বুকের ওপরের দিকটা খোলা থাকে। বাড়িতে এসব ব্যাপারে অল্পবয়স থেকে তাঁরা মায়েদের শিক্ষা এবং শাসনের মধ্যে

মানুষ হন। সুতরাং তাঁরা ঠিক ইংরেজ তরুণীদের মতো হতে পারেন না। এমন কি ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা পুরোপুরি পাশ্চাত্য পোশাক পরতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এই তরুণীদের হিজাব পরতে দেখা যায় না। সিলেটী, ঢাকাই এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি তরুণীদের পোশাক সম্পর্কে আর-একটা ঢালাও মন্তব্য করা যেতে পারে। সে হলো: বিয়ের পরে তাঁদের পোশাকে বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন আসে। অর্থাৎ সে পোশাকে পশ্চিমা প্রভাব হ্রাস পায়। যাঁরা বিয়ের আগে সালোয়ার-কামিজ পরতেন, বিয়ের পরে তাঁরা অনেকে তা বাদ দিয়ে শাড়ি পরেন। বিয়ের আগে যাঁরা ট্রাউজার-শার্ট পরতেন, তাঁরা সালোয়ার-কামিজ এবং শাড়ি পরেন। এ ক্ষেত্রে স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির পছন্দ-অপছন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

বিলেতি বাঙালিদের পোশাক সম্পর্কে বলতে হয় যে, আবহাওয়ার প্রভাব তার ওপর আছে, কিন্তু ধর্মীয় এবং স্বদেশী প্রভাবও তার ওপর কম নয়। সত্যি বলতে কি, বাঙালিয়ানা এই পোশাকে যতোটা লক্ষ্য করা যায়, তার থেকে বেশি প্রভাব হলো ধর্মের। ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করলে, তা স্নো-বল অর্থাৎ বরফের গোলকের মতো যতো গড়িয়ে যায়, ততোই বড়ো হতে থাকে। অর্থাৎ ধর্মের প্রভাবে প্রথমে মাথায় ঘোমটা দিলে, দ্বিতীয় পর্যায়ে হিজাব পরার ইচ্ছে জাগে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বোরকা পরলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকে না। হিন্দুত্বের সঙ্গে পোশাকের যেহেতু বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই, সে জন্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এখন ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেও তার কোনো প্রভাব বিলেতি বাঙালি হিন্দুদের পোশাকের ওপর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বস্তুত, এ দেশে বড়ো হওয়া ভারতীয় তরুণীদের পোশাক আর ইংরেজ তরুণীদের পোশাকে সামান্যই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।



সমুদ্রতীরে একটি ঢাকাই তরুণী

পোশাকের বেলাতেই নয়, বয়স্কদের সঙ্গে কমবয়সীদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যে-ছেলেমেয়েদের জন্ম হয়েছে বিলেতে, তাদের সঙ্গে তাদের পিতামাতাদের মূল্যবোধের পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই ছেলেমেয়েরা এ দেশের স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখেছে, এ দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানুষ

হয়েছে, এ দেশের টেলিভিশনে চিত্রিত জীবনধারা দেখে দেখে বড়ো হয়েছে। ফলে বাড়ির শিক্ষা যেমনই হোক না কেন, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তারা ভিন সংস্কৃতির বহু মূল্যবোধেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এভাবে তাদের চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতার চিন্তাধারা থেকে সরে যায়। কিন্তু বাঙালি পরিবারের সন্তানরা মানুষ হয় পিতামাতার কঠোর শাসন এবং তদারকির মধ্যে। তাই পছন্দ না-হলেও, তারা পারিবারিক মূল্যবোধ অনেকটাই মেনে নয়, বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এর জন্যে আমরা বিলেতে যেসব বাঙালি তরুণ-তরুণী দেখতে পাই, তারা পোশাকে-আশাকে, চলাফেরায় যেমনই হোক না কেন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে খানিকটা বিলেতি, খানিকটা বাঙালি। কতোটা বিলেতি এবং কতোটা বাঙালি তা নির্ভর করে পিতামাতা কতোটা শিক্ষিত এবং কতোটা পশ্চিমা মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়েছেন, তার ওপর। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এই তরুণ-তরুণীরা দুই ভিন সংস্কৃতির মাঝখানে বন্দী। আমরা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

প্রথম দৃষ্টান্ত একটি সিলেটী তরুণীর। জন্ম বিলেতে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে একটা স্কুলের অফিসে কাজ করেন। পোশাকে পুরোপুরি পশ্চিমা। বাড়ির শাসন অগ্রাহ্য করেন। বাড়ি থেকে বিয়ের চাপ থাকলেও, পছন্দ করে বিয়ে করার আশায় আছেন। বিয়ের পরও চাকরি করতে চান। শ্বশুর বাড়ি থেকে কাজ করার অনুমতি না-থাকলে তেমন পাত্রকে বিয়ে করতে চান না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য নেই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একটি ঢাকাই তরুণীর। জন্ম বিলেতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি করে ভালো চাকরি করছেন। কর্মস্থলে স্কার্ট-সহ পশ্চিমা পোশাক পরেন। কিন্তু সালোয়ার-কামিজ, এমন কি, বিশেষ উপলক্ষে শাড়িও পরেন। বিয়ে করেছেন ২৭ বছর বয়সে। পিতামাতা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসার পর পাত্রটিকে নিজে দেখে এবং তার সঙ্গে কয়েক মাস মেলামেশা করে বিয়ে করেছেন। নিয়মিত নামাজ না-পড়লেও, রোজা রাখেন। দেশী-বিদেশী খাবারই সাধারণত খান। কিন্তু হালাল কিনা, তার খবর নেন। উৎসবে অথবা পার্টিতেও কোনো মদ্যপান করেন না।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত আর-একটি ঢাকাই তরুণীর। জন্ম বাংলাদেশে। বাল্যকালে বিলেতে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি করে স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বিয়ে করেছেন প্রেম করে একজন শ্বেতাঙ্গ খৃস্টানকে। নিয়মিত চার্চে যান। পশ্চিমা পোশাক পরেন। তবে বিশেষ উপলক্ষ থাকলে সালোয়ার-কামিজ, এমন কি, শাড়িও পরেন। খাওয়া-দাওয়ায় পশ্চিমা। তবে বাঙালি খাবার পছন্দ করেন। মদ্যপান করেন না।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত এক 'ইন্ডিয়ান' বাঙালির। জন্ম বিলেতে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ডিগ্রি করেছেন। ভালো চাকরি করেন। পোশাকে-আশাকে পুরোপুরি পশ্চিমা। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না। এক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক আছে। তাঁর সঙ্গেই একত্রে বাস করেন। কিন্তু বিয়ে করেননি। পিতামাতার সঙ্গে বাস করেন না। পান-ভোজনে কোনো বাছ-বিচার নেই।

সাধারণভাবে বিবাহের ওপর পশ্চিমা প্রভাব কতোটা পড়েছে, সে সম্পর্কে খানিকটা বুঝিয়ে বলা যেতে পারে। এ দেশের বাঙালি মেয়েরা বিয়ের কতোগুলো দিক সম্পর্কে অংশত ভাবতে শিখেছেন বিলেতের তরুণ-তরুণীদের মতো, আবার পারিবারিক মূল্যবোধও একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। যেমন, পশ্চিমা তরুণ-তরুণীরা ভাবতেও পারেন না যে, তাঁরা প্রেম না-করে বিয়ে করবেন। বস্তুত, বিয়ের আগে প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে তাঁরা মেলামেশা করবেন; তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা বিয়ে করবেন কিনা। বেশির ভাগ সময়ে বিয়ের আগে তাঁদের মধ্যে যৌন-সম্পর্কও গড়ে ওঠে। বিয়ে না-করে অনেক তরুণ-তরুণী বছরের পর বছর একত্রে বাসও করেন।

অপর পক্ষে, বাঙালি তরুণ-তরুণীরা মনে করেন যে, তাঁরা পিতামাতার অনুমতি নিয়েই বিয়ে করবেন। প্রেম করে বিয়ে না-করলেও অন্তত পছন্দ করে বিয়ে করবেন। তাঁরা আরও মনে করেন যে, পাত্র-পাত্রীর বয়সের পার্থক্য কম থাকা উচিত। কিন্তু বাড়ি থেকে এতো বাধা আসে যে, তাঁরা প্রেম করার সুযোগ বড়ো একটা পান না। অন্তত প্রকাশ্যে প্রেম করার উপায় থাকে না। তা সত্ত্বেও যাঁরা বিয়ের আগে প্রেমে পড়েন, তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো বিবাহ-পূর্ব যৌন-সম্পর্ক তৈরি হয়। বাঙালি তরুণীরা পাত্রের চেহারা সম্পর্কেও বেশ সচেতন। তা ছাড়া, তাঁরা মনে করেন যে, পাত্রের নিজস্ব আয় থাকা দরকার এবং ঘরের কাজ ও সন্তান লালন-পালন করতে স্ত্রীকে স্বামী সাহায্য করবেন। কিন্তু কার্যকালে এই তরুণ-তরুণীরা বেশির ভাগই — বিশেষ করে সিলেটীরা — বিয়ে করতে বাধ্য হন পিতামাতার পছন্দ অনুযায়ী। এমন কি, বিয়ের আগে অন্যের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা তা বিসর্জন দিয়ে পাতানো বিয়েকেই মেনে নিতে বাধ্য হন। এ কথা ছেলেদের বেলায় যতোটা সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য মেয়েদের ক্ষেত্রে।

ওদিকে, পিতামাতারা পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর চেয়ে তাদের পারিবারিক মর্যাদার দিকে বেশি লক্ষ্য রাখেন। অনেকেই নিজেদের অঞ্চলের অথবা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে দিতে বেশি আগ্রহ দেখান। এর ফলে বিবাহিত জীবনে প্রায়ই অশান্তি দেখা দেয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই অশান্তির পরিমাণ ছেলেদের তুলনায় বেশি। কারণ, তাঁরা স্কুল-কলেজে নারী তথা স্ত্রীর যে-ভূমিকা এবং মর্যাদার কথা শিখেছেন, চারদিকে এবং টেলিভিশনে প্রেমিক-প্রেমিকা অথবা স্বামী-স্ত্রীর যে-রোম্যান্টিক সম্পর্ক দেখে এসেছেন, বিয়ের পর নিজেদের জীবনে তার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন লক্ষ্য না-করে দারুণ দুঃখিত এবং হতাশ হন।

সন্তানদের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পিতামাতাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো: তাঁরা অনেকে বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার পাত্র অথবা পাত্রীর সঙ্গে নিজেদের মেয়ে অথবা ছেলের বিয়ে দিতে চান। ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময়ে তাঁরা মনে করেন যে, বাংলাদেশ থেকে আনলে সেই পুত্রবধূ ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হবে এবং শ্বশুর-শাশুড়ি ও বর্ধিত পরিবারের সদস্যদের প্রতি বেশি সহনশীল

হবে। কন্যার বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা সম্ভবত এটা ভাবেন না। পাত্রপাত্রী খোঁজার সময়ে তাঁরা বিশেষ করে আত্মীয়দের অথবা নিজেদের অঞ্চলের অভিজাত পরিবারের কথা চিন্তা করেন। এ রকমের পরিবার পেলে তাঁরা খুশি হয়েই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেন।

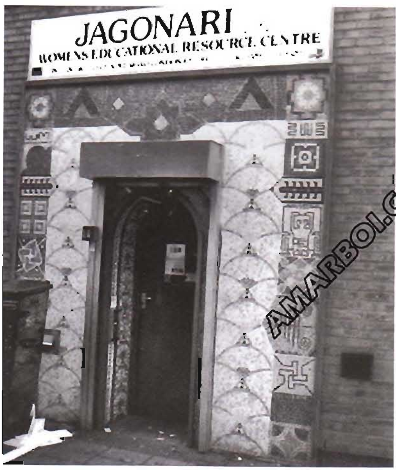
এ ছাড়া, কেউ কেউ টাকাপয়সা নিয়ে ছেলেমেয়েদের মতের তোয়াক্কা না-করে তাদের বিয়ে দেন বাংলাদেশের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে। টাকাপয়সা নেওয়ার এই সুযোগ তাঁরা পান যেহেতু তাঁদের ছেলেমেয়েরা ব্রিটেনের নাগরিক। এ রকমের বিয়ে হলে বাংলাদেশের সেই পুত্রবধূ এবং জামাতাকে তাঁরা ব্রিটেনের নাগরিক করে নিয়ে আসতে পারেন। ওদিকে, বাংলাদেশ থেকে যেহেতু অনেকেই, বিশেষ করে তরুণরা, ব্রিটেনে আসতে খুব আগ্রহী, সুতরাং সেখানকার অভিভাবকরা টাকা দিতে হলেও নিজেদের ছেলেমেয়েকে 'লন্ডনী' পাত্রী অথবা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, বিলেতের নাগরিকত্ব এবং সচ্ছল জীবনের লোভে এ ধরনের বিয়ে হয়ে থাকে। এসব বিয়েতে পাত্রপাত্রীর অসুখী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। কারণ, বিলেতে যে-ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাংলাদেশে বড়ো-হওয়া পাত্রপাত্রীর মূল্যবোধের অনেক সময়ে মিল হয় না, না-হওয়ারই কথা। তা ছাড়া, ভাষার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিরাজ করে।

যে-মেয়েরা বিলেতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বড়ো হয়েছে, তাদের বেলাতে বাংলাদেশ থেকে আনা পাত্রের সঙ্গে অমিল বেশি দেখা যায়। কারণ এই মেয়েরা স্বামী-স্ত্রীর কমবেশি সমান মর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতন। পরিবারে স্বামী-স্ত্রী কে কোন ভূমিকা কতোটা পালন করবে, সে বিষয়ে তাদের প্রত্যাশা এবং বাংলাদেশে মানুষ-হওয়া পাত্রদের প্রত্যাশা এক রকমের নয়। এ ছাড়া, পাত্রপাত্রীর চালচলন, হাসিঠাট্টা, খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক — সবকিছুতেই পার্থক্য থাকায় তাদের মধ্যে সহজে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং বোঝাপড়া হয় না। এসব ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কথাও শোনা যায়। অপর পক্ষে, বাংলাদেশ থেকে পুত্রবধূ আনলে পরিবারে অতোটা সমস্যা দেখা দেয় না। স্ত্রী খুব স্মার্ট নয় এবং ইংরেজি বলতে পারে না — এই অভিযোগ স্বামীর থাকে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রী দাসীর মতো সব আদেশ এবং অত্যাচার মেনে নেয়, অন্তত এ কারণে স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি তার ওপর প্রসন্ন থাকেন। তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত পরিবারে মায়েদের প্রতি পিতাদের স্বার্থপর, রূঢ় এবং কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখেই পুত্ররা মনে মনে সংসারে স্ত্রীর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে। সেটা বাংলাদেশের স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি থেকে বড়ো একটা ভিন্ন রকমের নয়।

একটা প্রতীকী দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা বোঝানো যেতে পারে। বাসে উঠে একটি মাত্র আসন পেলে অনেক বাঙালি স্বামী সেই আসনে বসে পড়েন এবং স্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকেন — এই দৃশ্য বাঙালি পাড়ায় খুব একটা বিরল নয়। কিন্তু এটা ইংরেজ অথবা আদব-কায়দা জানা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো ঘটবে না। তা ছাড়া, কম শিক্ষিত স্বামীরা ঘরের কাজে

স্ত্রীদের সাহায্য খুব কমই করেন। বরং তাঁরা স্ত্রীকে গৃহভৃত্যের মতোই দেখতে চান। স্বামী রেস্টুরেন্ট থেকে রাত বারোটা-একটা যখনই ফিরে আসেন না কেন, তাঁরা আশা করেন স্ত্রীরা তাঁদের জন্যে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকবেন।

প্রসঙ্গত আরও এক ধরনের বিয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হলে অথবা স্ত্রী মারা গেলে, অনেক সময়ে অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত (পঞ্চাশ / ষাট বছর অথবা তার চেয়েও বেশি বয়স্ক) পুরুষরা দেশে গিয়ে আর-একটা বিয়ে করে আনেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে কোনো বয়স্ক মহিলাকে বিয়ে করেন না, বরং তরুণীকেই বিয়ে করেন। তরুণীর পিতামাতাকে কিছু টাকা দিলে অথবা এক খণ্ড জমি লিখে দিলেও তাঁরা মেয়েকে বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে সহজেই রাজি হয়ে যান। এ ক্ষেত্রে সেই তরুণীর একমাত্র সান্ত্বনা থাকে এই যে, তিনি ব্রিটেনে থাকতে পারবেন এবং সেখানকার সচ্ছল জীবনের স্বাদ পাবেন।



জাগোনারী কেন্দ্র

মোট কথা, অল্পশিক্ষিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আদর্শ স্থানীয় নয়। তাঁদের মধ্যে, বিশেষ করে, মহিলাদের মধ্যে যথেষ্ট মানসিক অশান্তি থাকে। *Women in Transition* গ্রন্থে বাংলাদেশী যে-মহিলাদের জরিপ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, তাঁরা অধিকাংশই অসুখী। এই গ্রন্থের গবেষকরা ৯৯জন মহিলাকে প্রশ্ন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৪২জন মনে করেন যে, তাঁরা বেশি চাপের মুখে আছেন; ৩৫জন মনে করেন যে, তাঁরা অসুখী অথবা মানসিকভাবে বিষণ্ণ; ৩২জন মনে করেন যে, তাঁরা নিজেদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন এবং ২২জন মনে করেন যে, তাঁরা অপদার্থ — কোনো কাজের উপযুক্ত নন।

বস্তুত, যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, সে মহিলারা তুলনামূলকভাবে বেশি অসুখী। দেশে আত্মীয়-স্বজন এবং চির-পরিচিত পরিবেশ ফেলে আসায় তাঁরা মানসিকভাবে রীতিমতো সংকটের মধ্যে বাস করেন। স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা রকমের টানাপোড়েনের মধ্যে থাকেন তাঁরা। এর পেছনে কেবল বয়স এবং মূল্যবোধের পার্থক্যই কাজ করে না, বাংলাদেশ থেকে আসা মহিলাদের ইংরেজি

ভাষা না-জানাও একটা বড়ো কারণ। অনেকে কেবল ইংরেজি নয়, কোনো লেখাপড়াই জানেন না। এই মহিলাদের ইংরেজি এবং বিলেতি সংস্কৃতি সম্পর্কে খানিকটা শিক্ষা দানের জন্যে স্থানীয় সরকারের তরফ থেকে চেষ্টা চালানো হয়। সরকারী আনুকূল্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে, যেমন জাগোনারী কেন্দ্র। কিন্তু এসব জায়গায় তাঁরা দু-চারটি ইংরেজি বাক্য শিখলেও, অন্যদের কাছে কার্যকরভাবে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করার মতো শিক্ষা লাভ করেন না। ফলে ঘুরে-ফিরে তাঁদের বাঙালি পড়শির সঙ্গেই সুখদুঃখ নিয়ে আলাপ করতে হয়। ডাক্তার, হাসপাতাল, বেনিফিট অফিস, ব্যাংক ইত্যাদি জায়গায় যেতে হলে কোনো সন্তানকে নিয়ে যেতে হয় দোভাষী হিশেবে। তা দিয়ে কাজ চালানো যায়, কিন্তু অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিজের দুঃখ লাঘব করা অথবা আনন্দ লাভ করা যায় না। এ জীবন আদর্শ জীবন নয়।

মনিকা আলির *Brick Lane* উপন্যাস সম্পর্কে পুব লন্ডনের বাংলাদেশীরা অনেকেই প্রতিকূল মনোভাব দেখিয়েছেন, এমন কি, কেউ কেউ বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। কিন্তু নাজনীনের যে-চিত্র লেখিকা অঙ্কন করেছেন, তা কল্পিত হলেও আদৌ অবাস্তব নয়। মনিকা আলি খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই অন্তঃপুরের বাঙালি নারীদের ছবি তুলে ধরেছেন। এই নারীরা যে-প্রেমহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন, তা অগ্রহণযোগ্য। সম্ভবত বেঁচে থাকার অনুপযুক্ত। তাঁদের কোনো সামাজিক জীবন নেই। এমন কি, পারিবারিক জীবনেও তাঁদের তাৎপর্যপূর্ণ অথবা মর্যাদাপূর্ণ কোনো ভূমিকা নেই। বাস্তবের সঙ্গে মনিকা আলির নায়িকার পার্থক্য এই যে, নাজনীন শেষ পর্যন্ত নিজেকে একজন ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ মহিলাই নিজেদের শেষ পর্যন্ত "অপদার্থ" বলেই বিবেচনা করেন। আত্মবিশ্বাস অথবা জীবনে পরিপূর্ণতার স্বাদ — কোনোটাই লাভ করেন না তাঁরা।

বিবাহ প্রসঙ্গে আরও দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কম শিক্ষিত পরিবারে ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয় কম বয়সে। আগে অনেক সময় মেয়েদের বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে ষোলো বছরেরও কম বয়সে বিয়ে দেওয়া হতো। কিন্তু এখন সাধারণত স্কুল ত্যাগের পরে অর্থাৎ ষোলো বছর অথবা তার থেকে কিঞ্চিৎ বেশি বয়সে বিয়ে হয়। অপর পক্ষে, ছেলেদের বিয়ে হয় তাঁদের বয়স বিশের কোঠায় পৌঁছানোর পরে। এসব পরিবারের বিয়ের প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: স্ত্রী শিক্ষিত হলেও স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি সচরাচর তাঁদের বাইরে চাকরি করতে দেন না। যে-তরুণীরা বিয়ের আগে কাজ করেছেন, তাঁদের বেলাতেও এমনটা ঘটে। অন্যদিকে, একবার চার দেওয়ালের বাইরের যে-জীবন, সেই জীবনের স্বাদ পাওয়ায়, গৃহবন্দী এই তরুণীরা স্বাভাবিকভাবেই অসুখী হন। স্ত্রীর নিজস্ব আয় থাকলে সেই স্ত্রী স্বাধীনচেতা হবেন, সংসারের সব কাজ করার সময় পাবেন না এবং শ্বশুর-শাশুড়ি ও সন্তানের যত্ন নিতে পারবেন না — এসব ধারণা থেকেই সাধারণত এঁদের কাজ করতে দেওয়া হয় না।

বিয়ের ব্যাপারে সামান্য শিক্ষিত পরিবারগুলোর সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত পরিবারগুলোর পার্থক্য খুবই চোখে পড়ার মতো। প্রথম পার্থক্যই হলো বিয়ের বয়সে এবং পছন্দে।

এসব পরিবারে সাধারণত শিক্ষিত ছেলেমেয়ের পছন্দের মূল্য দেওয়া হয়। এবং মূল্য দেওয়া হয় বলেই অনেক সময়ে তাঁদের বিয়ে হয় বেশি বয়সে। বিশেষ করে শিক্ষিত কন্যাদের ক্ষেত্রে এটা কখনো কখনো একটা বড়ো সমস্যায় পরিণত হয়। তার কারণ, এক দিকে তাঁরা পরিবারের শিক্ষা ও শাসনের ফলে প্রেম করার সুযোগ পাননি, অন্যদিকে প্রেম না-করে পাতানো বিয়ে করতেও তাঁদের আপত্তি থাকে। পাতানো বিয়েতে ছেলেদেরও আপত্তি থাকে। ফলে অনেক ছেলেমেয়ে তিরিশের কোঠায় পৌঁছেও অবিবাহিত থাকেন। মেয়েদের কারো কারো বিয়েই হয় না। তবে এঁদের সংখ্যা খুবই কম।

এসব শিক্ষিত পরিবারে চাকরি করার জন্যে স্ত্রীদের উৎসাহিত করা হয়। কারণ, স্ত্রী বাড়তি আয় করলে সংসারে সচ্ছলতা আসে। শিক্ষিত স্ত্রীরাও ঘরে বসে থাকতে চান না। স্বামীরা অবশ্য সংসারের সচ্ছলতার কথা যতোটা ভাবেন, ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার কথা ততোটা বিবেচনা করেন না। ফলে এ ধরনের পরিবারে স্ত্রীদের সারা দিন চাকরি এবং বাড়িতে ফিরে সন্ধেবেলায় ঘরের কাজ — উভয়ই করতে হয়। এসব পরিবারে সাধারণত দেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয় না। তবে কোনো ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়।

প্রসঙ্গত বাঙালি পরিবারের কাঠামো সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও এক দিকে সিলেটী এবং অন্য দিকে ঢাকাই ও ভারতীয় বাঙালিদের পরিবারে বড়ো রকমের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বেশির ভাগ সিলেটী পরিবার হলো বর্ধিত পরিবার। এসব পরিবারে পিতামাতার সঙ্গে কেবল অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে বাস করে না, বরং বিবাহিত পুত্রও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করেন। তবে বিবাহিত ভাইরা সাধারণত একত্রে বসবাস করেন না। অন্তত যূথবদ্ধ হয়ে বাস করার যে-মনোভাব পাকিস্তানীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, বাঙালিদের মধ্যে তা অতোটা প্রবল নয়।

অপর পক্ষে, ঢাকাই এবং ভারতীয় শিক্ষিত বাঙালিদের পরিবারে অবিবাহিত পুত্রকন্যা সাধারণত পিতামাতার সঙ্গে একত্রে বাস করলেও বিয়ের পরে আর একত্রে বাস করেন না। বর্ধিত পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সন্তানদের লালন-পালন এবং প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কাজে পুত্রবধূদের স্বাধীনতা অনেক কম থাকে। চাকরি করার অধিকার প্রায় থাকেই না। এমন কি, পুত্রদের স্বাধীনতাও তুলনামূলকভাবে কম থাকে। এসবের জন্যে এই ধরনের পরিবারে মাঝেমধ্যে অশান্তি দেখা দেয়। এমন কি, পিতামাতাদের হস্তক্ষেপের ফলে পুত্র এবং পুত্রবধূর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হয়। এ জন্যে তরুণ-তরুণীরা ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পিতামাতার কাছ থেকে সরে গিয়ে স্বাধীনভাবে সংসার করতে চান। তবে রক্ষণশীল পরিবারে সেটা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না।

কেবল বিয়ে এবং পরিবারের গঠন নিয়েই যে বিলেতি বাঙালিরা দুই মূল্যবোধের মাঝখানে আটকা পড়েছেন, তা নয়। তাঁদের জীবনযাত্রা এবং চিন্তাধারা — সর্বত্রই কমবেশি এই আপোশ লক্ষ্য করা যায়। সে অর্থে তাঁরা দীর্ঘকাল পশ্চিমে বাস করেও

সত্যিকার পশ্চিমা মূল্যবোধে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। তাঁদের বহু মূল্যবোধ আগের মতোই রয়ে গেছে অথবা পিতামাতার কাছ থেকে তরুণ-তরুণীরাও সেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন।

যেমন, পশ্চিমা সভ্যতার একটা বড়ো দিকই হলো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। প্রত্যেকেই নিজেদের বিবেচনা করেন আলাদা-আলাদা ব্যক্তি হিশেবে। তাঁদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন এবং গোষ্ঠী-চেতনা বাঙালিদের মতো প্রবল থাকে না। ফলে, ধরা যাক, সন্তানের সিদ্ধান্ত সন্তানই গ্রহণ করে, তাদের সিদ্ধান্ত পিতামাতা গ্রহণ করেন না — কী পড়বে, কী কাজ করবে, কী পোশাক পরবে, কাকে বিয়ে করবে, কখন বাড়িতে ফিরবে, কার সঙ্গে মেলামেশা করবে -- সব ব্যাপারেই। অপর পক্ষে, এসব বিষয়ে এখনো বাঙালি পিতামাতা নাক গলান, এমন কি, সন্তানদের ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন। কিন্তু সন্তানরা যেহেতু জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিলেতের জীবন এবং মূল্যবোধ দিয়ে অনেকটাই প্রভাবিত হয়, সে জন্যে পিতামাতাদের সঙ্গে তাদের ঠিক বোঝাপড়া হয় না। অনেক সময়ে পরিবারের ভেতরে এ নিয়ে অশান্তি বিরাজ করে।

স্বদেশ থেকে এতো দূরে বাস করলেও, বাঙালিদের মধ্যে আঞ্চলিকতাও বেশ প্রবল। সে জন্যে ফরিদপুরের লোকেরা বন্ধু হিশেবে ফরিদপুরের লোক খোঁজেন। বাংলাদেশীরা বাংলাদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন। এই আঞ্চলিকতা এতোটাই প্রবল যে-সিলেটের লোকেরা সিলেটের মধ্যেই আবার কে মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, এমন কি, কে কোন গ্রামের — তাও খোঁজ করেন এবং একেবারে নিজেদের অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ জন্যেই বাঙালিরা সুদূর বিলেতে এসেও নোয়াখালি সমিতি, চট্টগ্রাম সমিতি, সুনামগঞ্জ সমিতি স্থাপন করেন। তবে এসব সমিতির মধ্যেও রীতিমতো দলাদলি চলে।

আঞ্চলিকতার আর-একটা প্রমাণ হলো এই যে, বাঙালিরা কেবল নিজের নিজের এলাকার লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করেন না, অন্য অঞ্চল এবং দেশের লোকেদেরও এড়িয়ে চলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা বছরের পর বছর বিলেতে বাস করলেও বিলেতের লোকেদের সঙ্গে কর্মস্থানে ছাড়া তাঁদের সামাজিক কোনো সম্পর্ক অথবা ওঠা-বসা চলে না। ব্যতিক্রম যা আছে, তা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। তাঁরা এক সঙ্গে লেখাপড়া করতে গিয়ে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে দু-একটা বিয়েও হচ্ছে। কিন্তু বয়স্করা সযত্নে ইংরেজদের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। ইংরেজের বাড়িতে বাঙালির নিমন্ত্রণ অথবা বাঙালির বাড়িতে ইংরেজের নিমন্ত্রণ কালেভদ্রে হয়। কর্মস্থানেও সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বলে মনে হয় না।

এর কারণ কেবল বর্ণবাদ নয়। চারদিকে প্রচুর বাঙালি থাকায় তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকেই বন্ধু খুঁজে নেন। তা ছাড়া, বাঙালিরা নিজেদের বাঙালি বলেই বিবেচনা করেন, বিলেতে বহু বছর থাকলেও অথবা ব্রিটেনের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের ঠিক ব্রিটিশ বলে ভাবতে পারেন না। যতো আগেই তাঁরা এ দেশে এসে থাকেন না

কেন, যে-দেশ থেকে এসেছিলেন, এখনো নিজেদের সে দেশের লোক বলেই গণ্য করেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলে এটা বোঝানো একটু সহজ হবে।

ধরা যাক, যখন ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা হয়, তখন ভারতীয় বাঙালিরা ভারতকেই সমর্থন জানান। আর যখন পাকিস্তানের সঙ্গে ইংল্যান্ডের খেলা হয়, তখন ইংল্যান্ডকে সমর্থন করেন। অপর পক্ষে, বাংলাদেশী বাঙালিরা ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের খেলায় বেশির ভাগই ইংল্যান্ডকে সমর্থন করেন। আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলায় ইংল্যান্ডকে সমর্থন না-করে বরং পাকিস্তানের পক্ষ নেন। যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ইংল্যান্ডের খেলা হয়, তখনও বেশির ভাগ বাঙালি সমর্থন করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এটার কারণ আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় অথবা ধর্মীয় পরিচয় নয়, এর মূলে আছে বর্ণবাদী মনোভাব। আমি এমন লোকও দেখেছি, যাঁরা বহু কষ্টে ব্রিটেনের নাগরিক হয়ে তারপর ইংল্যান্ডের বদলে অস্ট্রেলিয়াকে সমর্থন করেন। ব্রিটেনের নাগরিক হলেও অনেকের মনেই ব্রিটেন সম্পর্কে একটা বিদ্বেষ আছে। এক কথায় বলা যায়, বয়স্ক বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই এ দেশে দীর্ঘকাল বাস করলেও কিছুতেই নিজেদের এই দেশের সঙ্গে মেলাতে পারেন না।

অপর পক্ষে, তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জীবনযাত্রা এবং স্বরূপের প্রশ্নে এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাব তুলনামূলকভাবে কম। তাঁরা এ দেশে জন্মেছেন অথবা ছোটোকাল থেকে এ দেশে বাস করছেন, সুতরাং তাঁরা ব্রিটিশ — এ চেতনা তাঁদের মধ্যে পরিষ্কার। কিন্তু অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা যতোটা ব্রিটিশ, ব্রিটিশ পরিচয় নিয়ে তাঁদের সে ধরনের গর্ব নেই। অর্থাৎ অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা নিজেদের ব্রিটিশ বলে দাবি এবং জাহির করবেন, কিন্তু একজন ইংরেজ যেমন ব্রিটেন নিয়ে গর্ব করেন, একজন বাঙালি তা করেন না। তাঁদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব কাজ করে বিশেষ করে তাঁরা যখন ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের দেখেন। ব্রিটেনের তাবৎ মুসলমান সম্পর্কেই এ কথা প্রায় ঢালাওভাবে বলা যায়। তাঁরা পাকিস্তানী, বাংলাদেশী, সোমালিয়ান অথবা ইরানী — যা-ই হন না কেন, তাঁদের মুসলমানী স্বরূপ সম্পর্কে তাঁরা কেবল সচেতন নন, বরং এ ব্যাপারে রীতিমতো আপোশহীন মনোভাব পোষণ করেন এবং এটাকেই তাঁদের প্রথম ও প্রধান পরিচয় বলে বিবেচনা করেন।

যেমন, ব্রিটেন যদি মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ইসলামী দেশের সঙ্গে বিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ে, তা হলে ব্রিটিশ মুসলমানরা প্রায় সবাই 'নিজের দেশের' অর্থাৎ ব্রিটেনের কথা ভুলে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সেই দেশেরই পক্ষ নেবেন। এ ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণীদেরও বাদ দেওয়া যায় না। এর প্রধান কারণ, রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের চেয়ে তাঁদের ধর্মীয় স্বরূপ অনেক বেশি শক্তিশালী। প্যান-ইসলামিক ভাবনা ছাড়াও, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, বৈষম্যমূলক নীতি এবং সেই নীতির প্রতি ব্রিটেনের অন্ধ সমর্থন এই তরুণ-তরুণীদের ধর্মীয় স্বরূপকে ইদানীং জোরদার করতে সাহায্য করেছে। ব্রিটেনে জঙ্গী ইসলামের উত্থানের কারণ এটাই। এর ফলে ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ এবং সেখানে বড়ো হয়ে ওঠার পরও তাঁরা মুসলিম পরিচয়কেই

আঁকড়ে থাকেন। তাঁদের পাসপোর্ট যে-দেশেরই হোক না কেন, তাঁরা মনের দিক দিয়ে সত্যিকার ব্রিটিশ নয়।

বাঙালিদের মধ্যে বর্ণবাদী মনোভাবও বেশ জোরালো। শ্বেতাঙ্গদের তাঁরা পছন্দ না-করলেও, অন্তত সমীহ ও খাতির করেন; কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের তাঁরা রীতিমতো ছোটো মনে করেন, এমন কি, ঘৃণা করেন। বিবাহের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা বোঝানো যেতে পারে। সন্তান ইংরেজ বিয়ে করছে — এটাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ না-করলেও শিক্ষিত পিতামাতারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটাকে মেনে নেন, বিশেষত পুত্র শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করলে। এ ক্ষেত্রে পিতামাতা অবশ্য চাইবেন যে, পাত্র অথবা পাত্রী নামে মাত্র হলেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবেন। অপর পক্ষে, সন্তান কোনো কৃষ্ণাঙ্গকে বিয়ে করতে চাইলে সে প্রস্তাবকে তাঁরা কখনোই অনুমোদন করবেন না। প্রসঙ্গত উত্তর ইংল্যান্ডের লিভারপুলে কয়েক বছর আগে ঘটেছিলো, এমন একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এখানকার এক বাঙালি মেয়ে এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের প্রেমে পড়েছিলো। বিয়ে করতে চেয়েছিলো কিনা, জানা যায় না। কিন্তু কথাটা পরিবারের কাছে প্রকাশ পেলে পিতা সেই কন্যার গলা কেটে তাকে হত্যা করেন। সাম্প্রতিক কালে একটি পাকিস্তানী পরিবারেও এ ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। প্রেম করার অপরাধে পিতা এবং বয়স্ক পুত্ররা মিলে সে পরিবারের একমাত্র কন্যাকে হত্যা করেছেন। এটা কেবল বর্ণবিদ্বেষ প্রমাণ করে না, সেই সঙ্গে প্রমাণ করে এ ধরনের পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার কতো অভাব।

বর্ণবাদী হামলায় ব্যারিস্টার রেজা আহত



লন্ডন, ৩১ অক্টোবর – ব্যারিস্টার আবু রেজা বর্ণবাদী হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গত ৫ অক্টোবর রাতে ক্যামব্রীজ থেকে লিভারপুল স্টেশনগামী ট্রেনে এ ঘটনা ঘটে। রাত ৯.৫১ মিনিটে রেজা ট্রেনে চড়েন ক্যামব্রীজ থেকে। ট্রেনটি স্টেনস্টিড

৫৯ পৃষ্ঠায়

বর্ণবাদী মনোভাব বাঙালিদের মধ্যে এতো জোরালো হওয়ার কারণ কেবল নৃতাত্ত্বিক নয়, এর পেছনে আরও একটা কারণ হলো তাঁরা ব্রিটেনে বাস করেন একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিশেবে। সংখ্যাগুরু ইংরেজদের কাছ থেকে অনেক সময় তাঁদের যথেষ্ট প্রতিকূলতা এবং কখনো কখনো বৈষম্য সহ্য করতে হয় অথবা অতীতে করতে হয়েছে। বর্ণবাদ কখনো কখনো সহিংসতারও

জন্ম দিয়েছে। খুন-জখমের ঘটনাও ঘটেছে। এখনো মাঝেমধ্যে শ্বেতাঙ্গ দলের সঙ্গে বাঙালি দলের সহিংসতা ঘটে। গত কয়েক বছরে কয়েকজন নিহতও হয়েছেন। এভাবেই নিহত হয়েছিলেন আলতাফ আলি। তাঁর নামে পুব লন্ডনের একটি পার্কের নামকরণ করা হয়। বর্ণবাদের ফলে যে-কোনো দেশে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে পরিচয়ের যে-সংকট থাকে, বাঙালিদের মধ্যে তা পুরোপুরিই দেখা দিয়েছে।

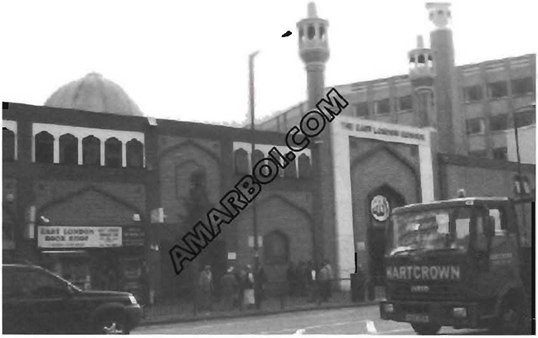
বয়স্করা অনেকটা নীরবে এই বর্ণবাদী মনোভাব মেনে নেন। কোনো রকম সহিংসতার মধ্যে তাঁরা যেতে চান না অথবা যেতে ভয় পান। কিন্তু বেকার এবং সামান্য শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে এই মনোভাব একটা গ্যাং কালচারের জন্ম দিয়েছে। তাদের পোশাক-আশাক, চাল-চলন, চুল ছাঁটা, কথাবার্তা সবকিছুর মধ্যেই এই গ্যাং কালচারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এরা আচার-আচরণে অনেকটা অ্যাফ্রো-কেরিবিয়ান গ্যাঙের অনুকরণ করে। এটা কেবল লন্ডনেই সীমাবদ্ধ নেই। অন্য বড়ো শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে। এই তরুণরা অনেকে চাকু নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কখনো কখনো সহিংসতায় জড়িয়ে পড়ে। বেকার এবং স্বল্প-শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে মাদক-সেবন এবং অন্যান্য অসামাজিক কর্মকাণ্ডের কথাও পত্রপত্রিকা থেকে মাঝেমধ্যে শোনা যায়।

লন্ডন-সহ বড়ো নগরীগুলোতে বাঙালিদের সংখ্যা বেশি বলে এসব জায়গায় তাঁদের মধ্যে সংগঠিত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। এসবের মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে নাচ-গান, নাটক, চলচ্চিত্র প্রদর্শন — সবই আছে। হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক কম হলেও, এক লন্ডনেই বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায়, ১৯৬৩ সাল থেকে এখানে দুর্গাপূজা পালিত হচ্ছে। অন্য কোনো পুজো সমবেতভাবে পালন করা হয় বলে শোনা যায় না। তবে বাড়িতে বাড়িতে কিছু পুজো হয়তো পালিত হয়। অন্তত বাড়িতে অনেকেই তাঁদের আরাধ্য দেবীর মূর্তি রাখেন।

ইসলাম ধর্মে সমবেতভাবে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করা হয়। দুজন হলেও তাঁরা সমবেতভাবে প্রার্থনা করেন। এর একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি এবনে মা-জ লিখিত একটি পুরোনো পুস্তিকা থেকে। *বিলাতি মোসলমান অর্থাৎ ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিভারপুল নগরীর নবদীক্ষিত মোসলমানগণের বিশেষ বিবরণ* (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৬) নামে এই রচনায় এবনে মা-জ দাবি করেছেন যে, ১৬ই জুন ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত লিভারপুলে শেখ আবদুল্লাহ নামে মাত্র একজন মুসলমান ছিলেন। ১৭ই জুন আর-একজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপরের মাসেই মাত্র তিনজন মুসলমান নিয়ে সেই নগরীর প্রথম মুসলিম সমিতি গঠিত হয়। মুসলমানরা বিধর্মীদের মধ্যে তাঁদের ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়াকে বিশেষ পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করেন এবং তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধনও খুবই জোরালো। তা ছাড়া, তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসকেও বারবার প্রচারের মাধ্যমে মজবুত রাখার প্রয়াস পান। ২০০১ সালের লোকগণনার হিশেব অনুযায়ী ব্রিটেনে নানা দেশের প্রায় ষোলো লাখ মুসলমান আছেন। এদের মধ্যে পাকিস্তানী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাত লাখ, বাংলাদেশের দু লাখ ষাট হাজার

এবং ভারতের এক লাখ বত্রিশ হাজার। লন্ডনে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে আবার পুব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এবং নিউহ্যামেই সবচেয়ে বেশি মুসলমান বাস করেন।

মুসলমানরা ব্রিটেনের মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২.৬ ভাগ। কিন্তু তাঁরা খুবই সঙ্ঘবদ্ধ। ব্রিটেনে প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়েছিলো ১৮৮৯ সালে। এ মসজিদ ছিলো লন্ডনের বাইরে। কিন্তু এখন খোদ লন্ডনেই মুসলমান-প্রধান এলাকায় অনেকগুলো মসজিদ তৈরি হয়েছে। একটি সূত্রের দাবি অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় এক হাজার



পুব লন্ডনের প্রধান মসজিদ—ঈস্ট লন্ডন মস্ক। পুব লন্ডনের পুরোনো মসজিদ স্থাপিত হয়েছিলো ১৯৪০-এর দশকে।

মসজিদ আছে। কোনো কোনো মসজিদে কেবল প্রার্থনা করা হয় না, সেই সঙ্গে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং ধর্মীয়-রাজনীতিও প্রচার করা হয়।

লন্ডনে বাঙালি মুসলমানরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন রীতিমতো উৎসাহ ও আড়ম্বরের সঙ্গে। লন্ডন এবং অন্যান্য নগরীতে তো বটেই, ছোটো শহরগুলোতেও তাঁরা সমবেতভাবে ঈদের মতো ধর্মীয় উৎসব পালন করেন। তা ছাড়া, এখন অনেকে কোরবানি দেন। নিজেদের বাড়িতে পশু হত্যার আইন নেই বলে এসব কোরবানি দেওয়া হয় বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে — কোনো কম্পেনির উদ্যোগে। কোরবানির আগে থেকেই মুদির দোকানে কোরবানি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। রোজার পরে এবং কোরবানির সময়ে ঈদের নমাজ পড়ার জন্যে কেবল বাঙালি পাড়ার

মসজিদে সমাবেশ করা হয় না, লন্ডনের মতো বড়ো নগরীতে কোনো কোনো মসজিদে বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা সমবেত হয়ে নামাজ পড়েন।

মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দুরা এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলমানরা সাধারণত যোগ দেন না। যদিও কয়েক দশক আগে যখন বাঙালিদের সংখ্যা কম ছিলো, তখন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এসব ব্যাপারে পারস্পরিক আদান-প্রদান হতো বলে ক্যারোলাইন অ্যাডামসের গ্রন্থে সংগৃহীত সাক্ষাৎকারে আগেকার অভিবাসীরা উল্লেখ করেছেন। তখন হিন্দুরা দুর্গাপূজা পালন করতে আরম্ভ করেননি, কিন্তু মুসলমানরা ঈদ উদ্‌যাপন করতেন। পূর্ব লন্ডন মসজিদের সেই ঈদ উৎসবে হিন্দুরাও নিমন্ত্রিত হতেন এবং একত্রে খাওয়া-দাওয়া করতেন। যেসব জায়গায় বাঙালিদের সংখ্যা বেশি নয়, সেসব জায়গাতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আন্তঃসাম্প্রদায়িক যোগাযোগ বেশি। একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি বার্লিনের। সেখানে বাঙালিদের সংখ্যা কম। সে কারণে দুর্গাপূজায় মুসলমানরা এবং ঈদে হিন্দুদের উপস্থিতি এবং সহযোগিতা খুবই লক্ষ্য করা যায়। রোমে বাঙালির সংখ্যা বার্লিনের তুলনায় অনেক বেশি। তবে এই বাঙালিরা বিলেতের বাঙালিদের মতো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে সেখানে বাস করেননি। তাঁদের মধ্যে এখনো পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সহযোগিতা যথেষ্ট বেশি। সেটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও প্রতিফলিত হয়।

বাঙালিরা কখনো কখনো নাচ-গানের বড়ো রকমের কনসার্টের আয়োজন করেন। এসব অনুষ্ঠানে যেহেতু বাংলাদেশ, এমন কি কখনো কখনো কলকাতা থেকে শিল্পী নিয়ে আসা হয়, সে কারণে অনেক টাকাপয়সা ব্যয় করতে হয়। সিলেটের বাঙালিদের ওপর ভরসা করেই এসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ তাঁরা দলে দলে টিকিট না-কিনলে বেশি টাকা তোলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও টেগোরিয়ান্স, টেগোর সেন্টার, ভারতীয় বিদ্যাভবন অথবা নেহরু সেন্টারের মতো প্রতিষ্ঠানের নামে মাঝেমধ্যে নাচ-গানের আসর করেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় সাধারণত টিকিট বিক্রি করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিম বাংলা থেকেই শিল্পী নিয়ে আসেন। বাংলাদেশ থেকে আনেন না, আনলে কালেভদ্রে। কোনো শিল্পী বিলেতে বেড়াতে এলে শিক্ষিত বাঙালিরা তাঁদের বাড়িতে চাঁদা দিয়ে এসব গায়ক-গায়িকা অথবা শিল্পীদের নিয়ে আসর করেন। পশ্চিম বাংলা থেকে নাম-করা অভিনেতা / অভিনেত্রীরাও কখনো কখনো এ দেশে এসে নাটক অথবা নাট্যাংশ প্রদর্শন করেন। প্রবাসীরা নিজেরাও বিশেষ করে লন্ডনে মাঝেমধ্যে নাটক মঞ্চস্থ করেন অথবা নাচ-গানের আসর করেন। সিনেমা হল ভাড়া করে কখনো কখনো বাংলা চলচ্চিত্রও দেখানো হয়। মোট কথা, দেশ থেকে এতো দূরে বাস করলেও বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সারা বছরই কিছু না কিছু চলতে থাকে।

জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিতে রাত বারোটা এক মিনিটে শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া-সহ দিনের বেলা আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান — সবই করা

হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পুব লন্ডনে আলতাফ আলি পার্কে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় কাউন্সিলের উদ্যোগে। একুশে ফেব্রুয়ারি অথবা অন্য কোনো উপলক্ষে যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয়, সেসব করা হয় সাধারণত শনি-রবিবার। তাতে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকে। এই নাচ-গানে অংশ নেন সাধারণত স্থানীয় শিল্পীরা, এমন কি, শিশুরা। অনেক সময়ে এই শিশুদের দক্ষতা দেখানোর জন্যেই পিতামাতারা তাদের এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসেন।

পয়লা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারির মতো সেক্যুলার উৎসবে বাংলাদেশের হিন্দু এবং মুসলমানরা একত্রিত হন। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা এসব উৎসব পালন



পুব লন্ডনের আলতাফ আলি পার্কে শহীদ মিনার

করেন না, অথবা বাংলাদেশীদের সঙ্গে এসব উৎসব উপলক্ষে একত্রিতও হন না। প্রবাসী বাংলাদেশী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী স্বরূপ ক্রমশ [illegible]ার হতে থাকলেও, পয়লা বৈশাখ এবং একুশে ফেব্রুয়ারি মতো উৎসব পালনের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। বরং এসব অনুষ্ঠানের সংখ্যা এবং তাতে অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে লন্ডনে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে খুবই হৈচৈ করে এবং ক্রমবর্ধমান উৎসাহের সঙ্গে। এ উপলক্ষে যে-বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হাজার হাজার নরনারী অংশ গ্রহণ করেন। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ নাচ-গানের আসর। এই নাচ-গান

বিশুদ্ধ নাচ-গানই, তাতে ধর্মীয় কোনো প্রক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না। এই নাচ-গানের অনুষ্ঠানের জন্যে বাংলাদেশ থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসা হয় — সেটা থাকে একটা বাড়তি আকর্ষণ। এ রকম অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় পুরুষ এবং মহিলারা উভয়ই পোশাকে কিছু বাড়তি বাঙালিয়ানার প্রকাশ ঘটান। বোরকা-পরা নারীও এসব অনুষ্ঠানে কমই দেখা যায়।

বৈশাখী মেলায় নানা রকমের দোকান সাজিয়ে বসেন অনেকে। এসব দোকানে খাবার জিনিশ থেকে আরম্ভ করে বইপত্র, হস্তশিল্প, — নানা রকমের পণ্য বিক্রি হয়। এবং বিক্রি যাই হোক, তরুণ-তরুণী, শিশু, এমন কি, প্রৌঢ়রা যোগ দেন। বৃদ্ধদের কমই দেখা যায়। বৈশাখী মেলা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, তা আর কেবল লন্ডনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের অন্য জায়গাতেও পালিত হচ্ছে।



লন্ডনে বৈশাখী মেলা

বৈশাখী মেলা প্রথমে শুরু হয়েছিলো বাঙালি পাড়া ব্রিক লেইন অঞ্চলে। কিন্তু পয়লা বৈশাখ পালন করার উৎসব আরম্ভ হয় অনেক আগে থেকে। ১৯৮০-এর দশকে পয়লা বৈশাখ পালন করা হতো লন্ডনের কেন্দ্রে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে। ইংরেজরা এখানেই ৩১শে ডিসেম্বর রাতে নববর্ষ পালন করেন। ১৯৮৬ সালে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে যে-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তাতে যোগ দিয়েছিলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা। কিন্তু এখন বৈশাখী মেলায় পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যোগ দেন না।

ক্রিসমাস এবং নববর্ষ ব্রিটেনের সবচেয়ে বড়ো উৎসব। শিক্ষিত বাঙালিরা, বিশেষ করে ভারতীয় বাঙালিরা, এই উৎসবে আগে বেশ উৎসাহ দেখাতেন, এখনো খানিকটা দেখান। কিন্তু বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু বাঙালিরা এতে বিশেষ আগ্রহ দেখান বলে মনে হয় না। অনেকে পরিচিতদের কার্ড দেন — ইংরেজ এবং বাঙালি উভয়কেই।

সংখ্যাগুরু বাঙালিদের মধ্যে এই উৎসব — বিশেষ করে ক্রিসমাস — সযত্নে এড়ানোর একটা সক্রিয় প্রয়াস ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর কারণ তাঁদের ইসলামী স্বরূপ সম্পর্কে সচেতনতা। তাঁরা এখন এটাকে আর একটা সামাজিক উৎসব হিশেবে না-দেখে একটা ধর্মীয় উৎসব হিশেবে গণ্য করেন।

নিউ ইয়ার্স ডে পাশ্চাত্যের একটা প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকে দু-চারটি পরিবার একত্রিত হয়ে এ অনুষ্ঠান পালন করেন। ইংরেজদের অনুকরণে রাত বারোটার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। 'পুরোনো সেই দিনের কথা'



ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে পয়লা বৈশাখ

গেয়ে পুরোনো বছরকে বিদায় দেন এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানান। এসব আসরে কমবেশি পানীয়ের ব্যবস্থাও থাকে। মোট কথা, এ অনুষ্ঠান বেশি বাঙালি পালন করেন না, তবে যাঁরা পালন করেন তাঁরা পশ্চিমা রীতিই অনুকরণ করেন।

পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান যথাসাধ্য আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করেন বাঙালিরা — শিক্ষিত এবং স্বল্প-শিক্ষিত — সবাই। যাঁরা শিক্ষিত এবং বিত্তশালী তাঁদের মধ্যে কে কতোটা আড়ম্বর করতে পারলেন, তার প্রতিযোগিতাও চলে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয় এসব অনুষ্ঠানে। কিন্তু পাত্রপাত্রীর পছন্দ এবং স্বাধীনতার কথা অতোটা বিবেচনা করা হয় কিনা, তাতে সন্দেহ আছে। তা ছাড়া, হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যেই এসব বিয়ের একটা ধর্মীয় চেহারা দেওয়া হয়। কেবল রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট হন না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া, লোকাচারও পালন করা হয়। যেমন, বৌভাত, কনের গায়ে হলুদ, বরের গায়ে হলুদ থেকে আরম্ভ করে তাবৎ অনুষ্ঠানই

পালন করা হয়। সম্ভবত স্ত্রী-আচারই খানিকটা বাদ যায়। খানিকটা ইংরেজিয়ানারও অনুকরণ করা হয় এসব অনুষ্ঠানে। একটি বিয়েতে দেখেছি, পাত্রী যে-পোশাক পরেছে, তা দেশীয় এবং বিদেশী পোশাকের সমন্বয় ঘটিয়ে তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষিতরা প্রায় সবাই বিয়ের পরে ইংরেজদের অনুকরণে হানিমূনে যায়।

কম-শিক্ষিতদের মধ্যেও সাধ্যমতো ব্যয় করে অনুষ্ঠান করা হয়। তবে তাঁদের মধ্যে পাত্রপাত্রীর পছন্দ এবং স্বাধীনতার আদৌ কোনো মূল্য দেওয়া হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, পোশাক-আশাক এবং অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটিতে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতিই বেশি শ্রদ্ধা দেখান। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, গোড়ার দিকের অভিবাসীরা অনেকে ইংরেজ রমণী বিয়ে করলেও এখন কেউ ইংরেজ নারীকে বিয়ে করতে চাইলে পরিবার থেকে প্রবল আপত্তি ওঠে।

বিলেতি বাঙালির ধর্ম

ধর্ম বলতে আমরা এখানে আনুষ্ঠানিক ধর্মকেই বোঝাচ্ছি। এ দেশের বাঙালিদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমানদের অনুপাত কতো, সে বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা হয় যে, হিন্দুরা মুসলমানদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হবেন। এই হিন্দুদের বেশির ভাগই পশ্চিম বাংলার, বাংলাদেশ থেকে আসা কিছু হিন্দুও আছেন। ২০০১ সালের লোকগণনার হিশেবে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশীদের শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমান। বাকি ন ভাগ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃস্টান। পশ্চিম বাংলা থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে খুব সামান্য কিছু খৃস্টান এবং তার থেকে কম আছেন মুসলমান। শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি হিন্দু। এই হিন্দুদের মধ্যে কে কোন বর্ণের অথবা জাতের, তার কোনো হিশেব পাওয়া যায় না।

ব্রিটেনের একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম আছে। কিন্তু এ দেশের সমাজ খুবই সেক্যুলার। জীবনাচরণে এবং মূল্যবোধে তাঁরা সত্যিকার অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ। এমন কি, যাঁরা চার্চে যান (শতকরা দশ ভাগের কম), তাঁরাও। কিন্তু বাঙালিরা সেই পরিবেশে বাস করেও মানবধর্মের আদর্শ অথবা ইহলৌকিকতা স্বীকরণ করতে পারেননি। বেশির ভাগ বাঙালি, বস্তুত, এতো দূরে এসেও, স্বদেশে থাকার সময়ে তাঁরা যে-ধর্ম পালন করতেন, তার প্রতি তাঁদের আনুগত্য ভুলতে পারেন না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তাঁরা কতোটা পালন করেন, তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, খোদ বঙ্গদেশে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় যতোটা জোরালো, বিলেতে এসে সংখ্যালঘু হওয়ার ফলে সে পরিচয় আরও দৃঢ় হয়েছে। কারণ, দেশে থাকতে তাঁরা নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে এতোটা আত্মবিশ্বাস পোষণ করতেন যে, তা জাহির করার দরকার হতো না। কিন্তু এ দেশে এসে অন্যদের

মধ্যে, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে, হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে তাঁরা তাঁদের বিবিধ পরিচয়ের মধ্যে ধর্মীয় পরিচয়কেও জোরেশোরে আঁকড়ে ধরেন। জাতিধর্মের উর্ধ্বে তাঁরা কেবল মানুষ – এটা চিন্তা করতে তাঁরা ভরসা পান না। তাঁরা সম্ভবত আশঙ্কা করেন যে, কেবল মানুষ বলে নিজেদের চিহ্নিত করলে তাঁরা নিজেদের ঠিকানা খুঁজে পাবেন না। এটা তাঁদের সংখ্যালঘু-মনোভাবেরই প্রতিফলন।

সততা, সত্যবাদিতা, কর্মস্থানে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করা, কোনো অপরাধে জড়িয়ে না-পড়া, দেশের আইন মেনে চলা, অন্য মানুষের সেবা এবং উপকার করার আদর্শ গোঁড়া ধার্মিকদের মধ্যে অমন জোরালো নয়। তাঁরা এগুলোকে ধর্মের আবশ্যিক অঙ্গ



হিজাব ও বোরকা-পরা সাতজন বাঙালি তরুণী। পেছনে গোল টুপি পরা তিনজন বৃদ্ধ

বলে গণ্য করেন না। তাঁদের মতে, কাজে ফাঁকি দিলে অথবা আয়কর না-দিলে ধর্ম নষ্ট হয় না বরং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেই তাঁরা ধার্মিক বলে বিবেচিত হন।

ব্রিটেনের বাঙালিরা তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে এতো সচেতন এবং স্পর্শকাতর যে, যাঁরা প্রাত্যহিক জীবনে ইসলাম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সামান্যই তোয়াক্কা করেন, তাঁরাও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কথায় আবেগে উচ্ছ্বসিত হতে

পারেন। বেশির ভাগ হিন্দুরাও তেমনি। ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ যতোটুকুই থাক না কেন, হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের মধ্যে প্রবল। খোদ ভারতে বিজেপি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জাগরণের ফলে ইদানীং তাঁদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী পরিচয়ও আগের তুলনায় অনেক জোরদার হয়েছে।

১৯৭০-এর দশক থেকে পেট্রো-ডলারের কল্যাণে সারা বিশ্বব্যাপী যে-ইসলামী জোয়ার এসেছে, তা দিয়ে বিলেতে বসবাসকারী বাঙালি মুসলমানরা খুব প্রভাবিত হয়েছেন। ফলে স্বরূপের প্রশ্নে তাঁরা যে কেবল অত্যন্ত সজাগ তাই নয়, বরং প্রায় আপোশহীন অবস্থান নিয়েছেন। নানা প্রতীকের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই স্বরূপ-সচেতনতা প্রকাশ পায়। যেমন, মেয়েদের ক্ষেত্রে বোরকা অথবা হিজাব পরার কড়াকড়ি, পুরুষের ক্ষেত্রে তরুণদের মধ্যেও দাড়ি রাখার প্রবণতা, লম্বা জোব্বা পরা ইত্যাদি। তরুণ-তরুণীরা যখন এসব পালন করেন, তখন তা করেন এক ধরনের ঔদ্ধত্য নিয়ে, নিজেদের পরিচয় এবং অস্তিত্বকে জাহির করার উদ্দেশে।

আগেকার অভিবাসীদের সম্পর্কে যেসব তথ্য জানা যায়, তাতে এসব প্রতীক এমনভাবে চোখে পড়ে না। মুসলমান-প্রধান এলাকায় গেলে এখন গোল টুপি মাথায় দিয়ে বহু লোককেই ঘুরতে দেখা যায়। কোনো কোনো দোকান থেকে ধর্মীয় উপদেশের — ওয়াজের — ক্যাসেট-রেকর্ডিং বেশ জোরেশোরে বাজানো হয়। যাঁরা এই ওয়াজ করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে নানাভাবে তার বিরোধিতা করেছেন, এমন কি খুনখারাবিতে লিপ্ত ছিলেন — এ কথা জানা সত্ত্বেও তাঁদের প্রতি শ্রোতাদের ভক্তি এবং আনুগত্য বিচলিত হয় বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, *একাত্তরের ঘাতক দালালরা কে কোথায়* গ্রন্থ থেকে এবং ব্রিটেনের বাণিজ্যিক টেলিভিশন — চ্যানেল ফোরের একটি ডকুমেন্টারি থেকে দেখা যায় যে, এই ঘাতক-দালালদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এসে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এমন কি, তাঁরা কেউ কেউ মসজিদের ইমাম হয়েছেন।

ইসলামী স্বরূপ সম্পর্কে আরও দু-একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, এ দেশে, বিশেষ করে লন্ডন-সহ বড়ো শহরগুলোতে, মসজিদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। এসব মসজিদে লোকজন মুক্তহস্তে অর্থ দান করেন। মসজিদে গিয়ে যাঁরা নামাজ পড়েন, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে। কোনো কোনো মসজিদ থেকে মাইক দিয়ে আজান প্রচার করা হয়, যদিও শুধুমাত্র এই আজান শুনে কেউ মসজিদে যান কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অনেকে বলেন যে, এই আজান প্রচারের মাধ্যমে আসলে মুসলমানরা নিজেদের ধর্মীয় স্বরূপই সোচ্চারভাবে জাহির করেন। তা ছাড়া, অনেকের মতে, মসজিদগুলোতে কেবল নামাজ পড়া হয় না, বরং সেখানে ইসলামী জাতীয়তাবাদী প্রচার চালানো হয়। সক্রিয়ভাবে ধর্মযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্যেও উস্কানি ও উৎসাহ দেওয়া হয় — অন্তত সাম্প্রতিক টেলিভিশন-সংবাদ এবং ডকুমেন্টারি থেকে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

বিলেতে, বিশেষ করে লন্ডনে, ইসলাম ধর্ম শেখানোর জন্যে কয়েকটি মাদ্রাসাও

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী অনুমোদন ও অনুদান লাভের জন্যে এসব মাদ্রাসায় বিজ্ঞান-সহ অন্যান্য বিষয়ও শেখানো হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে যা শেখানো হয়, তা হলো ইসলামী জাতীয়তাবাদ। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে এক ধরনের মনোভাব জোরদার করার প্রয়াসও দেখা যায়। মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতে উপার্জনের জন্যে কী ধরনের কাজ পাবে, তা বিবেচনা না-করেই পিতামাতারা তাদের মাদ্রাসায় পাঠান। এবং সন্তানরা সেখানে আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি পশ্চাৎমুখী শিক্ষাও গ্রহণ করে।

বাংলাদেশী তরুণরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জঙ্গী ইসলামী ধ্যান-ধারণা দিয়ে প্রভাবিত



জুমার নামাজের পর রাস্তার কোনায় ধর্মপ্রচারের ছবি

হচ্ছে। যারা ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য অথবা বিলেতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অংশ নিয়েছে, তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত কয়েকজনকে পাকিস্তানী বলে শনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ বাঙালি বলে জানা যায়নি। তবে বাংলাদেশী তরুণদের মধ্যে অনেকে জঙ্গীবাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে — সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে এ তথ্য প্রায়ই শোনা যায়। সন্ত্রাসী সন্দেহে পুলিস বাংলাদেশী একাধিক যুবককে আটকও করেছে। স্বরূপের প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হয় যে, বাঙালি মুসলমানরা নিজেদের যতোটা মুসলমান এবং তারপর বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত করেন, ব্রিটেনে বাস করলেও ততোটা ব্রিটিশ বলে মনে করেন না।

ইসলামী মৌলবাদ ব্রিটেনের বাংলাদেশীদের মধ্যে এতোটাই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, "ভোট দেওয়া মুসলমানদের জন্যে হারাম" — পুব লন্ডনে এই মর্মে পোস্টারও দেখা

যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা মৌদুদীর মতে, আইন তৈরি করার কোনো এখতিয়ার মানুষের নেই। আল্লাহর আইন অর্থাৎ শরিয়া অনুসারে প্রাত্যহিক জীবনের কাজকর্ম চলবে। মসজিদ কেবল প্রার্থনার জায়গা থাকবে না, বরং তা হবে দেশ শাসন করার এবং বিচারের কেন্দ্র। এই মতবাদ বাংলাদেশে যেমন জেএমবির মতো জঙ্গী প্রতিষ্ঠান এবং জামায়েতে ইসলামীর মতো রাজনৈতিক দল থেকে প্রচার করা হয়, বিলেতেও তেমনি এ মতবাদ প্রচার করার জন্যে সংগঠিত গোষ্ঠী আছে। তবে এই কট্টরবাদীরা এখনো ব্রিটেনের বিচার-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে অথবা বিচারক হত্যা করার উদ্দেশে বোমাবাজি আরম্ভ করেনি।

খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যাপারেও ইসলামী চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, পুরোনো অভিবাসীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, তাঁরা হালাল খাদ্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এমন কি, ১৯৮০-এর দশকেও হালাল নিয়ে এখনকার মতো কড়াকড়ি ছিলো না। তখন এটা পালন করতেন বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমানরা। কিন্তু এখন হালাল খোঁজেন না, এমন বাঙালি মুসলমান খুব কমই আছেন। পুরোনো অভিবাসীদের সাক্ষাৎকার থেকে মাঝেমধ্যে মদ্যপান — বিশেষ করে উৎসবে, আনন্দে — কিছু বিরল ঘটনা ছিলো না। অপর পক্ষে, এখন তরুণ-তরুণীরা সযত্নে মদ্যপান এড়িয়ে চলেন। এমন কি, যাঁরা আগে সামাজিক পানীয় হিশেবে মদ্যপান করতেন, তাঁরাও তা বর্জন করেছেন। কিন্তু তরুণরা মদ্যপান সম্পর্কে ধর্মীয় নিষেধের কথা মনে রাখলেও, অন্য মাদক দ্রব্য সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করেন। পুব লন্ডনে বহু তরুণই মাদক গ্রহণ করেন বলে সংবাদে বলা হয়।

বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও তাঁদের ব্রিটিশ পরিচয় খুব জোরালো বলে মনে হয় না। বরং তাঁরা যে ভারতীয়, সেই পরিচয়কেই তাঁরা বড়ো করে দেখেন। প্রসঙ্গত গৌতম মালকানীর লেখা একটি উপন্যাসের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর নাম *Londonstani* (২০০৬)। এ উপন্যাসে বাঙালিদের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে কয়েকজন ভারতীয়ের কথা, যারা লন্ডনেই একটি পাঞ্জাবিস্তান গড়ে তুলতে চায়। বিলেতের পাকিস্তানীরাও তেমনি ব্রিটেনের ভেতরেই একটি খুদে পাকিস্তান নির্মাণ করতে চান বলে অনেকেই মনে করেন। বেশ কয়েক বছর আগেই এঁদের উদ্যোগে একটি বেসরকারী মুসলিম পার্লামেন্টও গঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এঁরা একটি খৃস্টান সেক্যুলার দেশের মধ্যেই একটা ইসলামী দেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। এতে আর্থিক এবং নৈতিক সহায়তা দিয়ে থাকেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা কিছু লোক। তাঁদের মধ্যে পালিয়ে-আসা অথবা নির্বাসিত কিছু উগ্রবাদী লোকও আছেন। যা খানিকটা বিস্মিত করে, তা হলো এঁরা খৃস্টান-প্রধান দেশে বসবাস করেন এবং অনেকে সোশ্যাল সিকিওরিটির বেনিফিট নিয়ে বাস করেন, কিন্তু এ দেশে মত প্রকাশের যে-স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে পশ্চিমা গণতন্ত্র এবং সভ্যতার বিরুদ্ধেই প্রচার চালান। এঁদের মধ্যে যাঁরা মধ্যপন্থী, তাঁদের কণ্ঠ মৌলবাদীদের চিৎকারে বিলুপ্ত। বাংলাদেশী মুসলমানরা অতোটা উগ্র না-হলেও তাঁদের রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে

তাঁদের ধর্মীয় পরিচয় যে অনেক জোরালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাঙালি হিন্দুরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনে মুসলমানদের মতো অতোটা উৎসাহী নন। তার একটা কারণ এই যে, তাঁরা অনেকে কয়েক পুরুষ ধরে সেক্যুলার শিক্ষার মধ্যে ম ুষ হয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁরা কয়েকটা পুজো করলেও মুসলমানদের মতো তাঁদের প্রতিদিন পাঁচবার করে প্রার্থনা করতে হয় না, অথবা একনাগাড়ে এক মাস উপবাসও করতে হয় না। পেট্রো-ডলারের মতো হঠাৎ তাঁরা টাকাপয়সার কোনো উৎসও খুঁজে পাননি। সুতরাং তাঁদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানোর জন্যে সংগঠিত প্রয়াস সামান্যই লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও সম্প্রতি তাঁদের মধ্যেও পুজো করার প্রবণতা বাড়ছে। নীজডেনের বিশাল মন্দির নির্মাণে তাঁদের অবদান না-থাকলেও, এখন লন্ডনে দুর্গাপূজা এবং সরস্বতী পূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব পুজোর সঙ্গে ধর্মের চেয়ে স্বরূপের প্রশ্ন বেশি জড়িয়ে আছে বলে মনে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ২০০৬ সালে 'ভয়েসেজ অব বেঙ্গল' নামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলো ব্রিটিশ মিউজিয়ম। এই প্রদর্শনীর অঙ্গ হিশেবে পশ্চিম বাংলা থেকে কয়েকজন কুমোর নিয়ে আসা হয় মিউজিয়মের ভেতরেই একটি দুর্গামূর্তি তৈরি করার জন্যে। ঢাকীও আনা হয় বেশ কয়েকজন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এই মূর্তি নির্মাণের কাজ চলে। ঢাকীরা মিউজিয়মের ভেতরে এবং বাইরে ঢাক বাজাতে থাকেন। তারপর মিউজিয়মের ভেতরেই দুর্গার আবির্ভাবসূচক মহালয়া পালন করা হয়। সেখানে পুজোও অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলমানদের বিরোধিতা লক্ষ্য করে মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ শেষ মুহূর্তে বিতর্ক এড়ানোর উদ্দেশে পূজা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত বদল করে। তখন সেই বিশাল মূর্তি কাছাকাছি ক্যামডেন সেন্টারে নিয়ে সেখানে পুজো উদ্‌যাপন করা হয়। এতে বাঙালি হিন্দুরা এতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ গ্রহণ করেন যে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্ম, তাঁরা মূর্তিপূজা-বিরোধী হলেও, তাঁদের অনেকে এই পুজোয় যোগদান করেন। এই প্রদর্শনীর সঙ্গে উপদেষ্টা এবং বিশেষজ্ঞ হিশেবে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই পশ্চিম বঙ্গের। ফলে ভয়েসেজ অব বেঙ্গলে মুসলিম কণ্ঠ কার্যত উপেক্ষিত হয়।

বিলেতে ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া, অন্য ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বাঙালিরা মাঝেমধ্যে পালন করেন। যেমন, আগেই বলেছি, লন্ডনে বাঙালিদের বেশ কয়েকটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমিতি আছে। এসব সংগঠনের আঞ্চলিক চরিত্র খুব স্পষ্ট। ফলে ভারতীয় বাঙালি এবং বাংলাদেশী বাঙালিরা এক সঙ্গে সাহিত্যচর্চা করেন না, অথবা এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন না। তদুপরি, পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের কাছে, ধরা যাক, একুশে ফেব্রুয়ারি, একেবারে অর্থহীন। তাঁরা নিজেরা তো এ দিন পালন করেনই না, এমন কি, এ উপলক্ষে তাঁরা বাঙালি পাড়ার দিকে পা-ও বাড়ান না। তাঁদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে মনে হয় যে, এ দিনটির গুরুত্ব অথবা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কথা তাঁরা জানেনও না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা পয়লা বৈশাখ পালন করার উদ্দেশে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বলেও শুনিনি।

তাঁদের প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। রবীন্দ্রজয়ন্তী ছাড়াও, তাঁরা বসন্ত-উৎসব এবং বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাচের অনুষ্ঠান পালন করেন। তাঁরা নজরুল জয়ন্তী পালন করেন বলেও শোনা যায় না।

সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো, বেশির ভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন বাংলাদেশীরাই। তবে অনুষ্ঠান পালন করতে যেহেতু লোকজন এবং টাকাপয়সার প্রয়োজন, সে জন্যে শিক্ষিত ঢাকাই বাঙালিরা এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে সিলেটী বাঙালিদের সহযোগিতা চান। এই একটা সময়ে সিলেটী এবং ঢাকাই বাঙালিদের খানিকটা মেলামেশা লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া, পুব লন্ডনে প্রধানত শিক্ষিত বাংলাদেশীদের একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে।

যে-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো লন্ডনের বাইরেও পালিত হয়, সেগুলোর মধ্যে আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং কখনো কখনো রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। এক কথায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামকে পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশের বাঙালিরা ভাগ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেন পশ্চিম বাংলার বাঙালিরা; আর নজরুল ইসলাম কল্কে পান বাংলাদেশীদের কাছ থেকে। তবে বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠানেও রবীন্দ্রসঙ্গীত না-হলে চলে না। এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের মধ্যে একটা জিনিশ যা বেশ চোখে পড়ে, তা হলো এতে বাংলাদেশের হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করেন। বস্তুত, কেবল এসব অনুষ্ঠানেই সিলেটী এবং ঢাকাই হিন্দু ও ঢাকাই মুসলমান — এই তিনটি গোষ্ঠী একত্রিত হন। নয়তো, আগেই যেমনটা বলেছি, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ আছে সামান্যই।

এই গোষ্ঠীগুলোর যোগাযোগ অতো ক্ষীণ হওয়ার প্রধান কারণই হলো তাদের ভাষিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবধান। সাধারণত মানুষ মেলামেশা করে এমন মানুষের সঙ্গে যাঁরা একই অঞ্চলের এবং যাঁদের সঙ্গে চিন্তা, রুচি এবং জীবনাচরণের মিল থাকে। সে জন্যে শিক্ষিত লোকেরা শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে, শিক্ষকরা শিক্ষকের সঙ্গে, ডাক্তাররা ডাক্তারের সঙ্গে, এমন কি, বৃদ্ধরা বৃদ্ধদের সঙ্গে এবং তরুণরা তরুণদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন। তাই সিলেটের লোকেরা সিলেটীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বোধ করবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ নেই।

এ ক্ষেত্রে ভাষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। সিলেটী লোকেরা সিলেটী উপভাষাতেই কথাবার্তা বলেন। তাঁরা অনেকে এ ভাষাকে বলেন 'কাঁচা বাংলা' অর্থাৎ অশুদ্ধ বাংলা। যেহেতু তাঁদের বেশির ভাগই বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন কম লেখাপড়া শিখে, সে কারণে প্রামাণ্য বাংলায় নিজেদের ভাব প্রকাশের মতো ক্ষমতা তাঁদের অনেকেরই নেই। দ্বিতীয় প্রজন্মের সিলেটীরাও পিতামাতাদের কাছ থেকে প্রামাণ্য বাংলা শিখতে পারেননি। অন্য জেলার লোকেদের সঙ্গে মেলামেশায় এটা একটা বড়ো অন্তরায়। কিন্তু বাংলাদেশে যে-শিক্ষিত সিলেটীরা বাস করেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে উপভাষায় কথা বললেও প্রামাণ্য বাংলাতেও তাঁরা সমান দক্ষতার সঙ্গে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। সে কারণে বাংলাদেশে সিলেটী এবং 'ঢাকাই'

বাঙালিদের মধ্যে যতোটা যোগাযোগ হয়, বিলেতে তার একাংশও হয় না।

সত্যি বলতে কি, লন্ডনের সিলেটী ভাষা খোদ সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার চেয়েও বেশি আঞ্চলিক। কারণ পত্রপত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশন, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্য অঞ্চলের লোকেদের সঙ্গে আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে খোদ সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিনিয়ত প্রামাণ্য বাংলার যে-প্রভাব পড়ছে, এখানকার ভাষায় তা পড়ছে না। মূল সিলেটীতে এখন প্রামাণ্য বাংলার বহু শব্দ, পরিভাষা এবং প্রয়োগ সে অঞ্চলের লোকেদের অজ্ঞাতেই মিশে গেছে।

বিলেতের সিলেটী ভাষাকে তুলনা করা যায় নিউ ইয়র্কের ইটালিয়ান সম্প্রদায়ের ইটালিয়ান ভাষার সঙ্গে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ ভাষার সঙ্গে। নিউ ইয়র্কের ইটালিয়ান সম্প্রদায় প্রায় তিন শো বছর আগে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। অতো কাল আগে তাঁরা যে-ভাষা নিয়ে এসেছিলেন, মূলত সেই ভাষাই তাঁরা লালন করেছেন। অপর পক্ষে, মূল ইটালির ভাষায় ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ফলে নিউ ইয়র্কের ইটালিয়ান আর ইটালির ইটালিয়ানে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। একই ধরনের পরিবর্তন দেখা দিয়েছে হল্যান্ডের ডাচ ভাষা আর দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ ভাষায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ ভাষা মূল ডাচ থেকে এতোটাই সরে গেছে যে, তাকে ডাচ না-বলে এখন তার নাম দেওয়া হয়েছে আফ্রিকানার।

বিলেতের সিলেটী ভাষার আর-একটা বৈশিষ্ট্য হলোঃ একে ঢালাওভাবে সিলেটী বলে শনাক্ত করা হলেও, এর মধ্যেও উপ-আঞ্চলিক পার্থক্য বিরাজমান। সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে হুবহু একই সিলেটী উপভাষা চালু নেই। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম সিলেটে খানিকটা প্রকার ভেদ আছে। এ কেবল উচ্চারণের পার্থক্য নয়, বরং ক্রিয়া বিভক্তিতেও লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম সিলেটে যে-ভাষায় সাধারণ মানুষ কথা বলেন, তার সঙ্গে কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং সুনামগঞ্জ অঞ্চলের ভাষায় খানিকটা অহমিয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিলেতে বসবাসরত সিলেটের লোকেদের ভাষায়ও এসব উপ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বিলেতের সঙ্গে আদান-প্রদান

ইতেশামউদ্দীন এবং আবু তালিব বিলেতে এসে প্রথম দৃষ্টিতেই বিলেতের বাড়িঘর, লোকজন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন একেবারে ভিন সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ নিয়ে। সুতরাং তাঁদের পক্ষে এ দেশ দেখে যতোটা বিস্মিত, এমন কি, কোনো কোনো বিষয়ে আহত হওয়া স্বাভাবিক, ততোটা প্রভাবিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা হয়েছিলেন। সে জন্যেই দেশে ফিরে দুজনই ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বিলেতের জীবন এবং সমাজ দেখে এতোটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, যাঁরা বিলেতে যাননি, তাঁদেরও সেই সমাজের কথা জানাতে চেয়েছিলেন।

তাঁদের পরে এসেছিলেন রামমোহন রায়। সামাজিক এবং মননশীলতার দিক দিয়ে তাঁর অবস্থান ছিলো ইতেশাম অথবা আবু তালিবের একেবারে বিপরীত কোটিতে। কারণ, পাশ্চাত্যের দর্শন এবং ধারণাসমূহের খুবই ভক্ত ছিলেন তিনি। বলতে গেলে সেই ভক্তির টানেই তিনি ইউরোপ দেখতে ছুটে এসেছিলেন। সত্য বটে, বঙ্গদেশের মাটিতে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, এবং বড়োও হয়েছিলেন সেখানে; কিন্তু তাঁর হৃদয় লালিত হয়েছিলো পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ভাবধারা দিয়ে। সেই আধুনিকতার গোড়ায় ছিলো রেনেসন্সের মানবতা, উদারতা, যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ। এই আদর্শ দিয়ে তিনি কেবল স্বদেশের সংস্কৃতির পুনর্বিচার করতে চাননি, বরং পুরোনো শাস্ত্রের অনুবাদ করে এবং তার নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি সেই আদর্শকেই দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। নিজের চোখে আধুনিক ইউরোপকে দেখার স্বপ্ন তিনি অনেক দিন থেকেই পোষণ করে আসছিলেন। তারপর একবার ইউরোপ দেখার পর এবং সেখানকার মনীষীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পর তিনি আর বঙ্গদেশে ফিরে যেতে পারেননি। ফিরে গেলে তিনি ভ্রমণকাহিনী লিখতেন কিনা, অথবা জীবনযাত্রায় এবং কার্যকলাপে আরও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটাতেন কিনা, তা আমরা কেবল অনুমান করতে পারি।

রামমোহনকে যদি রেনেসন্সের হিউম্যানিস্ট পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত করি, এবং যদি বলি যে, তিনি রেনেসন্সের মানবতার আদর্শ বঙ্গীয় সমাজে রোপণ করতে চেয়েছিলেন, তা হলে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে বলতে হবে তিনি ছিলেন রেনেসন্সের বাস্তব কর্মী। রেনেসন্সের ফলে ইউরোপে যে-ইহলৌকিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা এবং শিল্প গড়ে ওঠে, রামমোহন সেদিকে দৃষ্টি দেননি। দ্বারকানাথ নজর দিয়েছিলেন সেদিকে। দূর থেকে তিনি শিল্প-বিপ্লবের আওয়াজ শুনে তারই প্রতিধ্বনি জাগাতে চেয়েছিলেন সুদূর বঙ্গদেশে। তাই রামমোহন আধুনিক ভারতের জনক হলে, দ্বারকানাথ ছিলেন আধুনিক ভারতের পিতৃব্য।

তিনি ভ্রমণকাহিনী লেখেননি, কিন্তু পশ্চিমে যা কিছু দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে স্বদেশে চিঠিপত্র লিখেছিলেন এবং তারই কয়েকটি তখনকার পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছিলো। তিনি যে পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা এবং ধ্যান-ধারণা দিয়ে প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বোঝা যায়, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা থেকে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পশ্চিমের ধ্যান-ধারণা এবং জ্ঞান-প্রযুক্তি দেশে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এর একটা প্রতীকী দৃষ্টান্ত হলো দেশে ফেরার সময়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন জর্জ টমসনকে। তিনি ভেবেছিলেন, টমসন খুবই উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল রাজনীতিক। তাঁকে স্বদেশে নিয়ে গেলে তিনি বিলেতি সমাজের উদারনৈতিকতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা দেশের লোকেদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন।

বস্তুত, পাশ্চাত্যকে দেখে এবং স্বদেশের সঙ্গে তার তুলনা করে তার প্রতি দ্বারকানাথের প্রেম আরও জোরদার হয়েছিলো। সে জন্যে তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অনেক প্রতীক্ষার পর তিনি যখন শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার বিলেতগামী জাহাজে উঠতে পারলেন, তখন দেশ থেকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন চারজন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র আর এক ভাগনেকে। এই ছজনকেই তিনি নিয়ে এসেছিলেন এঁরা পশ্চিমের শিক্ষায় সুশিক্ষিত হবেন — এই প্রত্যাশায়। বোঝা যায়, তিনি পশ্চিম থেকে কেবল পুস্তকী শিক্ষা নয়, তার প্রায়োগিক দিকটাও স্বদেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এমন কি, কী করে একটা কম্পেনি চালাতে হয় দক্ষতার সঙ্গে — সে জ্ঞানও তিনি আমদানি করতে চেয়েছিলেন।

দ্বারকানাথের পর কয়েক দশক আমরা এই প্রবণতাই লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি ১৮৪০, ৫০, ৬০ এবং ৭০-এর দশকে কতো বাঙালি — কেউ চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ আইন, কেউ বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে বিলেতে এসেছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা কমবেশি পশ্চিমা সভ্যতার স্বাদই অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন প্রত্যক্ষ- এবং পরোক্ষভাবে।

এই বিলেতফেরত লোকেরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং সভ্যতাকে কেবল স্বদেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেননি, যাঁরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার অথবা আইসিএস হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ছাড়া সম্ভবত সবাই আয়-উন্নতি করে সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। অনেকে আবার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন এবং লালমোহন ঘোষের মতো উৎসাহের সঙ্গে স্বদেশ এবং সমাজের সেবা করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-বাঙালিরা স্বেচ্ছাচারী রাজা অথবা সুলতানের শাসনে জীবন যাপন করেছিলেন, সেই বাঙালিদের মধ্যে তাঁরা জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার ধারণাকেও রোপণ করেছিলেন তাঁরা। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাঙালি সমাজে সৃজনশীলতার যে-বিস্ফোরণ এবং মূল্যবোধের যে-ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করি, তার পেছনে এই বিলেতফেরত লোকেদের বিরাট অবদানকে

অস্বীকার করা যায় না। অপর পক্ষে, তাঁদের চারদিকের সমাজ সাময়িকভাবে কোনো কোনো বিলেতফেরতকে একঘরে করলেও, সাধারণভাবে দেশবাসীরা তাঁদের নিয়ে গর্বই করতেন। ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের একই পদে অথবা কখনো কখনো উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে তাঁরা তৃপ্তি লাভ করতেন।

সমাজে বিলেতফেরতদের সবার ভূমিকা অবশ্য সমান ছিলো না। যেমন, কারো কারো সমালোচনা করে বলা যায় যে, বিদেশ থেকে তাঁরা যে-বিদ্যা এবং ডিগ্রি নিয়ে আসতেন, তা তাঁদের নিজেদের আয়-উন্নতির জন্যে যতোটা ব্যবহার করেছেন, সমাজকে অতোটা দান করেননি। যেমন, আনন্দমোহন বসু ব্যারিস্টার হিশেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং রাজনীতি করেছিলেন, কিন্তু তিনি অসামান্য প্রতিভাবান গাণিতিক হয়েও গণিতের ক্ষেত্রে কোনো অবদান রাখেননি অথবা সেই বিদ্যা নিজের দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেননি। প্রসন্নকুমার রায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অথবা প্রমথনাথ বসু সম্পর্কেও এ মন্তব্য সমান প্রযোজ্য। তবে ব্যতিক্রমও ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা গিরিশচন্দ্র বসুর মতো বেশ কয়েকজন।

১৮৭০-এর দশকের শেষ থেকে ভারত সরকার কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে দুটি করে বৃত্তি দিতে আরম্ভ করে। এরই একটি বৃত্তি নিয়ে গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলেতে গিয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন সিসেস্টার কৃষি কলেজে। প্রায় তিন বছর পরে — ১৮৮৪ সালে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করেন স্বদেশের উদ্দেশে। দেশে ফিরে আসার পর তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেকালে শিক্ষিত লোকেদের জীবনের বয়সে গেলে সর্বোচ্চ লক্ষ্যই ছিলো ডেপুটি হওয়া। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ডেপুটিগিরি না-নিয়ে তাঁর শেখা বিদ্যাই দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। এ জন্যে উন্নত ধরনের কৃষিবিদ্যা প্রচার করার লক্ষ্য নিয়ে প্রথমেই তিনি প্রকাশ করেন একটি কৃষিবিষয়ক পত্রিকা — *কৃষি গেজেট*। তারপর একে-একে তিনি প্রকাশ করেন কৃষি এবং উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে অনেকগুলো গ্রন্থ। পশু এবং মৎস্য পালন সম্পর্কেও তিনি লিখেছিলেন। *কৃষি গেজেট* প্রকাশের পরের বছর (১৮৮৬) তিনি সিসেস্টার কলেজের আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্গবাসী স্কুল। তারপরের বছর বঙ্গবাসী কলেজ। এই স্কুল এবং কলেজে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ছিলো। বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসে তাকে শুধু নিজের কাজে না-লাগিয়ে স্বদেশের কাজে লাগানোর এমন দৃষ্টান্ত সেকালে খুবই অভিনব ছিলো।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কৃষিবিদ্যা শেখার জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে এই বিদ্যা শিক্ষা করলেও দেশে এসে তা একটুও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেননি। অথবা সেই বিদ্যা কারো মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ারও কোনো পদক্ষেপ নেননি। তবে বিলেতি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে তিনি কেবল ডেপুটিগিরি করেননি। তিনি বিলেত থেকে যে-সঙ্গীত এবং নাটকের শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, তা প্রয়োগ করেছিলেন সার্থকভাবে। বাংলা গান এবং নাটক উভয়কেই তিনি এগিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিলেতের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

এই দুই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান আরও বেশি। তিনি বিলেত থেকে আনুষ্ঠানিক অথবা পুঁথিগত শিক্ষা কমই নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। নিয়ে গিয়েছিলেন কয়েকটি আইরিশ এবং স্কটিশ লোকগীতির সুর। দেশে ফিরে এই গানগুলোর সুরে তিনি বাংলায় কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন বললে আসলে তাঁর ওপর বিলেতি সঙ্গীতের প্রভাবের কথা কিছুই বলা হয় না। তিনি অপেরার ঢঙে বাংলায় যে-গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন, তা পূর্বোক্ত প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিলেতি গানের যে-প্রভাব তাঁর ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো: কথা-প্রধান গানের রীতি। বিলেতি ফোকসং-এ সুরের সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার যে-রীতি আছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ব্যাপকভাবে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত যে-বাংলা গান দেখতে পাই, তাতে কথার চেয়ে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিলো বেশি। কিন্তু তিনি যে-গান লিখলেন, তাতে সুরের থেকে কথার প্রভাব কিছু কম নয়। এই আদর্শ তিনি বিলেতেই লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও পশ্চিমা প্রভাব পড়েছিলো তার আঙ্গিকে এবং মঞ্চ-পরিকল্পনায়। অভিনয়ের আদর্শও তিনি সেখানে লক্ষ্য করে থাকবেন।

আমার ধারণা, বিদ্যাসাগরের গদ্যে কমা, সেমিকোলন-সহ ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার যেমন ইংরেজি থেকে এসেছিলো, রবীন্দ্রনাথের গদ্যেও তেমনি বাক্য-কাঠামোয় প্রভাব পড়েছিলো ইংরেজি ভাষার। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বলতে পারি। একজন কর্কশকণ্ঠ লোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেন, 'তাঁহার গলায় যে অসাধারণ মিষ্টত্ব ছিলো, এ কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি না।' এই যে-বক্রোক্তি — এটা তাঁর আগেকার বাংলা গদ্যে ছিলো বলে লক্ষ্য করিনি। রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গোক্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। এ তিনি তরুণ বয়সে বিলেতে থাকার সময়ে আয়ত্ত করেছিলেন বলে মনে করি।

জগদীশচন্দ্র বসু দেশে ফিরে আসেন গিরিশচন্দ্র বসুর ঠিক পরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি। তার কয়েক বছর পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও বিলেত থেকে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দান করেন। আপাতদৃষ্টিতে দুজনই সরকারী চাকরি করে নিজেদের উন্নতি করেন। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁরা ছিলেন অন্য বিলেতফেরতদের তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। গিরিশচন্দ্র বসুর মতো তাঁরা স্কুল-কলেজ স্থাপন করেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁরা গবেষণা করে জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার মাধ্যমে পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাঙালিদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অপর পক্ষে, প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় রসায়ন বিদ্যার উন্নতি করেছিলেন তাঁর গবেষণার মাধ্যমে। বিজ্ঞানকে হাতে-কলমে প্রয়োগ করে তা দিয়ে স্বদেশ সেবা করার মহান আদর্শও তুলে ধরেছিলেন তিনি। এঁরা কেবল নিজেরা গবেষণা করেননি, সেই সঙ্গে গবেষণা করার জন্যে তাঁদের শিক্ষার্থী এবং সহকর্মীদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

প্রসঙ্গত এখানেই বলা যেতে পারে যে, ইংরেজ রাজত্বের আগে পর্যন্ত স্কুল-কলেজের

মতো ধাপে ধাপে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি বঙ্গদেশে ছিলো না। উনিশ শতক থেকে বিলেতের আদর্শেই এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছিলো প্রথমে কলকাতায় এবং তারপর মফস্বলের শহরগুলোতে। বিলেতফেরতরা নিজেরা যেমন এই পদ্ধতির ফসল, তেমনি বিলেত থেকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিদ্যা শিখে এসে তাঁরা স্বদেশে এই পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করেছিলেন। শিক্ষার একটা আদর্শও তুলে ধরেছিলেন তাঁরা।

যাঁরা শিক্ষা বিভাগে কাজ করেননি, এমন বিলেতফেরতদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ অন্যদের উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মতো বিলেতে গিয়ে জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করে স্বদেশে ফিরে নিজেদের এবং স্বদেশের উন্নতি করতে। যাঁরা অন্যদের বিলেতে যেতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত এবং সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন মনোমোহন ঘোষ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর উপাধি দিয়েছিলেন 'ভারতীয় অভিবাসীদের প্রধান উপদেষ্টা' বলে। সেকালে যাঁরা আইসিএস প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার জন্যে বিলেতে যেতেন, তাঁদের সবাইকে কমবেশি সাহায্য করেছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। অন্যদের সাহায্য করার থেকেও যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তা হলো বিলেতফেরত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত শত শত লোককে বিলেতে যাওয়ার জন্যে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো।

মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, লালমোহন ঘোষ এবং আনন্দমোহন বসুর মতো রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা উদারনৈতিক রাজনৈতিক আদর্শও নিয়ে এসেছিলেন বিলেত থেকে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি সারা জীবন আইসিএস থাকলে কী করতেন জানিনে, কিন্তু অন্যায়ভাবে পদচ্যুত হওয়ায় বিদেশে স্বাধীনতার যে-আদর্শ দেখে এসেছিলেন, তাকে স্বদেশের মাটিতে রোপণ করার সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে তিনি যে কেবল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নাম দিয়ে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তাই নয়, তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতির আদর্শও স্থাপন করেছিলেন, সাহেবিয়ানা ত্যাগ না-করলেও। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় ইংরেজদের সরাসরি বিরোধিতা করলেও একটা জিনিশ তিনি ভুলে যাননি — সে হলো উদারতা এবং মধ্যপন্থা। উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি এবং আনন্দমোহন বসুও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কংগ্রেস স্থাপিত হলে তাঁরা উভয়ে সেই আদর্শ কংগ্রেসের মাধ্যমে স্বদেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও উনিশ শতকের যুক্তিবাদ ও উদারতার পথ থেকে সরে যাননি। কট্টরপন্থী এবং বিপ্লবী রাজনীতি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত দেখা দেয়নি। বস্তুত, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রমুখ যে-উগ্রবাদী রাজনৈতিক আদর্শ এবং চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ প্রবর্তন করেন, পরবর্তী কালে তা আর-এক বিলেতফেরত — সুভাষচন্দ্র বসু এবং সন্ত্রাসবাদীদের কল্যাণে বঙ্গীয় রাজনীতিতে স্থায়ী আসন করে নেয়। আবদুর রহিমের মতো মানুষও বিলেত থেকে লেখাপড়া করে গিয়েছিলেন, কিন্তু উদার ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ নিতে পারেননি।

বিলেতফেরতদের আর-একটা অবদানের কথাও স্বীকার করতে হয় — তাঁরা যে সমাজের রক্তচক্ষু এবং একঘরে হওয়ার আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করে কালাপানি পার হয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে বিলেতযাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলো। বস্তুত, তাঁদের দৃষ্টান্ত অন্যদের কেবল সাহস জোগায়নি, বরং তাঁরা কূপমণ্ডূক বাঙালিদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। অতঃপর বাঙালিরা বিশাল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন মাথা উঁচু করে। এখন যে-গোটা বিশ্বে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালিদের দেখতে পাই, তার সূচনা করেছিলেন এই পথিকৃৎরা।

বিলেতফেরতরা উচ্চশিক্ষা, উদারনৈতিকতা এবং আধুনিকতা ছাড়াও একটা জিনিশ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, সে হলো সাহেবিয়ানা। সাহেবিয়ানা পোশাকে-আশাকে, পানাহারে এবং জীবনযাত্রায়। ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার ৮০/৯০ বছর পরেও ইংরেজি পোশাক দেশীয়রা গ্রহণ করেননি। ১৮৩০-এর পত্রপত্রিকার খবরে তরুণদের পশ্চিমা-প্রভাবিত পোশাকের যেসব সমালোচনা করা হয়েছে, তার বেশির ভাগই হলো মাথা খোলা রাখা, গায়ে চাদর না-দেওয়া আর বিলেতি স্টাইলের জুতো পরার। এই সমালোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অন্তত ৩০-এর দশক পর্যন্ত সত্যিকারের ইংরেজি পোশাক সমাজে চালু হয়নি। এর আর-একটা প্রমাণ এই যে, ১৮৪২-৪৩ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদিন কলেজে কোট-প্যান্ট পরে যাওয়ায় সহপাঠীদের মধ্যে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো। বস্তুত, আনুষ্ঠানিক পোশাক বললে তখনো বোঝাতো নবাবী আমলের পোশাককে। কিন্তু ১৮৬০-এর দশক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আপাদমস্তক পশ্চিমা পোশাক নিয়ে ফিরে এলেন। সে পোশাক সঙ্গে সঙ্গে সমাজ গ্রহণ করেনি ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে — অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই — তা সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলে বিশ শতকে এসে পাঁচ শো বছর ধরে যে-নওয়াবী আমলের পোশাকই বাঙালিরা পরে এসেছেন, তার জায়গা দখল করে ইংরেজি পোশাক। এই পোশাক পরে সাহেবরা এসেছিলেন, কিন্তু সমাজ তা দেখেও গ্রহণ করেনি। বরং তাকে জনপ্রিয় করেছিলেন বিলেতফেরত দেশী সাহেবরা।

পানাহারেও বিলেতফেরত লোকেরা বড়ো রকমের প্রভাব ফেলেছিলেন। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে বিস্কিট, কেক, পাঁউরুটি ইত্যাদি কনফেকশনারি এবং চপ-কাটলেট জাতীয় খাবার তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু যাঁরা এসব খেতে আরম্ভ করেন, তাঁরা এসব খেতেন গোপনে, অন্যদের আড়ালে। বিলেতফেরতরা নতুন সাহস দেখান রক্ষণশীল লোকাচারের বিরুদ্ধে। তা ছাড়া, মাইকেল মধুসূদন, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, বিহারীলাল গুপ্ত প্রমুখ খাওয়া-দাওয়ার ওপর যে-নিষেধের বেড়াজাল ছিলো, তা পুরোপুরি অস্বীকার করেন বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি রেখে। এঁরা সবাই গোরু-খেকো হিশেবে খুব পরিচিত ছিলেন। গোড়ার দিকের একজন আইসিএস — ব্রজেন্দ্রনাথ দে লিখেছেন যে, গোরুর মাংসে তাঁর পরিবারে আপত্তি ছিলো না, কিন্তু তাঁরা নিজেরা ইচ্ছে করে বা শখ করে গোরুর মাংস

খেতেন না। অপর পক্ষে, বিহারীলালদের গোরুর মাংস না-হলে চলতো না। মাইকেলও এই গোমাংস প্রীতির কথা বিলেত থেকে লিখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বিলেত থেকে দেশে ফেরার পথে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েই গিরিশচন্দ্র বসু গোরুর মাংস 'মিস' করতে আরম্ভ করেন। গোরুর বা শুয়োরের মাংস পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই খায়, সুতরাং এটা খাওয়া এমন কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। কিন্তু গোরু অথবা শুয়োরের মাংস খাওয়া প্রতীকী দৃষ্টান্ত হিশেবে অসাধারণ। কারণ এর মধ্য দিয়ে যূথবদ্ধ সমাজ এবং লোকাচারকে অস্বীকার করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয় ঘোষণা করা যায়।

পানীয় সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যেতে পারে। মাংস খেলে নেশা হয় না, কিন্তু পানীয় খেলে হয়। সুতরাং একবার বিলেতি পানীয় সমাজে চালু হওয়ার পর ১৮২০-এর দশক থেকে ১৮৭০-এর দশকের মধ্যে মদ্যপান মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো কলকাতা নগরীতে। অন্য শহরেও কমবেশি পড়ে থাকবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭০-এর দশক থেকে মদ্যপান-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এ আন্দোলনও গোড়াতে শুরু হয়েছিলো ইংল্যান্ডে। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালিরা বঙ্গদেশে তারই অনুকরণ করেন।

খাদ্য ও পানীয়ের ওপর বিলেতি প্রভাব নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার। তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছিলো বাঙালিদের অন্তঃপুরে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালি সমাজে নরনারীর যে-ভূমিকা স্বীকৃত ছিলো, ইংরেজি শিক্ষা প্রচলন এবং ইংরেজ নরনারীর জীবনযাত্রা দেখার পর, শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে তা-ই বিচলিত হয়েছিলো। বাংলার ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা তখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, নারীদের অন্তঃপুরে বন্দী এবং অশিক্ষিত করে রেখে, আসলে তাঁরা নিজেরাই জীবনকে সত্যিকারভাবে উপভোগ করতে পারছেন না। তাঁদের নিজেদের জীবনই অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এই নতুন চেতনা থেকেই তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরিবার এবং সমাজের জন্যে নারীদের শিক্ষা এতো অত্যাবশ্যক যে, তা অনুভব করে রক্ষণশীলদের মধ্যে রাধাকান্ত দেবের মতো মানুষও তাতে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু কেবল স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া নয়, সেই সঙ্গে পর্দাপ্রথা অস্বীকার করা-সহ নারী-স্বাধীনতা এবং নারীদের আধুনিকতার আদর্শ বিলেত থেকে নিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি, বিহারীলাল গুপ্ত প্রমুখ। তাঁরা স্ত্রীদের শিক্ষিত এবং আধুনিক করে তুলেছিলেন। এঁদের স্ত্রীরা কেবল ইংরেজি ভাষা শেখেননি, বরং তাঁদের জীবনে ইংরেজিয়ানাও আয়ত্ত করেছিলেন।

আগেই বলেছি, মেরী কার্পেন্টারের আমন্ত্রণে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীকে নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন ১৮৭১ সালে। তাঁরা সেখানে ছিলেন মাত্র আট মাস। কিন্তু তারই মধ্যে নারী এবং শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্পর্কে তাঁরা খুব সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাই দেশে ফিরে নারীশিক্ষা এবং শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী — দুজনেই বিলেতের সমাজে নারীর মর্যাদা এবং পুরুষ ও নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মনোমোহন ঘোষ অথবা উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি পারিবারিক জীবনে যতোটা সাহেবিয়ানা নিয়ে এসেছিলেন, তার থেকে সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদা দেবী অনেক বেশি এনেছিলেন দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে আধুনিকতা এবং নারী-স্বাধীনতার আদর্শ। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীদের গৃহবন্দী করে রেখে পরিবার সুখের হতে পারে না, অথবা সমাজ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা পর্দা ভাঙার বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তা ছাড়া, এই পর্দা ভাঙার জন্যে বাঙালি নারীদের পোশাকের যে-সংস্কার অত্যাবশ্যক ছিলো, সে ধারণাও জ্ঞানদা দেবী পেয়েছিলেন বঙ্গের বাইরে থেকে। তিনি মেয়েদের পেটিকোট এবং ব্লাউজ পরার যে-রীতি এবং শাড়ি পরার যে-ভঙ্গি প্রবর্তন করেন, এক শো চল্লিশ বছর পরেও তা বাঙালি নারীদের মধ্যে বহাল রয়েছে।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন ১৮৭৬ সালে। তিনি বিলেতের পরিবারগুলোতে অনেক আনন্দ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন। এর পেছনে এক দিকে ছিলো নারীদের শিক্ষা এবং অধিকার, অন্য দিকে, নরনারীর সহযোগিতা এবং মেলামেশা। দেশে ফিরে আসার পর তাই তিনি এগুলোর অভাব মর্মেমর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন। ১৮৮৫ সালে ভারতীয় ধ্যানধারণা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ইংল্যান্ডের প্রভাব নামে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, বাঙালির গৃহ হলো নিরানন্দ। বস্তুত, ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বাঙালিদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাঁদের ভূমিকা যে যথেষ্ট পাল্টে গিয়েছিলো, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিলেতফেরতরা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিলেন বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

জ্ঞানদা দেবী নিঃসন্দেহে বাঙালি নারীদের আধুনিকতার দিশারী ছিলেন। কিন্তু নারীমুক্তির জন্যে তাঁদের যে-শিক্ষা এবং স্বাবলম্বন আবশ্যক, বিলেত থেকে সে ধারণা নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাস। সাত-আট বছর বিলেতে বাস করার পর স্বদেশে ফিরে তিনি ইংল্যান্ডের নারীমুক্তির আদর্শ প্রচার করেছিলেন বাঙালি নারীদের কাছে। তখনো পর্যন্ত নারীশিক্ষা নিয়ে সমাজে অনেক তোলপাড় হলেও, 'নারীমুক্তি'র এই ধারণার কথা বঙ্গদেশে কেউ শোনাননি অথবা প্রচার করেননি। কৃষ্ণভাবিনী আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। স্বামীর কাছে এবং নিজে নিজে লেখাপড়া শিখেছিলেন। বিলেতে গিয়ে তিনি সেখানকার সমাজে নারীদের যে-আন্দোলন চলছিলো — বিশেষ করে নারীদের উচ্চশিক্ষা, সম্পত্তি এবং ভোটাধিকার লাভের আন্দোলন, তা তিনি খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। সেই সুদূরের বার্তাই তিনি স্বদেশে নিয়ে এসেছিলেন। জগৎমোহিনী চৌধুরীও বিলেতে পরিবার ও সমাজে নারীদের ভূমিকা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তার সঙ্গে স্বদেশের নারীদের তুলনা করে তিনি হতাশাও প্রকাশ করেছিলেন।

নারী হিশেবে কৃষ্ণভাবিনী অথবা জগৎমোহিনীর নারীদের দুরবস্থা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে বেশি সচেতন হবারই কথা। কিন্তু এই সচেতনতা কেবল নারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। পুরুষরাও অনেকে এ আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। যেমন, এঁদের বেশ কয়েক বছর পরে ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক বিলেতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে বাঙালি নারীদের দুরবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারেন:

> স্ত্রীজাতির এসব দেশে উন্নত অবস্থা দেখিলে মনে হয়, গরুবাছুর অপেক্ষাও হীন অবস্থা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের। ... আমাদের দেশের ছেলেগুলিরও তেমনি দুরবস্থা, যেমন অযত্নে লালিত-পালিত, তেমনি দুর্বল। সকল দুর্বলের উপরই আমরা অত্যাচার করিতে আজন্ম অভ্যস্ত হইয়াছি। এত অভ্যস্ত যে সে ঘটনা আমাদের চারিদিকে অহরহ দেখিলেও একবার মনে আসে না।

খৃস্টানীও নিয়ে এসেছিলেন কেউ কেউ। আঠারো শতকের শেষ দিকে ঘনশ্যাম দাস যেমন। অথবা উনিশ শতকের ঠিক মাঝখানে সূর্যকুমার গুডিব চক্রবর্তী যেমন। তবে এঁরা খৃস্টানী এনেছিলেন না-বলে বরং বলতে পারি, খৃস্টান হয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে খৃস্টীয় সভ্যতাকেই অভিন্ন করে দেখেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মতো মানুষ। খৃস্টীয় সভ্যতাই যে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা – এ কথা মাইকেল বিলেত যাওয়ার আট বছর আগেই লিখেছিলেন। আর, জ্ঞানেন্দ্রমোহন লিখেছিলেন বিলেতে যাওয়ার পরে। *Thoughts by a Christian Brahmin on the Position and Prospects of Religion in India* (১৮৭১) নামে একটি পুস্তিকায় তিনি লেখেন: ... *I have faith in the religion you have adopted as the strongest foundation upon which India will rear the fabric of her future glory.*

নগেন্দ্রনাথ ঘোষও খৃস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্বে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন বিলেতে কয়েক বছর বাস করার সময়ে। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার অল্পদিন পরেই কলকাতায় এক ভাষণে তিনি বলেন যে, খৃস্টীয় ধর্মের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটা হলো যুক্তিবাদ। খৃস্টধর্ম মানুষের মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেনি, বরং করেছে তাঁদের সুস্থ এবং নৈতিক বোধের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষে খৃস্টীয় নৈতিকতার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন বৌদ্ধরা। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে পরাজিত হয়। খৃস্টীয় সভ্যতার আদর্শ বৌদ্ধদের আদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠ হলে, বলা যেতে পারে, হিন্দু আদর্শের থেকে তা অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন যে, ... a vist to Europe is well worth the trouble and the expence of making it ...

হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা জাত হারিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, তাঁরা কেউ কেউ গোবর খেয়ে জাত ফিরে পেয়েছিলেন। কিন্তু অনেকে আর জাতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টাই করেননি – যেমন রাখালদাস হালদার এবং উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি। সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ দাস এবং তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীও চেষ্টা করেননি। এর মাধ্যমে তাঁরা যূথবদ্ধ সমাজের শাসন এবং

লোকাচারকে অগ্রাহ্য করার একটা সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিলেত থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে অন্য যাঁরা ফিরে এসেছিলেন, তাঁরাও কমবেশি একই ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৪০-এর দশকের শেষে দ্বারকানাথ বসু, ভোলানাথ বসু, সূর্য গুডিব চক্রবর্তী প্রমুখ যখন ডাক্তার হয়ে বিলেত থেকে ফিরে আসেন, অথবা ১৮৬০-এর দশকে যখন জ্ঞানেন্দ্রমোহন, মনোমোহন, মধুসূদন, উমেশ ব্যানার্জি এবং তারকনাথ পালিত ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন, তখন সেটা ছিলো অভিনব। তাঁরা স্বদেশবাসীর চোখে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় — দু-ই জাগিয়ে তুলছিলেন। কিন্তু ১৮৮০ সাল নাগাদ দেখতে পাই বিলেতফেরত ব্যারিস্টারের সংখ্যা চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। কেবল ব্যারিস্টার নয়, সামগ্রিকভাবে বিলেতফেরতদের সংখ্যাই এতো বৃদ্ধি পায় যে, তাঁরা আর সমাজের চোখে তেমন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব হিশেবে থাকলেন না। শুধুমাত্র বিলেতফেরত — এই যোগ্যতা দিয়ে অন্যদের চমকে দেওয়ার উপায় ছিলো না। বিলেত থেকে ফিরে এসে তখন যাঁরা সমাজকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন, তাঁরা তা করেছিলেন অন্য অবদান রেখে।

যেমন, বিবেকানন্দ বিলেতে এবং অ্যামেরিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় 'সত্যিকার' হিন্দু ধর্মের আদর্শ তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি বাহ্যিক জাতিভেদ-সহ অনেক সংস্কার কাটিয়ে এক ধরনের উদারতা এবং মানবতার আদর্শ নিয়ে স্বদেশে ফিরেছিলেন। প্রবল স্বাদেশিকতা সত্ত্বেও তিনি যে-তীব্র ভাষায় স্বদেশের সমালোচনা করেছেন, বিশেষ করে বাঙালিদের দুর্বল চরিত্রের, আমার ধারণা, সেই মানসিকতা তিনি পশ্চিমেই লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের নারীদের দেখেও তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। স্বদেশবাসীর কাছে তিনি তাঁর এই প্রশংসার বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন।

মোট কথা, বিলেতফেরতরা বাঙালি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এবং তার পনেরো আনাই সমাজকে আধুনিকতা এবং উন্নতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলো। কেবল মাত্র ইংরেজি বই পড়ে অথবা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখে বাঙালি সমাজ এখন যেখানে পৌঁছে গেছে, সেখানে পৌঁছাতে পারতো কিনা অথবা এতো দ্রুত পারতো কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, / সেথা হতে সবে আনে উপহার, / দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' সেই উপহার কেবল বইপত্রের মাধ্যমে আসেনি। বিলেতফেরতরা সেই আনা, দেওয়া-নেওয়া, মেলা-মেলানোর প্রক্রিয়াকে সহজ এবং ত্বরান্বিত করেছিলেন। বস্তুত, পশ্চিমের দূত হিশেবে কাজ করেছিলেন বিলেতফেরতরা।

বঙ্গসমাজে পশ্চিমা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রভাব এতো গভীর এবং স্পষ্ট যে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন হয় না। বাঙালি সংস্কৃতিতে বহু নতুন উপকরণই এসেছিলো বিলেতফেরতদের সঙ্গে। অপর পক্ষে, অনেকে মনে করেন যে, বাঙালিরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অনেক উপাদান গ্রহণ করলেও, বিলেতি সংস্কৃতিকে তাঁরা কিছুই

দান করতে পারেননি। আমার বিশ্বাস, এটা ভ্রান্ত ধারণা। জ্ঞান-বিজ্ঞানে বাঙালিরা বর্তমান ইংরেজি সভ্যতায় বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু ইংরেজি সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রায় তাঁদের অবদান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের বিধ্বস্ত অর্থনীতি এবং তার অবকাঠামো নির্মাণে বাঙালি শ্রমিকদের অবদান ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারপর থেকে অর্ধ-শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বাঙালিদের শস্তা শ্রম এ দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

কিন্তু বাঙালিরা তার চেয়েও বড়ো ভূমিকা রেখেছেন বিলেতি সংস্কৃতিতে। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ব্রিটেনের শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশি লোক এ দেশেরই শ্বেতাঙ্গ। বাইরে থেকে এসেছেন মাত্র শতকরা দশ ভাগ লোক। তা সত্ত্বেও এ সমাজকে এখন বলা হয়, মাল্টি-কালচারাল সোসায়েটি। এই যে-বহুবাচনিক সমাজ ব্রিটেনে গড়ে উঠেছে, তার গোড়াপত্তন করেছিলেন বাঙালিরা। এ কথা বলার কারণ, ব্রিটেনে সতেরো-আঠারো শতকে যে-অভিবাসীরা আসতে আরম্ভ করেন তাঁরা এসেছিলেন প্রধানত কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকা থেকে। বিশেষ করে ১৭৫৭ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ার পর বাঙালিদের সঙ্গেই সবচেয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অতঃপর কলকাতা অথবা তার আশেপাশের লোকেরাই প্রথমে ইংরেজদের আয়া এবং গৃহভৃত্য হয়ে বিলেতে আসতে আরম্ভ করেন। পরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা, পাঞ্জাব এবং গুজরাট থেকে বাঙালিদের তুলনায় বেশি লোক এসেছেন, কিন্তু বাঙালিরা এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ব্রিটেনের সমাজে এখন বিচিত্র ভাষাভাষী, বিচিত্র পোশাকের, বহু ধর্মের এবং বহু দেশের লোক দেখা যায়। এই লোকেরা ব্রিটিশ সংস্কৃতি দিয়ে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন, কিন্তু এই অভিবাসীদের সংস্কৃতি দিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি মোটেই প্রভাবিত হয়নি, অথবা হচ্ছে না, এটা মনে করার কারণ নেই। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ভিনদেশীদের সংস্কৃতির এক-একটা উপাদান তাঁরা মেনে নিচ্ছেন, এমন কি, গ্রহণ করছেন।

একটি প্রতীকী দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাঙালি বাস করেন। সে জন্যে এখানে গড়ে উঠেছে 'বাংলা টাউন', যেমন সোহোতে আছে চায়না টাউন, অথবা সাউথ হলে আছে শিখদের ঘনবসতি। ব্রিক লেইন এলাকায় ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে বাংলা-ইংরেজি দু ভাষায় রাস্তার নাম-ফলক। এমন কি, কোনো কোনো রাস্তার নাম লেখা আছে কেবল বাংলায়।

বহু দোকানের ফলকও বাংলা-ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা আছে। পুব লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো হসপিটাল হলো রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এই হসপিটালের সামনের বড়ো নাম-ফলকে হসপিটালের নাম এবং বিভিন্ন শাখা — যেমন, জরুরী বিভাগ — কোন দিকে, তার ফলক লেখা ছিলো বাংলা এবং ইংরেজিতে।

হসপিটালের উল্টো দিকে হোয়াইটচ্যাপল স্টেশনের সামনে বিরাট খোলা বাজার। সে বাজারের বহু দোকান বাঙালিদের এবং ক্রেতারা পনেরো আনাই বাঙালি। ব্রিক লেইন ধরে হাঁটার সময়ে দু পাশে বাংলায় কথাবার্তা এবং অনেক দোকান থেকে বাংলা গান শোনা যায়। রেস্টুরেন্ট থেকে ভেসে আসে মশলার গন্ধ। অনেককে দেখা যায়, লম্বা পাঞ্জাবী এবং টুপি-পরা, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অন্যের সঙ্গে পান খেতে খেতে গল্প করছেন। হঠাৎ একে ঢাকার রাস্তা বলে মনে হলে অবাক হওয়ার কারণ নেই। মোট কথা, এ রকমের বাঙালি পাড়াকে এখন আর বিশুদ্ধ ইংলিশ শহর নয়, বরং লন্ডনের কেন্দ্রেই এক টুকরো বাংলাদেশ বলে মনে হবে। অথবা, অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, ভিন্ন সংস্কৃতির রঙে রাঙানো আর-এক লন্ডন বলে মনে হবে।

এ রকমের বাহ্যিক প্রভাবের চেয়ে বাঙালিরা অনেক সূক্ষ্ম প্রভাব ফেলেছেন ব্রিটেনের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। এ প্রভাব পড়ে প্রধানত রবিশঙ্কর, আলি আকবর এবং বিলায়েত খানের মাধ্যমে। রবিশঙ্কর কেবল শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার এবং শিল্পী নন, তাঁর অসাধারণ ক্যারিজমা আছে। তিনি পঞ্চাশের দশক থেকে পশ্চিমে বাজাতে শুরু করেন এবং ইহুদী মেনুহিনের মতো বিখ্যাত সঙ্গীতকারকে প্রভাবিত করেন। তাঁদের দুজনের যুগলবন্দী পূর্ব এবং পশ্চিমের এক অপূর্ব মিলন। ১৯৬০-এর দশকে তিনি যাঁদের প্রভাবিত করেন, তাঁরা ধ্রুপদী শিল্পী নন, বরং বিটল্ গোষ্ঠীর আধুনিক গানের শিল্পীদের। বিশেষ করে জর্জ হ্যারিসন তাঁর বলতে গেলে শিষ্য হয়েছিলেন। তা ছাড়া, সামগ্রিকভাবে আলি আকবর এবং বিলায়েত খানও ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় করে তোলেন। এই তিন জনই বাঙালি। তার চেয়েও তাঁদের যে-প্রভাব পড়েছে পশ্চিমা সঙ্গীতে, তা হলো পরোক্ষ। এখন পশ্চিমা ঐকতানে অনেক সময়েই সেতার এবং তবলা ব্যবহার করা হয়। এও এসেছে পূর্বোক্ত শিল্পীদের প্রভাবে।



ফোর্নিয়ার স্ট্রীট—কেবল বাংলায়

ব্রিটেনের রাজনীতিতেও প্রভাব পড়েছে বাঙালিদের। রজনী পাম দত্তের জন্ম বঙ্গে নয়; কিন্তু তাঁর পিতা প্রথম দিকের একজন বাঙালি অভিবাসী – উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত। কার্ল মার্কস তাঁর দর্শন খাড়া করেছিলেন লন্ডনে বসে; কিন্তু খোদ ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম তিনি দিতে পারেননি। সেই কাজ করেছিলেন রজনী পাম দত্ত, ১৯১৫

সালে। রাজনৈতিক দল হিশেবে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই প্রত্যক্ষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এ দলের নীতিমালা দিয়ে লিবারেল দল এবং লেবার দল — উভয়ই পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো। তা ছাড়া, বর্তমানে বাঙালিরা তাঁদের সংখ্যার কারণে, বিশেষ করে পুব লন্ডনে, একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিশেবে বিবেচিত হন। ব্রিটেনের একজন সহকারী মন্ত্রীকে সিলেটী উপভাষায় বক্তৃতা করতে শুনেছি। এ ভাষা তাঁর শিখতে হয়েছে বাঙালিদের সংখ্যার কথা বিবেচনা করে।

ভারতীয় এবং পাকিস্তানীরা বড়ো রকমের প্রভাব ফেলেছেন ব্রিটেনের ক্রিকেট খেলায়। টেনিস এবং স্কোয়াশ খেলায়ও তাঁরা নাম করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে বাঙালিদের কোনো প্রভাব পড়েনি। তা সত্ত্বেও এখানে তা উল্লেখ করার কারণ হলো: বিলেতে বসবাসকারী বাঙালিরা খেলাধুলোর দিকে আদৌ যাননি। তরুণ-তরুণীরা যারা লেখাপড়া করে, তারা হয় পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি খোঁজে, অথবা লেখাপড়ায় ভালো না-হলে রেস্টুরেন্ট-সহ শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে। বাবুর্চি হওয়ার জন্যে এ দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তাতে ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি করা যায়। কিন্তু বাঙালিরা সে শিক্ষায় আগ্রহী নন। তাঁরা হাতে-কলমে কাজ শিখে রেস্টুরেন্টের বাবুর্চি হন।

ইংরেজদের, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী নারীদের পোশাক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাতে ভারতীয় তথা বাঙালি পোশাক বেশ জায়গা করে নিয়েছে। বিশেষ করে ফতুয়া এবং পাঞ্জাবী এখন অনেকেই পরেন। এ ছাড়া, সালোয়ার-কামিজ, এমন কি, বিশেষ উপলক্ষে শাড়ি পরাও একেবারে বিরল নয়। এসব পোশাক যে সবটাই বাঙালিদের কাছ থেকে ইংরেজ সমাজে চালু হয়েছে, তা নয়। কিন্তু বাঙালিদের প্রভাব তাতে রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। যেমন, শাড়ি পরার ঢঙে। কোনো ইংরেজ রমণী শাড়ি পরলে পশ্চিম ভারতীয়দের মতো আঁচলটাকে ডান কাঁধের ওপর রাখেন না, বরং বাঙালি নারীদের মতো বাঁ কাঁধের ওপরই রাখেন। বাঙালিদের পোশাক পরার আর-একটা প্রভাব সাম্প্রতিক কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রবলভাবে। এখন তরুণীরা এমন ট্রাউজার এবং টী-শ্যর্ট পরেন, যাতে তাঁদের পেট এবং কোমর বেরিয়ে থাকে। এই ঢঙ আগে কখনো ইংরেজ সমাজে ছিলো না।

পোশাকে বাঙালিদের প্রভাব কতোটা পড়েছে, অথবা আদৌ পড়েছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বিতর্কাতীত বাঙালিদের যে-প্রভাব পড়েছে ইংরেজ সমাজের ওপর, তা হলো এ দেশের খাদ্যাভ্যাসে। ভেতো বাঙালিদের ওপর দীর্ঘদিন শাসন এবং শোষণ চালালেও, ইংরেজ সমাজে ভাত খাওয়ার কোনো ইতিহাস নেই। ১৯৫০ এবং ৬০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বিদেশীদের জন্যে চালও এ দেশের দোকানে পাওয়া যেতো না, অথবা বলা যেতে পারে, পাওয়া যেতো খুবই কম। বাঙালি লস্কররা যে-ভাত খেতেন, সে চাল তাঁরা নিয়ে আসতেন যে-জাহাজে তাঁরা আসতেন, সেই জাহাজে করে। কিন্তু এখন সাধারণ এবং অভিজাত সব ইংরেজ পরিবারেই ভাত খাওয়ার রীতি কমবেশি চালু হয়েছে। বাড়িতে না-খেলেও রেস্টুরেন্টে গিয়ে ভাত

খান। সুপারমার্কেট থেকে আধ-রান্না করা ভাত নিয়ে আসেন। বাঙালিদের মতো ভাত তাঁদের প্রধান খাদ্য নয়, কিন্তু কোনো দিন ভাতের স্বাদ নেননি, অথবা কী করে ভাত রান্না করতে হয়, তা মোটেই জানেন না এমন লোক কমই আছেন।

কেবল ভাত নয়, সেই সঙ্গে চালু হয়েছে ঝোল, যাকে এ দেশে বলা হয় কারি। শেখ দীন মহাম্মদ নাকি সবার আগে এ দেশে কারি নিয়ে এসেছিলেন (১৮১০), কিন্তু সেটা নিতান্তই ইতিহাসের একটা ঘটনা। তাঁর প্রবর্তিত কারি কেউ খাননি। সে জন্যে তাঁর রেস্টুরেন্টই টিকলো না। অপর পক্ষে, সিলেটী লস্কররা যে-রেস্টুরেন্ট খুললেন ১৯৩০-এর দশক থেকে, সেসব রেস্টুরেন্টই কারিকে ইংরেজ সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তুললো। এখন কারি ব্রিটেনের একটি অত্যন্ত বহুল প্রচলিত খাদ্য। এ খাদ্য যেমন মুখরোচক, তেমনি শস্তা। ১৯৬০-এর দশকে যখন কারি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরম্ভ করে, তখন বাঙালিদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আড়াই শিলিং দিয়ে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে 'রাইস অ্যান্ড কারি' খাওয়া যেতো। আগেই বলেছি, নাট্যকার জর্জ ব্যনার্ড শও কারির স্বাদে মুগ্ধ হয়েছিলেন ১৯৫০-এর দশকে। তখন এ রকমের রেস্টুরেন্ট অবশ্য খুব কমই ছিলো।

১৯৮০ সাল নাগাদ ব্রিটেনে কয়েক হাজার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট চালু হওয়ার পর, এসব রেস্টুরেন্টের বাঙালি মালিকরাও এগুলোকে আরও জনপ্রিয় করার জন্যে অভিনব পন্থা বেছে নেন। যেমন, তাঁরা নতুন নতুন খাবার আবিষ্কার করলেন। তন্দুরি চিকিন, চিকিন টিক্কা মসালা, বাল্টি চিকিন, কড়াই চিকিন — এ রকমের কয়েকটা নতুন খাবারের নাম। এগুলোর মধ্যে চিকিন টিক্কা মসালা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই জনপ্রিয়তার মাত্রা বোঝা যাবে নিচের পরিসংখ্যান থেকে:

ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে বিক্রির পরিমাণ

১৯৯৮	১৩.৩ বিলিয়ন (১৩৩০ কোটি) পাউন্ড
২০০২	১৫.৫৫ বিলিয়ন (১৫৫৫ কোটি) পাউন্ড

এসব খাবারের মধ্যে কোন কোন খাবার সবচেয়ে জনপ্রিয় তারও হিশেব মেলে:

কোন খাবার কতোটা বিক্রি হয় তার শতকরা হার

চিকিন টিক্কা মসালা	১৪.২
চিকিন মাদ্রাস	৭.২
চিকিন কোর্মা	৬.৫
তন্দুরি চিকিন	৪.৫
চিকিন টিক্কা	৪

ইন্ডিয়ান খাবার এতো জনপ্রিয় হয়েছে যে, এসব এখন কেবল রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় না, বরং সুপারমার্কেটেও অর্ধ-রান্না অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। যাঁরা বাড়িতে রান্না করতে চান, তাঁদের জন্যে প্রতিটা খাবারের আলাদা আলাদা মশলাও বিক্রি হয়। বাঙালিদের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের তুলনায় বিলেতে চীনা, গ্রীক এবং আরবদের

রেস্টুরেন্ট আরও পুরোনো। কিন্তু পৃথিবীর কোনো অঞ্চলের রেস্টুরেন্টই বাঙালিদের 'ইন্ডিয়ান' রেস্টুরেন্টের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এমন কি, ভারতের অন্যান্য এলাকার, যেমন পাঞ্জাবী অথবা দক্ষিণ ভারতীয় খাদ্যও ইংরেজ সমাজে এতো বহুলভাবে গৃহীত হয়নি।

বাঙালিরা রাইস, কারি এবং চিকিন টিক্কা মসালা দিয়ে বস্তুত ব্রিটেনের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়েছেন। এবং এটা আমার মতে, এ দেশের সংস্কৃতির ওপর বাঙালিদের একটা বিশাল প্রভাব। অনেকটা বাঙালিদের ওপর পর্তুগীজ প্রভাবের মতো। পর্তুগীজ বণিকরা বাংলাদেশে ঝাল মরিচ, আলু, তামাক, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি খাদ্য প্রবর্তন করেছিলেন, যদিও চিন্তার জগতে কোনো বিপ্লব আনতে পারেননি — যেমনটা এনেছিলেন ইংরেজরা। বাঙালিরাও তেমনি। তাঁরা ইংরেজদের ভাব-জগতে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের খাদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বলা যেতে পারে যে, প্রায় দু শো বছর বাংলাদেশের ওপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে ইংরেজরা যখন তাঁদের স্বদেশে ফিরে এলেন, তখন বাঙালিরা এলেন তাঁদের পেছনে-পেছনে। তাঁরা ইংরেজদের ওপর শাসন ও শোষণ করে প্রতিশোধ নিতে পারেননি, কিন্তু তাঁদের খাদ্যাভ্যাস বদলে দিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন। ইংরেজিতে একটা কথা আছে — সুইট রেভেঞ্জ, মধুর প্রতিশোধ। ইংরেজদের ওপর বাঙালিদের প্রতিশোধ সুইট রেভেঞ্জ নয়, বরং হট কারি রেভেঞ্জ।

বাঙালিদের মধ্যে আদান-প্রদান

বিলেতের বাঙালিদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান নিয়ে আলোচনার আগে একটা কথা মনে রাখা যেতে পারে। শত শত অথবা হাজার হাজার প্রবাসী একটা জায়গায় বাস করলে তাঁরা কার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, তা বেছে নিতে পারেন। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক প্রবাসী একটা জায়গায় বাস করলে বেছে নেওয়ার সুযোগ কম থাকে। যেমন, ধরা যাক, এখন থেকে প্রায় তিন দশক আগে মেলবোর্নে বাঙালি পরিবার ছিলো পঁচিশ-তিরিশটি। এসব পরিবারের প্রায় অর্ধেক ছিলো পশ্চিমবঙ্গের, অর্ধেক বাংলাদেশের। অধিকাংশ পরিবারের কর্তারা পেশাদার ছিলেন। যেমন, ডাক্তার, অধ্যাপক ইত্যাদি। কয়েকটি পরিবারের কর্তারা ছিলেন ছাত্র। এই বাঙালিদের মধ্যে বয়স্করা বয়স্কদের সঙ্গে, কমবয়সীরা কমবয়সীদের সঙ্গে, কখনো ভারতীয়রা

ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ঠিকই, কিন্তু পছন্দের সুযোগ সীমিত হওয়ায় তাঁরা কার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, তা বেছে নেওয়ার তেমন কোনো সুযোগ ছিলো না। ঘুরে-ফিরে কতোগুলো পরিবার বারবার একত্রিত হতো। কিন্তু মেলবোর্নে এখন শত-শত বাঙালি পরিবার বাস করে। তাদের পারিবারিক, শিক্ষাগত, পেশাগত এবং আঞ্চলিক পরিচয়ে এখন অনেক বৈচিত্র্য এসেছে। এখন এই বড়ো জনগোষ্ঠীর লোকেরা কারা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন, তা বেছে নিতে পারেন।

সিডনিতে বাঙালিদের সংখ্যা আরও বেশি। সেখানে বেছে নেওয়ার সুযোগও তাই বেশি। সুতরাং সেখানকার বাঙালিরা আঞ্চলিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত, পেশাগত — নানা ভাগে গোষ্ঠীতে বিভক্ত। সেভাবে গড়ে উঠেছে তাঁদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সখ্য এবং আড্ডার গোষ্ঠী। কিন্তু সিডনির তাবৎ বাঙালির মধ্যে একটা মিল এই যে, তাঁরা প্রায় সবাই শিক্ষিত। রোমের বাঙালিদের সম্পর্কেও মোটামুটি একই কথা বলা যেতে পারে। সেখানেও হাজার হাজার বাঙালির বাস। তাঁরা অনেকে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করলেও প্রায় সবাই শিক্ষিত এবং তাঁরা এসেছেন বাংলাদেশের সব অঞ্চল থেকেই। সুতরাং তাঁদের কোনো জেলাভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধ পরিচয় নেই অথবা নেই বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাভিত্তিক পরিচয়।

বছর পনেরো আগে পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের বাঙালিরাও ছিলেন সবাই শিক্ষিত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত। বেশির ভাগই ছিলেন পেশাদার। কিন্তু লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে যখন সেখানে হাজার হাজার বাংলাদেশী যেতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁদের মধ্যে একটা বড়ো অংশ গড়ে তোলেন অশিক্ষিত এবং স্বল্প-শিক্ষিত লোকেরা। অনুপাতের দিক দিয়েও মুসলমানদের সংখ্যা সেখানে অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে আগেকার সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তত শিক্ষার যে-মিল ছিলো, তা আর থাকলো না। তা ছাড়া, এই সম্প্রদায় অনেক গুণ প্রসারিত হওয়ায় কে কার সঙ্গে মেলামেশা করবেন, তা বেছে নেওয়ার সুযোগও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ছোটো শহরগুলোতে এখনো শিক্ষিত বাঙালিদের প্রাধান্য বেশি এবং সেখানে ভাষিক ঐক্যের কারণে যতো লোক একত্রিত হন, নিউ ইয়র্কে এখন আর তা হন না।

বিলেত-প্রবাসী বাঙালিদের সম্পর্কেও এই একই কথা বলতে হয়। এখানে বাঙালিদের যে-তিনটি বিরাট গোষ্ঠী রয়েছে, তাদের কতোগুলো গুরুত্বপূর্ণ মিল এবং অমিল রয়েছে। যেমন, পোশাক-আশাক, শিক্ষা এবং চলাফেরায় 'ঢাকাই' বাঙালিদের সঙ্গে ভারতীয় বাঙালিদের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এসব ব্যাপারে তাঁদের পার্থক্যটা বেশি বরং সিলেটী বাঙালিদের সঙ্গে। কিন্তু ভারতীয় বাঙালিদের সঙ্গে ঢাকাই বাঙালিদের ভাষার পার্থক্য খুব বেশি না-হলেও, প্রধান পার্থক্য স্বরূপের। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা তাঁদের ভাষিক পরিচয়ের তুলনায় তাঁদের ভারতীয় পরিচয় সম্পর্কেই অনেক বেশি সচেতন। নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হলে তাঁরা বাংলায় কথা বলেন এবং তাঁরা যে বাঙালি তা নিয়ে গর্ব করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। গুজরাটীদের তাঁরা 'গুজু' এবং মাড়োয়ারিদের 'মেড়ো'বলে তুচ্ছতাও করেন। কিন্তু দুটি কারণে তাঁরা বাইরের

লোকেদের সামনে নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেন। প্রথম কারণ: শিক্ষাক্ষেত্রে এবং আর্থিক সচ্ছলতার দিক দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের তুলনায় তাঁদের দীর্ঘতর ঐতিহ্য রয়েছে; আর দ্বিতীয় কারণ: রাষ্ট্র হিশেবে বাংলাদেশের তুলনায় ভারত অনেক উন্নত এবং বহির্বিশ্বে সুপরিচিত। এক কথায়, বাংলাদেশী বাঙালিদের তুলনায় তাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের এই শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবকে ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'সুপেরিঅরিটি কমপ্লেক্স'। এই মনোভাবের দরুন তাঁরা নিজেদের ভারতীয় পরিচয়কেই প্রথমে তুলে ধরেন – যাতে তাঁদের কেউ আবার বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক করে না-ফেলেন।

এ ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা বাংলাদেশের বাঙালিদের ঢালাওভাবে মুসলমান বলেই চিহ্নিত করেন। তাই বাংলাদেশ তাঁদের চোখে দ্বিতীয় পাকিস্তান। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা 'ঢাকাই' হিন্দুদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ যোগাযোগ রাখলেও, ঢাকাই মুসলমানদের সঙ্গে বেশ দূরত্ব বজায় রাখেন। বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এর ঠিক উল্টো। তাঁরা আবার পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতকে হিন্দুস্থান হিশেবেই চিহ্নিত করেন। সত্যি বলতে কি, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু এবং বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানরা মুখে উদারতার ভান করলেও প্রায় সবাই কমবেশি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সত্যি সত্যি অসাম্প্রদায়িক, তাঁদের সংখ্যা হাতে গোনার মতো। এ জন্যে ভাষার ঐক্য সত্ত্বেও বিলেতে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত বাঙালিদের যোগাযোগ সামান্যই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যা খানিকটা অবাক করে তা হলো: সাম্প্রদায়িকতা থাকা সত্ত্বেও 'ঢাকাই' হিন্দুরা 'ঢাকাই' মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে মোটামুটি যোগাযোগ রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে যতোটা যোগাযোগ রাখেন, মনে হয়, তার চেয়ে বেশিই রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বাংলাদেশী হিন্দুদের সঙ্গে কার্যত কোনো যোগাযোগ রাখেন না। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে যে-বিবেচনা কাজ করে, তা হলো রাজনৈতিক বিভাজন।

যা আরও অবাক ও দুঃখিত করে, তা হলো: ধর্মীয় মিল সত্ত্বেও সিলেটী বাঙালিদের সঙ্গে অ-সিলেটী বাঙালিদের সামাজিক আদান-প্রদান হয় খুব সামান্যই। এমন কি, রাজনৈতিক সহযোগিতাও তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত সীমিত। একজন 'ঢাকাই' বাঙালি নির্বাচনে প্রার্থী হলে বহু সিলেটী তাঁকে সমর্থন না-করে বরং একজন শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ প্রার্থীকে ভোট দেন। কয়েক বছর আগে ব্যারোনেস পলা উদ্দীনের পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রার্থিতার সময়ে এটা বেশ প্রকটভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিলো। অনেকে বলেন যে, লেবার দলের বহু সিলেটী সদস্যের বিরোধিতার কারণেই তিনি পার্লামেন্টের নির্বাচনে লেবার দলের প্রার্থী হতে পারলেন না। বস্তুত, সিলেটী বাঙালিরা জানেন পলা উদ্দীন না-হলেও তাঁদের প্রতি ঢাকাই বাঙালিদের মনোভাব কেমন। তাঁদের ধারণা, শিক্ষায় পিছিয়ে থাকার জন্যে ঢাকাই বাঙালিরা তাঁদের তুচ্ছতা করেন। এবং তাঁদের এই ধারণায় সত্যতা রয়েছে। একটু ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলো এবং সরকার বাঙালিদের জন্যে যা কিছু করে, তা

করে বিপুল সংখ্যক সিলেটী বাঙালিদের কথা মনে রেখেই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, লন্ডনের বাঙালি-প্রধান টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বেশির ভাগ বাসিন্দা এবং কাউন্সিলর বাঙালি। এই বাঙালিদের জন্যে কাউন্সিল শিক্ষা, আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি ব্যবস্থা রাখে। যেমন, বাঙালিদের শিক্ষার জন্যে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে বাংলা শেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এমন কি, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেখাপড়ারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষক এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা পশ্চিমবঙ্গের এবং ঢাকাই বাঙালি। তার অর্থ সিলেটী বাঙালিদের নামে চাকরি-বাকরির সুযোগসুবিধা পাচ্ছেন অ-সিলেটীরা।

একই প্রক্রিয়া দেখা যায়, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে এসব ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করেন প্রধানত ঢাকাই বাঙালিরা। কাউন্সিল এসব কাজের জন্যে যে-অনুদান দিয়ে থাকে, তা থেকে এসব ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হয়, কিন্তু তার আর্থিক সুবিধার সিংহ ভাগই ভোগ করেন ঢাকাই বাঙালিরা। এ বিষয়ে আরও একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

বাঙালিরা যেখানেই যান না কেন, তাঁদের সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্যকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। বিশেষ করে এসব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা মুসলমান বাঙালিদের তুলনায় আগে থেকেই অনেকটা এগিয়ে আছেন। সে জন্যে, তাঁরা লন্ডনে একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশীদের তুলনায় আগেই গড়ে তুলেছেন। পঞ্চাশের দশকেই তাঁরা পশ্চিম লন্ডনে বেঙ্গলি ইনস্টিটিউট গড়ে তুলেছিলেন। তারপর গড়ে ওঠে টেগোরিয়ান্স এবং পুব লন্ডনের টেগোর সেন্টার। এখন এই দুটিই তাঁদের সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান দুটির দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এদের পরিচালকমণ্ডলী অথবা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বাঙালিদের জায়গা নেই বললেই চলে। যেখানে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে খোদ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে অন্তত বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের নামে খানিকটা যোগসূত্র রয়েছে — সেখানে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথও দুই বাংলার মধ্যে ঐক্য রচনা করতে ব্যর্থ হন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের আদৌ কোনো উৎসাহ নেই।

এ রকমের আর-একটা দৃষ্টান্ত হলো: পুব লন্ডনে একাধিক সাহিত্য সমিতি আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সমিতিগুলোর কোনোটার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একটি নামও যুক্ত নেই। এসব সমিতির সদস্যরা অবশ্য জানেন যে, পশ্চিমবঙ্গের দু-একজন সাহিত্যিক না-ডাকলে তাঁদের বার্ষিক সম্মেলন ঠিক গুরুত্ব লাভ করবে না। সুতরাং তাঁরা বার্ষিক সম্মেলনের জন্যে পশ্চিম বাংলা থেকে সুনীল গাঙ্গুলির মতো জনপ্রিয় সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। অথচ সাহিত্যে আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গের যে-বাঙালিরা লন্ডনে আছেন, তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন না অথবা সারা বছর তাঁদের সঙ্গে কোনো রকম আদান-প্রদানও করেন না।

নাচ-গানের অনুষ্ঠান সম্পর্কেও মোটামুটি একই কথা বলা যেতে পারে। ভারতীয় বাঙালিরা তাঁদের অনুষ্ঠানে গায়ক-গায়িকা এবং নর্তকী নিয়ে আসেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

আর, বাংলাদেশীরা এঁদের নিয়ে আসেন বাংলাদেশ থেকে। তবে সাহিত্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গ নাচ-গানে যেহেতু বাংলাদেশের চেয়ে অগ্রসর অথবা প্রাচীনতর ঐতিহ্যের অধিকারী, সে জন্যে বাংলাদেশীরা মাঝেমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে গায়ক-গায়িকা এবং নর্তকী আনলেও, উল্টোটা কখনো হয় না।

এই তিন গোষ্ঠীর বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে যোগাযোগ কম সামাজিকতায়। ঢাকাই বাঙালিরা সিলেটী বাঙালিদের সঙ্গে ওঠা-বসা এবং খাওয়া-দাওয়া করেন না। সিলেটী বাঙালিরা অ-সিলেটীদের এড়িয়ে চলেন। তাঁদের মধ্যে বিয়ে-শাদিও বলতে গেলে হয় না। এমন কি, ঈদ অথবা পুজোর মতো ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানেও তাঁদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এবং নিমন্ত্রণ সামান্যই হয়।

অন্যদিকে, ঢাকাই বাঙালিদের সঙ্গে ভারতীয় বাঙালিদের সামাজিক যোগাযোগ নেই বললেই চলে — খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, অন্তর্বিবাহ — কোনো ব্যাপারেই। তবে দু-চারটি ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। এসব ব্যতিক্রম ঘটে সাধারণত একই জায়গায় চাকরির সূত্রে। আগের তুলনায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায়, এখন খোদ পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আদান-প্রদান বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, এখন মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে বসে খেলে বেশির ভাগ হিন্দুর জাত যায় না। এমন কি, এ কথা বিয়ের প্রসঙ্গেও বলা যায়। আগে হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে যতোটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিলো, এখন ঢাকার মেয়ের সঙ্গে কলকাতার ছেলের,অথবা ঢাকার ছেলের সঙ্গে কলকাতার মেয়ের বিয়ে আর অমন পিলে-চমকানো ঘটনা বলে গণ্য হয় না। কিন্তু মূল বঙ্গভূমি থেকে এতো দূরে এসেও বিলেতে এমন ঘটনা বলতে গেলে কখনোই ঘটে না। তার অর্থ বিলেতে এসে বাংলাদেশী বাঙালি আর ভারতীয় বাঙালি — এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষার সূত্র ধরে দূরত্ব না-কমে বরং সে দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বস্তুত, বিলেত একটি বড়ো দ্বীপ, আর সেই দ্বীপে বসত করেন যে-তিন গোষ্ঠীর বাঙালিরা, তাঁরাও তিনটি ছোটো দ্বীপের মতো — এই দ্বীপগুলোর মাঝখানে রয়েছে দুস্তর ব্যবধানের লবণাক্ত জলরাশি।

নির্বাচিত গ্রন্থতালিকা

অমিতা ভট্টাচার্য, *সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ জীবন ও সৃষ্টি*। কলকাতাঃ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৮৬।

ইন্দুমাধব মল্লিক এমএ, এমডি, *বিলাত-ভ্রমণঃ বিলাতের পথে*, প্রথম ভাগ, কলিকাতাঃ ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯১০।

এবনে মা-জ, *বিলাতি মোসলমান অর্থাৎ ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিভারপুল নগরীর নব-দীক্ষিত মোসলমানগণের বিশেষ বিবরণ*, কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৯০৯।

কৃষ্ণ কৃপালনী, *দ্বারকানাথ ঠাকুর : বিস্মৃত পথিকৃৎ*। ক্ষিতীশ রায় অনূদিত। নয়া দিল্লিঃ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮৪। (খুব ভালো বই। কৃপালনী লিখেছেন দরদের সঙ্গে। ক্ষিতীশ রায়ের অনুবাদ চমৎকার।)

কৃষ্ণভাবিনী দাস, *ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা*। কলিকাতাঃ ব্যানার্জি অ্যান্ড সন, ১৮৮৫। (প্রাথমিক উপকরণ হিশেবে চমৎকার। কৃষ্ণভাবিনী যেসব মন্তব্য করেছেন, তার অনেক এখনকার সমাজের জন্যেও প্রাসঙ্গিক। সম্প্রতি সীমন্তী সেনের সম্পাদনায় একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।)

গিরিশচন্দ্র বসু, *বিলাতের পত্র প্রথম ভাগ*। দ্বিতীয় সং; কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী প্রেস, ১৮৮৭।

-----, বিলাতের পত্র, দ্বিতীয় ভাগ। সন ১২৯৩।

-----, *ইউরোপ-ভ্রমণ*। দ্বিতীয় সং, কলিকাতাঃ বঙ্গবাসী প্রেস, ১২৯২।

(গিরিশচন্দ্র বসুর সব লেখাই তথ্যপূর্ণ এবং খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে লেখা। তিনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের কথা লিখলে অনেক কিছু জানা যেতো।)

গোলাম মুরশিদ, *আশার ছলনে ভুলি*। তৃতীয় সং; কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬।

-----, 'রবীন্দ্রনাথ ও তিন নারী', *দেশ*, নভেম্বর ২০০৪?

-----, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া: নারীপ্রগতির এক শো বছর*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় সং, ১৯৯৯।

-----, *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। ঢাকা: অবসর, ২০০৫।

চন্দ্রশেখর সেন, *ভূপ্রদক্ষিণ*। কলিকাতা, ক্ষেত্রনাথ সেন, ১৮৯৭। (ভূগোল বইয়ের মতো। মাঝেমধ্যে রাগ-তালসহ গান আছে। লেখক অথবা অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়।)

চিত্রা দেব, *মহিলা ডাক্তার: ভিন গ্রহের বাসিন্দা*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪। (প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অনেক তথ্য আছে। লেখার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব।)

জগৎমোহিনী চৌধুরী, *ইংলন্ডে সাত মাস*। কলিকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯০২। (একজন খৃস্টান বাঙালির মুগ্ধ দৃষ্টিতে লেখা নিজের অভিজ্ঞতার কথা।)

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ও ইন্দিরা দেবী, *পুরাতনী*। কলিকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭। (কৌতূহলোদ্দীপক অনেক তথ্য আছে। তবে জ্ঞানদা দেবী কাহিনীর সবটা বলেননি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নতুন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে অনেক মূল্যবান কথা জানা যায়, যা এখনো প্রাসঙ্গিক।)

তাবেদার রসুল বকুল, *ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন, ২০০৩। (তথ্যপূর্ণ বই।)

দেবেন্দ্রনাথ দাস, *পাগলের কথা*। কলিকাতা: দাস প্রেস, ১৯১০। (লেখক নিজেকে অনেকটা আড়ালে রেখে নিজের কথা বলতে চেয়েছেন। বিলেতে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এবং পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য থাকলে মূল্যবান বই হতে পারতো।)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এমএ, এমআরএএস: *একঘরে অর্থাৎ বিলাতফেরতদিগকে একঘরে করিবার বিষয়ে কোন বিলাতফেরতার পূর্ণব্যক্তমত; যাহা জানিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারে*। কলিকাতা: এস কে লাহিড়ী অ্যান্ড কোং, ১৮৮৯। (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১০।) (পুস্তিকা মাত্র, কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক এবং সামাজিক দলিল হিশেবে খুবই মূল্যবান। আগাগোড়া ব্যঙ্গ এবং কৌতুকে ভরা।)

প্রশান্ত পাল, *রবি-জীবনী*, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: ভূর্জপত্র, ১৯৮২ ও ১৯৮৪।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, *আত্মকথা*। কলকাতা: প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৪০৩। (অরবিন্দ ও মনোমোহনের জীবনের একটা অংশ জানা যায়। দরদী দৃষ্টি দিয়ে পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন।)

বিবেকানন্দ, স্বামী, *পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ*। দ্বিতীয় সং; কলিকাতা: স্বামী সত্যকাম, ১৩০৯। (অসাধারণ চলতি বাংলায় লেখা। সম্ভবত তাঁর মুখের কথা অন্য কেউ লিখেছিলেন।)

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *গিরিশচন্দ্র বসু*, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সং, ১৩৫৯।

-----, *ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২য় সং, ১৩৬৩।

-----, *রমেশচন্দ্র দত্ত*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ সং, ১৩৬৩।

-----, *রামমোহন রায়*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৪র্থ সং, ১৩৬৩।

-----, *শিবনাথ শাস্ত্রী*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সং, ১৩৬৭।

-----, *সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সং, ১৩৬৭।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, *বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি*, কলিকাতা: সমাজপতি ও বসু, ১৯০৬

যোগেশচন্দ্র বাগল, *কেশবচন্দ্র সেন*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সং, ১৩৬৫।

-----, *ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সং, ১৩৭১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ইউরোপযাত্রীর পত্র*, *জীবনস্মৃতি*।

[রমেশচন্দ্র দত্ত], *ইয়ুরোপে তিন বৎসর*। কলিকাতা: স্ট্যানহোপ প্রেস, ১৮৭৩। (এই বই এবং এর বর্ধিত ইংরেজি সংস্করণ — উভয়ের মধ্যে অনেক তথ্য আছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় আগাগোড়া তিনি আমরা অথবা আমি দিয়ে লিখেছেন। এই আমরা কারা — ঘুণাক্ষরেও তা উল্লেখ করেননি।)

রাজ্যেশ্বর মিত্র, *অতুলপ্রসাদ সেন*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯০।

শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*। সিগনেট সংস্করণ, ১৯৫২।

সাহানা দেবী, *স্মৃতির খেয়া*। কলকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশনস, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯২।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, *চিত্তরঞ্জন দাশ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৯০।

Adams, Caroline. *Across Seven Seas and Thirteen Rivers*. London: Thap Books, 1987. (বেশ কয়েকজন বসতিস্থাপনকারীর নিজেদের জবানিতে লেখা তাঁদের কাহিনী। সেই সঙ্গে লেখকের তথ্য এবং বিশ্লেষণপূর্ণ দীর্ঘ ভূমিকা। খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। এ জাতীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান।)

Ali, Jamil. "Changing Identity Constructions among Bangladeshi Muslims in Britain", *Occasional Papers*, No.6, February 2000, Department of Theology, Birmingham Univ.

Ali, Monica. *Brick Lane*. London: Black Swan, 2007. (1st ed. 2003) (সাড়া-জাগানো উপন্যাস। নিজে নারী বলেই হয়তো নায়িকার নিঃসঙ্গতা এবং স্বরূপের সংকট অতো দরদের সঙ্গে অঙ্কন করতে পেরেছেন।)

Ali, Syed Ameer, *Memoirs and Other Writings*. ed. by Syed Razi Waste. Lahore: People's Publishing House, 1968. (তথ্যপূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থ।)

Ballard, Roger, ed. *Desh Pardesh: The South Asian Presence in Britain*. London:Hurst & Co., 1994. (বিশেষ করে একটি অধ্যায় উল্লেখযোগ্য: I'm Bengali, I'm Asian, and I'm Living Here, The Changing Identity of British Bengalis, by Katy Gardner & Abdus Shakur.)

Banerjea, Surendranath. *A Nation in the Making*. London: Oxford Univeristy Press, 1925. (চমৎকার আত্মজীবনী। একই সঙ্গে নিজের কথা, পরিচিতদের কথা, সমাজের কথা এবং দেশের কথা — এমন সমন্বয় কমই দেখা যায়।)

Banerji, Albion Rajkumar. *An Indian Pathfinder: Being the momoirs of Sevabrata Sasipada Banerji*. Oxford: Kempt Hall Press, n.d. (পুত্রের দৃষ্টিতে পিতার জীবন।)

Botcherby, Sue, *Pakistani, Bangladeshi and Black Caribbean women and employment survey: aspirations, experiences and choices*. London: Equality and Human Rights Commission, 2007.

Borthwick, Meredith. *Changing Roles of Bengali Women*: Priceton: Princeton University Press, 1984.

-----, *Keshub Chunder Sen*. Calcutta: Minerva, 1977.

British Medical Journal, Vol. 23, 30 July, 1864.

Brown, F. H. "Indian Students in Great Britain", *Edinburgh Review*, January, 1913. (তথ্যপূর্ণ লেখা। ভুল তথ্যও আছে।)

Brown, Judith M, *Global South Asians: Introducing The Modern Diaspora*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Burton, A., *At the Heart of the Empire: Indians and the Colonial Encounter in Late Victorian Britain*. Berkele: Unviersity of Califomaia Press, 1998.

Chakrabarti, Pratik. *Western Science in Modern India: Metropolitan Moethods, Colonial Practices*. Delhi: Permanent Black. n.d.

Choudhury, Yusuf. *The Roots and Tales of the Bangladeshi Settlers*. Birmingham: Sylheti Social History Group, 1993.

Crawford, D. G., *History of Indian Medical Service*. 2 Vols. London: W. Tacker & Co., 1914.

-----, *Role of the Indian Medical Service*. London: W Thacker & Co, 1930.

Calcutta. London: T. Nelson & Sons, 1879.

Dabydeen, David, John Gilmore & Cecily Jones, eds., *Black British History*. London: Oxford University Press, 2007.

Dale et al., "The Labour Market Prospects for Pakistani and Bangladeshi Women", *Work Employment Society.*2002; 16: 5.

Das, Harihar. "The Early Indian Visitors to England", *Calcutta Review*, 3rd Series, Vol. 13 (1924). (তথ্যপূর্ণ লেখা। ভুল তথ্যও আছে।)

-----, *Life and Letters of Toru Dutt*. Oxford: Oxford University Press, 1921.

Dass, I. *A Brief Account of a Voyage to England and America*, Allahabad: Presbyterian Press, 1851.

Day, L. *Recollections of Alexander Duff, DD, LLD and the Mission College which he founded in Caclutta.* London: T. Nelson & Sons, 1879.

De, Brajendranath. ***Reminiscences of an Indian** Member of the Indian Civil Service. **Calcutta Review**,* April 1953-Aug. 1955. (টিপিকাল আত্মজীবনী। সেকালের অনেক খবর জানা যায়।)

Dutt, Ramesh C. *Three Years in Europe*. 4th ed., Calcutta: S. K. Lahiri, 1896.

Dutta, K. & Robinson, A. *Rabindranath Tagore: A Myriad Minded Man*. London: Bloomsbury, 1995. ((তথ্যপূর্ণ লেখা সুখপাঠ্য গ্রন্থ।)

Eade, John, "Identity, Nation and Religion: Educated Young Bangladeshi Muslims in London's East End, *International Sociology*, Vol. 9, No. 3, 1994.

-----; Ansar Ahmed Ullah, Jamil Iqbal & Marissa Hey. *Tales of Three Generations of Bengalis in Britain.* London: Nirmul Committee, 2006.

----- and Garbin, D. 'Competing Visions of Identity and Space: Bangladeshi Muslims in Britain', *History Compass*, Volume 3 Issue 1 January 2005.

East India Company. Minutes of the Court of Directors, B85-89 (5th April 1769 to 13th April 1774, BL

D/27

Committee of Correspondance, April 1771 to March 1773, D/27.

D/155

-----, Z/D/28

-----, L/F/2/111.

-----, Minutes of the Court of Directors, L/P & J/ 2-125, 1847.

Fisher, Michael H., *Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain 1600 - 1857*. Delhi: Permanent Black, 2004.(এন্তার তথ্যপূর্ণ চমৎকার গ্রন্থ। ফিশারের সব লেখা সম্পর্কেই এ কথা বলা যায়।)

-----, 'From India to England and Back: Early Indian Travel Narratives for Indian Readers', no publication details available, but based mainly on *Counterflows to Colonialism etc.*

-----, *Migration to Britain from South Asia, 1600s-1850s*. London: 2005.

-----, 'Persian Professor in Britain: Mirza Muhammad Ibrahim at the East India Company's College, 1826-44', in *Comparative Study of South Asia, Africa and the Middle East*, Vol. XX!, Nos. 1-2 (2001).

-----, 'Representing "His" Women: Mirza Abu Talib Khan's 1801 "Vindication of the Liberties of Asiatic Women"', *Indian Economic and Social History Review*, 37/2 (2000).

-----, *The Travels of Dean Mahomet: An Eighteenth Century Journey through India*. Berkeley: University of California Press, 1997.

-----, Lahiri, S, & Thandi, S., *A South-Asian History of Britain: Four Centuries of Peoples from the Indian Subcontinent*. Oxford: Greenwood World Publishing, 2007.

Forbes, Geraldine. *Women in Modern India*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. (তথ্যপূর্ণ লেখা। ভুল তথ্যও আছে।)

Fryer, *Staying in Power: The History of Black People in Britain*. London: Pluto Press, 1984. (প্রধানত অ্যাফ্রো-ক্যারেবিয়ান কৃষ্ণাঙ্গদের বিষয়ে।)

Gardner, Katy. *Global Migrants, Local Lives: Travel and Transformation in Rural Bangladesh*. Oxford University Press, 1995. (তথ্যপূর্ণ লেখা।)

-----, "Mullahs, Migrants, Miracles: Travel and Transformation in Sylhet", *Contributions to Indian Sociology*, Vol. 27, No. 2 (1993).

Garbin, David. "Bangladeshi diaspora in the UK: some observations on socio-cultural dynamics, religious trends and transnational politics", (June, 2005), University of Surrey. (তথ্যপূর্ণ লেখা।)

Ghose, Nagendra Nath. *The Effects of Observation of England*. Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1877. (মুগ্ধদৃষ্টিতে খৃস্টীয় সভ্যতাকে দেখেছেন)

Grove, Peter & Colleen, *Curry, Spice and All Things Nice*, Surrey: Grove Publications, n.d (প্রচুর তথ্যপূর্ণ লেখা। বিশেষ করে দুটি অধ্যায় প্রাসঙ্গিক: The History of the 'Ethnic' Restaurant in Britain; & Origins of 'Curry')

Gupta, Shaibal. K. A *Foot in the Door of the Indian Civil Service*. Calcutta: Papyrus, 1996.

Haldar, Rakhaldas, *The English Diary of an Indian Student*. Dacca: Ashutosh Library, 1903. (প্রথম দিকের বাঙালি ছাত্রদের জীবন সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়।)

House of Commons, *Sessional Papers*, Vol. 135, Fifth Report from the Committee Appointed to enquire into the Nature, State, and Condition of the East India Company, and the British Affairs in the East Indies, 18th of June 1773.

House of Commons, *Sessional Papers*, Vol. 138. Reports on the Administration of Justice, etc, in the East Indies, 8th May 1781

Impey, Sir Elijah. *Memoirs of Sir Elijah Impey*. London, 1846.

I'teshamuddin, Mirza Sheikh. *The Wonders of Vilayet: Being the Memoir, originally in Persian, of a visit to France and Britain in 1765*. tr. by Kaiser Haq. Leeds: Peepal Tree Press, 2001.

Karlekar, Malavika. *Voices from Within: Early Personal Narrative of Bengali Women*. Delhi: Oxford University Press, 1993.

Kling, B. B., *Partner in Empire: Dwarkanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*. Berkeley: University of California Press, 1876. (তথ্যপূর্ণ চমৎকার লেখা।)

Kling, B. B. and Pearson, M. N., *The Age of Partnership: Europeans in Asia before Dominion*. Honolulu: The Univ. Press of Hawaii, 1979.

Kopf, David. *The Shaping of the Modern Indian Mind: A history of the Brahmo Samaj*. Princeton: Princeton University Press, 1981.

(ব্রাহ্ম সমাজের সবচেয়ে বিশ্লেষণপূর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ। তবে সবকিছুকে স্বরূপের সংকটের ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করায় এক ধরনের বায়াস এবং একঘেয়েমি এসেছে।)

Kershen, Anne J., *Strangers, Aliens and Asians: Huguenots, Jews and Bangladeshis in Spitalfields 1660-2000*. London, 2005

Kripalani, K. *Dwarkanath Tagore: A Forgotten Pioneer.* New Delhi: National Book Trust, 1980.

——, *Rabindranath Tagore: A biography*. Calcutta: Visva-Bharati, 1980.

Lahiri, Shompa, *Indians in Britain: Anglo-Indian Encounters, Race and Identity, 1880-1930.* London: Frank Cass, 2000. (তথ্যপূর্ণ লেখা।)

Lambert, S. ed. *House of Commons Sessional Papers of the Eighteenth Century*, Vol. 147 (Wilmington: Scholarly Resources, 1975).

Llewellyn-Jones, Rosie. "Indian Travellers in Nineteenth Century England," *The Indo-British Review*, Vol. 18. No. 1. (ভুল তথ্যপূর্ণ বাজে লেখা।)

Lichtenstein, Rachel, *On Brick Lane*. London: Hamish Hamilton, 2007. (ছবি, কাহিনী এবং ব্যক্তিগত মন্তব্যসম্বলিত নানাজনের লেখা।)

MacMillan, Margaret. *Women of the Raj.* London: Thames and Hudson. First Paperback ed., 1996.

Majumdar, Janaki Agnes Penelope. *Family History*. ed. by Antoinette Burton. New Delhi: Oxford University Press, 2003.

Malkani, Gautam, *Londonstani*. London: Fourth Estate, 2006.

Mann, Bashir, *The New Scots: The Story of Asians in Scotland.* Edinburgh: John Donald Publishers, 1992. (তথ্যপূর্ণ লেখা। ভুল তথ্যও আছে।)

Mayhew, Henry. *London Labour and the London Poor*, 4 Vols. London: Griffin, Bohn and Co, 1861-62. (মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ।)

Mittra, Kissory Chand, *Memoir of Dwarknath Tagore*. Calutta: Thacker, 1870.

Mozoomdar, P. C. *Tour Round the World.* Calcutta, 1884.

Mukherji, T. *A Visit to Europe*. Calcutta, 1889.

Murshid, Ghulam. *Lured by Hope: A biography of Michael Madhusudan Dutt.* tr. by Gopa Majumdar. New Delhi: Oxford Univeristy Press. 2004.

——. *The Heart of a Rebel Poet: Letters of Michael Madhusudan Dutt*. New Delhi: Oxford University Press, 2005.

——. *Reluctant Debutante: Response of Bengali Women to Modernization*. Rajshahi: Sahitya Samsad, 1983.

Nixon, Newton H. *North London or University College Hospital. A History of the Hospital*. H. K. Lewis, 1882.

O'Doherty, Charlotte ; and Jones, Melvyn , "Domestic violence in the Bengali community". *British Journal of General Practice*, 2005.

Phillipson, Chris; Nilufar Ahmed & Joanna Latimer. *Women in Transition: A study of the experiences of Bangladeshi women living in Tower Hamlets*. Bristol: The Policy Press, 2003. (নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লেখা। অগভীর।)

Raychaudhuri, Tapan, *Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal*. Delhi: Oxford University Press, 1988. (তথ্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণপূর্ণ লেখা।)

Robinson, Vaughan, *Transients, Settlers and Refugees*. Oxford: Clarendon Press, 1986.

Roy, Amrita Lal. *Reminiscence English and America*, 2 parts. Part 1 *Three Years among the Americans*. Calcutta: Ray Publishing House, 1889.

Slater, J., *The Asiatic in England*. London: Seeley, Jackson and Halliday, 1873.

Sarbadhicary, Sasi, FSSc. *A Sojourn in the United States of America*.

Sen, Simonti. *Travels to Europe: Self and Other in Bengali Travel Narratives, 1870-1910*. New Delhi: Orient Longman, 2001.(তথ্যপূর্ণ এবং বিশ্লেষণপূর্ণ লেখা।)

Sen Gupta, P. C. "Soorjo Coomar Goovedeve Chuckerbutty: The First Indian Contributor to Modern Medical Science", *Medical History*, 1970 April; 14(2). (সূর্যকুমার সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ লেখা।)

Shaw, Anthony B, "Frederick Akbar Mahomed and His Contribution to the Study of Bright's Disease', *Guy's Hospital Reports*, Vol. 101, nos. 1-4, 1952.

Sinha, Pradip. *Nineteenth Century Bengal*. Calcutta: Firma K L Mukhopadhyay, 1965.

Skinner, C J; Saulsbury, N K G and Goh, B T. 'Sexually transmitted infections in Bangladeshis resident in the UK: a case-control study', *Sexually Transmitted Infections,* 2002; **78**:120-122.

Talib, Mirza A. *Westward Bound: Travels of Mirza Abu Talib*, ed. by Mushirul Hasan. New Delhi: Oxford University Press, 2005. (অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ঐতিহাসিক ভ্রমণকাহিনী। ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়ে অকপট এবং সুন্দর মন্তব্যে পূর্ণ।)

Thacker's Indian Directory, 1875, 1881 & 1898. Calcutta, 1875, 1881, 1898.

University College London. *Notes and Materials for the History of UCL*. London: H. K. Lewis, 1898.

Vadgam, Kusoom, *India in Britain*. London: Robert Royce Lt, 1984. (প্রধানত রাজা-মহারাজাদের কাহিনী। দুর্লভ কয়েকটি ছবি আছে।)

Visram, Rozina, *Asians in Britain: 400 Years of History*, London: Pluto Press, 2002. (রোজিনা বিশ্রামের সব লেখাই তথ্যপূর্ণ এবং প্রচুর গবেষণার ফসল।)

------, *Indians in Britain*. London: B. T. Batsford, 1987.

-----, *The History of the Asian Community in Britain*. London: Wayland, 2007.

Wallace, B., 'A study of Bangladeshi women's entrepreneurship in East London: developing a gender- sensitive and culturally-appropriate notion of personhood'. London: Business School, University of East London, 2007.

নির্বাচিত নির্ঘণ্ট